সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দ হ ন

দহন

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮
নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১১

© সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-865-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

DAHAN
[Novel]
by
Suchitra Bhattacharya

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১২৫.০০

প্রিয় লেখকবন্ধু
রাধানাথ মণ্ডলের স্মৃতির উদ্দেশে

উত্তাল সমুদ্রের মত ঢেউ ভাঙছিল দুটো শরীর। ঢেউয়ের বুকে ঢেউ। ঢেউয়ের পিঠে ঢেউ। অবিরাম ঢেউয়ের অভিঘাতে চলকে চলকে উঠছে আদিম রিপু। সুদর্শন ছেলেটা গানের কথা আর সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিঠ বুক উদর নিতম্ব কোমর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাঁটছে রূপসী মেয়েটাকে। মেয়েটার শরীরের চার ভাগের তিন ভাগ উন্মুক্ত। চোলি আর ঘাগরার মাঝে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্যবধান। তার মোমে মাজা মসৃণ ত্বক, উদ্ধত যৌবন আর অলৌকিক সুষমা মাখা দেহের প্রতিটি খাঁজ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে তেজস্ক্রিয় কামনা।

ঝিনুক মুখ ঘুরিয়ে নিল। আজকাল যে বাড়িতেই যাও, যখনই যাও, শুধু টিভি টিভি টিভি। ফার্স্ট চ্যানেল সেকেন্ড চ্যানেল, কেব্‌ল, স্টার, এম, জি। সর্বত্রই একই দৃশ্যের রকমফের। পাঁচ সাত বছর আগেও এ ধরনের দৃশ্য ঘরে বসে দেখতে নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ জাগত। এখন সব জলভাত। সময় এখন আলোর গতিতে দৌড়চ্ছে। সব কিছুই এখন অনেক বেশি মুক্ত। মুক্ত দুনিয়া। মুক্ত অর্থনীতি। মুক্ত আমোদ প্রমোদ। রঙদার বিজ্ঞাপনে জীবন এখন অনেক বেশি মোহময়। খোলামেলা।

বিশাখার বাবা হঠাৎ ঘরে ঢুকে টিভিটা বন্ধ করে দিল,—কী তোমরা দিনরাত এই নাচগান দ্যাখো বলো তো ? ইয়াং ব্লাড ! সামনে খাবার পড়ে আছে। খাওদাও। আড্ডা মারো। হইচই করো। তা না, সব ঘাড় সোজা করে...

—ঠিক আছে ঠিক আছে। তুমি যাও তো। বিশাখার মা বেশ অপ্রসন্ন হয়েছে,— এ প্রোগ্রামটা সবাই দেখতে ভালবাসে। তোমার মত রসকষহীন লোক ছাড়া। এটা শেষ হলেই উঠে যাব।

—কোন দরকার নেই শেষ হওয়ার। ওই নেত্য না দেখলে জীবন বিফলে যাবে না। আমাকে খেতে দেবে চলো।

বিশাখার বোন সদ্য হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে। খুড়তুতো ভাই

ক্লাস ফাইভে। এই সব নাচাগানা দুম করে বন্ধ হয়ে গেলে মাথা গরম হয়ে যায় তাদের। দিদির বন্ধুদের সামনে সেই রাগ প্রকাশ করতে না পেরে দু'জনে মার্চ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টিভি বন্ধ হতে ঝিনুক মনে মনে খুশিই হয়েছে। ওই বাক্সটা তাকে যে কখনও টানে না এমন নয়। তবে সে শুধু নিজের বাড়িতেই। দৃশ্যগুলোও তখন অন্যরকম। দেখতে দেখতে কখনও কখনও এক ধরনের অলীক মায়াও জাগে। যেন ঝিনুকের সকালের স্কুল সত্যি নয়, যেন প্রায় দুপুরেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হওয়া সত্যি নয়, যেন বিকেলে একই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুখহীন একই মানুষজনের দিকে তাকিয়ে দেখা সত্যি নয়, সত্যি শুধু ওই বাক্সে মেলে ধরা জগতটাই। ঝিনুকদের চণ্ডীতলার সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, দক্ষিণের ছয় বাই তিন ব্যালকনি, টবে সাজানো পাতাবাহার গাছ—সবই তখন মুছে গিয়ে বিশাল বর্ণময় বিলাসময় প্রাসাদ হয়ে যায়। রক্তের কণিকায় অমোঘ বাসনার মতো ঢুকে পড়ে ওই ম্যাজিক-বাক্স। ওই বাক্সের ভিতরেই গাঢ় অরণ্যের শুঁড়িপথে তূণীরের সঙ্গে হাঁটে ঝিনুক। বরফের ওপর দৌড়য়। কাকচক্ষু ঝরনায় উন্মত্ত স্নান করে দু'জনে। তূণীর যে সে মুহূর্তে পাশে নেই, প্রায়শই থাকে না, সে কথা ঝিনুক সম্পূর্ণ ভুলে যায় যেন। তা বলে ওই বিদঘুটে নাচাগানা! ছিঃ।

বিশাখার বাবা মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সুলগ্না ফিসফিস করে বিশাখাকে বলল,— সাউন্ড অফ্ করে একটু চালিয়ে দে না। আজ খলনায়কের গান দিতে পারে।

মৈনাক বলল,— দেবে না। এখন সঞ্জয়ের মুখ টিভিতে ব্যান্ড্। আগে তো হিরো টাডা থেকে ছাড়া পাক।

সুলগ্নার মুখ কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেল। পিঁপড়ে থেকে ঐরাবত, কারুর কোন কষ্ট তার সহ্য হয় না। বন্ধুমহলে তার নাম নাজুকদিল্। সে বলল,— এটা কিন্তু ভারি অন্যায়। একটা বাচ্চা ছেলে ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে, তার জন্য সবাই মিলে তাকে এরকম করা...কী নিষ্ঠুর!

—উউউহ্, কচি খোকা আমার। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবে বলে ফরেন আর্মস্ কাছে রেখেছিল, না?

—ইশ্‌শ্, সঞ্জয়ের যেন সব দোষ, না? আর অন্যরা সব কী? তোদের পলিটিকাল লিডাররা বুঝি সব খসে পড়া দেবতা? এই তোর রশিদের কেসেই দ্যাখ না সব কেমন ফাঁসে!

—তোরা থামবি? সারাক্ষণ শুধু এক বোরিং টপিক। শুভাশিস

রুখে দিল বাজার চলতি আলোচনাটাকে, আয়, আমরা এখন মুরগির ঠ্যাং তুলে বিশাখার চাকরি পাওয়াটা সেলিব্রেট করি।

হইচই করে প্লেট থেকে মুরগির তুলে ধরল সকলে। যন্ত্রচালিতের মতো ঝিনুকও। তূণীর এখনও আসছে না কেন!

ঝিনুকের আনমনা মুখ, দরজার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকানো নজরে পড়েছে মৈনাকের,— কিরে শ্রবণা, তোর তূণীর আজকাল অফিসের তালা লাগানোর কাজটাও করছে নাকি?

ঝিনুক অনেকক্ষণ ধরে একটা বাবল্‌গাম চিবোচ্ছিল। যে কোন উত্তেজনার সময়ে সে কচকচ করে বাবল্‌গাম চিবোয়। শিশুকালের অভ্যাস। সুজাতা অনেক চেষ্টা করেও মেয়ের এই বদ অভ্যাস ছাড়াতে পারেনি। মুখ নাড়তে নাড়তে সে গম্ভীর উত্তর দিল,— তাই হবে।

তূণীরের অফিস অফিস বাতিক ইদানীং খুব বেড়েছে। ঝিনুকের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলতে গেলেও তিন বার কুরুভিলা, দু'বার রজত রায়, ছ'বার ফিনান্স ডিরেক্টর, তূণীরের কথায় ঘুরে ফিরে আসবেই। সাতটা সাড়ে সাতটার আগে বেশির ভাগ দিন অফিস থেকে বেরোয় না, ছুটির দিনেও যে কোন অজুহাতে তার অফিস দৌড়নো চাই-ই।

অথচ চাকরিটা পাওয়ার আগেও তূণীর ছিল অন্যরকম। তখন তার শয়নে স্বপ্নে নিদ্রায় জাগরণে ঝিনুক ঝিনুক ঝিনুক।.... তুই তি-ই-ন দিনের জন্য মুর্শিদাবাদ বেড়াতে যাবি? আমি বাঁচব না।... পরশু সন্ধেয় বিয়েবাড়ি আছে তোর? আমি উল্টো ফুটের ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। ....কাকার শ্রাদ্ধে আমাকে নবদ্বীপ যেতে হবে? চান্স নেই। গেলে আমি সেদিন ফিরতে পারব? তখন আমার শ্রাদ্ধ করে কে? রোজ ঝিনুকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তবু সাতচল্লিশ পাতার প্রেমপত্র, সাতান্ন পাতার প্রেমপত্র, তিয়াত্তর পাতার প্রেমপত্র।

তূণীর এরকমই। সব কাজই তার মাত্রাছাড়া। আবার এই মাত্রাছাড়া ব্যাপারটাও কেমন যেন গোলমেলে। ঝিনুক মাঝে মাঝে থৈ পায় না। কতটা মাত্রা ছাড়াবে তারও এক জটিল হিসাব যেন নিরন্তর চলছে তূণীরের মস্তিষ্কে। চার্টার্ড ইন্টার পরীক্ষার আগে তিন মাসে মোট সাতশ পঁয়ষট্টি ঘণ্টা পড়বে বলে স্থির করেছিল তূণীর। একত্রিশ ঘণ্টা কম পড়া হয়েছে বলে পরীক্ষাতেই বসল না প্রথম বার। এক বার এক মাসে একশ পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা ঝিনুকের সঙ্গে কাটাবে

বলে ঠিক করেছিল। নিজের হিসাব পূর্ণ করতে মাসের শেষ ক'দিন ঝিনুকদের বাড়িতে এসে বসে আছে তো বসেই আছে। রাত ন'টা বাজে ভ্রূক্ষেপ নেই, দশটা বেজে গেল হিল্‌দোল নেই, তিন দিন সাড়ে দশটার পরে তূণীরকে প্রায় ঠেলেঠুলে বাড়ির থেকে বার করেছিল ঝিনুক। শেষ দিন তো ঝিনুককে দরজাতেই আটকে রাখল আরও কুড়ি মিনিট। বাড়িতে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ঝিনুকের জান কয়লা। মা তো আছেই, মার এমনিতেই কৌতূহলের অন্ত নেই, বাবা যে বাবা যে ঘরের পর্দা বদলানো হলেও তিন মাসের আগে বুঝতে পারে না, সেই বাবা পর্যন্ত ভুরু কুঁচকোতে বাধ্য হয়েছিল সেবার।

অফিস নিয়েও কি ওরকম কোন ছক কষেছে তূণীর ? এক বছরে আড়াই হাজার ঘণ্টা অফিসে কাটাবে ! অথবা তিন হাজার ! স্টেটস্ যাওয়ার জন্য যেরকম খেপেছে !

ঝিনুক জানলার ধারে গিয়ে মুখের বাবল্‌গাম ফেলে এল। দিনের প্রখর তাপ ঝিমিয়ে এলেও বাইরের বাতাস এখনও বেশ গরম। পাখার তলা থেকে একটু সরলেই চোখে মুখে ঘাম জমে যায়। গুমোট ভাবটাও আজ বড় বেশি। বিশাখাদের বাড়িটা যদবাবুর বাজারের গায়ে বলে গুমোটটা কি এখানে বেশি তীব্র ?

ঝিনুক খাবারের প্লেট হাতে তুলল।

বিশাখা বলল,— আরেকটু মাংস নিবি তোরা ? নে না। তূণীর আসে কিনা ঠিক নেই অনিন্দিতা অনিন্দিতার বর তো ঝুলিয়েই দিল।

নীলাঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল,— হ্যাঁ রে, অনিন্দিতার নাকি বাচ্চা হবে ?

শুভাশিস যত্ন করে পরোটা ছিঁড়ছিল, আড়চোখে বিশাখার দিকে তাকাল,— তার মানে আরেকটা খাওয়া পাওনা হচ্ছে ?

নীলাঞ্জনা চোখ পাকাল,— লজ্জা করে না বলতে ? নিজে চাকরি পেয়ে এখনও খাওয়ালি না, বসে বসে বিশাখারটা গিলছিল, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা খাওয়ার ধান্দা ?

—খেপছিস্ কেন ? তুই তো খাওয়াবি না, খাওয়াবে অনিন্দিতার বর।

—তোকে থোড়াই খাওয়াবে। পয়সা অত সস্তা না।

—হাসালে বস্। অনিন্দিতার বরের পয়সার অভাব ? ছুরিকাঁচি হাতে ধরলেই পয়সা। যেমন...যেমন...এই শ্রবণা, বল্ না যেমন ?

—যেমন পকেটমারদের ব্লেড ধরলেই পয়সা। ঝিনুক ঠোঁট টিপে

হাসল।

—যেমন ট্রাফিক পুলিসদের লরি ধরলেই পয়সা।

সুলগ্না খিলখিল হাসছে,— তোরা ভীষণ অসভ্য আছিস। মোটেই অনুর বর চশমখোর ডাক্তার নয়। পাড়ার পুওর ক্লিনিকেও বসে, জানিস? কত গরিব লোকদের কম পয়সায় অপারেশন করে দেয়...

ঝিনুক ব্যাজার মুখে বলল,— অনুটা আজ না এসে আমাকেও ফাঁসিয়ে দিল। ওর বই দুটো ফেরত দেব বলে নিয়ে এসেছিলাম, অনেক দিন ধরে আমার কাছে পড়ে আছে, আবার এই ভারী বোঝা টেনে টেনে ফেরা, মানে হয়! এই মৈনাক, তুই তো ওর শ্বশুরবাড়ির কাছে থাকিস্, তুই একটু পৌঁছে দিবি?

মৈনাক বিশাখার দিকে টুক করে তাকিয়ে নিল। বিশাখার সঙ্গে তার গভীর প্রেম। কলেজে পড়ার সময় অনিন্দিতার আবার সামান্য দুর্বলতা ছিল মৈনাকের প্রতি। বিশাখা সে কথা জানে। বিশাখার সামনে অনিন্দিতার কথা উঠলে মৈনাক তাই একটু কাঁটা হয়ে যায়। সে উদাস মুখে বলল,— বইগুলো হজম করে গ্যাঁট হয়ে বাড়িতে বসে থাক। ও ঠিক সুড়সুড় করে তোর কাছে যাবে। ও না গেলে ওর বর যাবে। যেতেই হবে।

—কেন?

—ওর হবু বাচ্চার জন্য এ বছর থেকেই স্কুলে স্কুলে লাইন লাগাতে হবে না? অবশ্য তোর ব্যাকিং-এ তোদের স্কুলে লাস্ট টাইমেও অ্যাডমিশান পেতে পারে।

ঝিনুক হেসে ফেলল,— আমার বাবা কোন হাতফাত নেই, আমাদের স্কুলে টিচারদের কোন কোটা থাকে না।

নীলাঞ্জনা ফস করে বলে উঠল,— তোর কোটা নেই, তোর হেডমিস্ট্রেসের তো আছে! নিজে সেই কোটায় চাকরিতে ঢুকে গেলি!

স্কুলের চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে এ ধরনের ছোটখাটো টীকাটিপ্পনী ঝিনুককে অনেক শুনতে হয়েছে। তার নিজেরই স্কুলের প্রাইমারি সেকশানের ইন্‌চার্জ গীতালি বসুর কাছ থেকে খবর পেয়ে ঝিনুক সোজা গিয়ে ধরেছিল তাদের হেডমিস্ট্রেসকে। এম এ পরীক্ষা দিয়ে ঝিনুক তখন কাঠবেকার। সুনীতা সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করেছিল,— সত্যিই তুই পড়াবি? সিরিয়াস? না শখ?

—চাকরি আবার শখের হয় নাকি আন্টি?

—হুট করে ছেড়ে পালাবি না তো?

—বেটার চান্স না পেলে প্রশ্নই আসে না।

—তাহলে আপাতত লিভ ভেকেন্সিতেই কর। স্বপ্না মেটারনিটি লিভে যাচ্ছে, তার জায়গায় তুই নার্সারির একটা সেকশান নে।

—উনি ফিরে এলে ?

—তখন দেখা যাবে। প্রতি বছর গাদা গাদা স্টুডেন্ট বাড়ছে। এবার মাধ্যমিকে দুটো স্ট্যান্ড করেছে। চোদ্দটা স্টার। বলতে বলতে সুনীতার চোখ চকচক,— মনে হয় নার্সারিতে আরও এক-আধটা সেকশান বাড়াতে হবে। মিস্টার সেনগুপ্তও চান এক্স স্টুডেন্টরাই আমাদের স্কুলের টিচার হয়ে আসুক।

নিলয় সেনগুপ্ত সুনীতার স্বামী। মিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। স্কুলের মালিকও। বেজায় ব্যস্ত মানুষ। স্কুল নিয়ে ভাবার তার আদৌ সময় নেই। তবু সুনীতা তার স্কুল সংক্রান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্তে সেনগুপ্তর নাম ছুঁইয়ে রাখবেই। সিঁথির হালকা সিঁদুরের মতো।

ঝিনুক আলগা শ্বাস ফেলল,— তোরা শুধু আমার চাকরি পাওয়াটাই দেখলি, পরিশ্রমটা তো আর দেখলি না !

—নার্সারিতে পড়ানোয় আবার পরিশ্রম কিরে ? খালি তো আম আর আপেল আঁকা শেখানো। সঙ্গে এ বি সি ডি ওয়ান টু। বড় জোর সুর করে করে দুলে দুলে হাম্পটি ডাম্পটি স্যাট্ অন এ ওয়াল...

নীলাঞ্জনার ক্ষোভটা কোথায় ঝিনুক জানে। তাদের ইয়ারে এম এতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও নীলাঞ্জনা তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। শ্যামবাজারের কাছে একটা কলেজে পার্টটাইম পড়ায়। সপ্তাহে ছ'টা করে ক্লাস। দক্ষিণা মাসে একশ পঁচিশ। দরজায় দরজায় ধূপকাঠি ফিরি করলেও এর থেকে বেশি রোজগার হয়। সেখানে বরাতজোরে জুটে যাওয়া ঝিনুকের চাকরিতে মাস গেলে বারোশো। এই বারোশো টাকার বিনিময়ে তাকে কম খাটায় তার স্কুল ! সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে গোটা চল্লিশেক বাচ্চার খিদমদগারি। সম্মানজনক বেবিসিটিং। আন্টি হিসি করব। আন্টি পটি হয়ে গেল। একেকটা তো আবার তিলে বিচ্ছু। কালীঘাটে পুঁতলে কোডাইকানালে কাঁটাগাছ হয়ে বেরোবে। যেমন মুখ চলে তেমন হাত পা। ক্লাসে ঢুকেই কাঁধের ব্যাগ ঢাল হয়ে গেল, স্কেল তলোয়ার। সব্বাই তখন টেলিভিশানের টিপু সুলতান। হা রে রে রে রে রে। আ ক্র ম অ অ ণ। সঙ্গে খিমচানো কামড়ানো তো চলছেই। এখন আবার নতুন ব্যাচ এসেছে। তিন বছরের একদল শিশু। গা থেকে এখনও দুধের গন্ধ যায়নি। অবিরাম প্যাঁ পোঁ

সানাই বাজিয়ে চলেছে তো চলেছেই। একটা মেয়ে তো আজও ঝাড়া তিন ঘণ্টা মিহি সুরে ললিত শুনিয়ে গেল, ম্যাঁ-অ্যার ক্যাঁছে যাঁবো... ম্যাঁর ক্যাঁছে এঁ এঁ এঁ এঁ এঁ.... । দূর দূর, কী লাভ হল এই চাকরি পেয়ে ! এক বছর পার হয়ে গেল এখনও সেই নার্সারিতেই ঘষটে যাচ্ছে ! বড়দের সেকশানে নিয়ে যাওয়ার নাম গন্ধও করছে না সুনীতা আন্টি। মাঝখান থেকে লোভে লোভে কুঁড়েমি করে এবারও বি এড-এর ফর্ম আনা হল না। ডব্লিউ বি সি এসে বসল, অঙ্ক পেপারে গাব্বু। এক সরল করতেই দেড় ঘণ্টা জলে চলে গেল। নাহ্, এবার থেকে দুপুরে আর ঘুম নয়, পাটিগণিত প্র্যাকটিস্ করতে হবে।

ঝিনুক ডিভানে আধশোওয়া হল। নিজের ব্যথার কাহিনী নীলাঞ্জনাকে শুনিয়ে লাভ নেই। এখন তাদের সকলেরই নিজস্ব জীবন শুরু করার সময়। চাকরি-বাকরি ঘরসংসার ভূত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার সময়। এই সময়ে কলেজ ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া বন্ধুর থেকে পিছিয়ে পড়তে ভাল লাগে কারুর ! প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নীলাঞ্জনার চোরা ঈর্ষায় খুশির প্রলেপ দিতে চাইল ঝিনুক,— হ্যাঁরে নীলু, তোর বিয়ের আরেকটা কথাবার্তা চলছিল না ? কদ্দুর ?

বিয়ের কথা উঠলেই নীলাঞ্জনার মুখ চোখ আলোকিত হয়ে ওঠে, হাসতে হাসতে বলল,— ছেলে আসছে বোস্টন থেকে। গত রোববার মা আর দিদিটা এসেছিল, সঙ্গে একটা মাসতুতো না পিসতুতো ভাই।

—ইন্টারভিউ নিল ? আগেরটার মতো হাতের লেখা দেখতে চেয়েছে ?

—উহুঁ। ছবি দেখে নাকি ছেলের খুব একটা অপছন্দ হয়নি। জাস্ট টুকটাক কয়েকটা খেজুরে প্রশ্ন করছিল। আমার রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে কিনা। কি কি রাঁধতে পারি। ড্রাইভিং জানি, কি জানি না। ঘরদোর সাজানো সম্পর্কে কিরকম আইডিয়া। ও দেশে তো কাজের লোকের খুব প্রবলেম, এবার এসে পাঁচ সাতটা দেখে, চুজ করে, একেবারে বিয়ে করে ফিরবে।

ঝিনুক চোখ ঘোরাল,— তুই কিন্তু এবার ছাড়বি না। কড়া ইন্টারভিউ নিবি বোস্টনের। সোজা জিজ্ঞেস করবি, ঘরদোর ঝাড়াঝুড়ি করতে পারে কিনা, ভাতের ফ্যান্ কিভাবে গালবে, বাচ্চার ন্যাপি কিভাবে পাল্টাতে হয়...

শুভাশিস জানলার ধারে গিয়ে গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছিল, চেঁচিয়ে

বলল,— হ্যাঁ হ্যাঁ আগে থেকে খবর দিস্, কোয়েশ্চেনিয়ার তৈরি করে দেব।

—সুলগ্না হেসে গড়িয়ে পড়ল,— দৃশ্যটা একবার ভাব্। বোস্টন মেয়েদের মতো হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে বসে আছে আর নীলু অদৃশ্য গোঁফ পাকিয়ে ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন ছুঁড়ছে, হ্যাঁ তারপর বলো তো তোমার গায়ের রঙ কি সত্যিই এরকম লাল? না আমেরিকান ক্রিম মেখে...তুলো আর স্পিরিট দিয়ে ঘসে দেখব নাকি?

ঘরে নতুন করে হাসির বাতাবরণ। ঝিনুকের মোটেই হাসি পাচ্ছিল না। মেয়েরা এখনও ওভাবে বসলে যখন হাসি পায় না, ছেলেদের বেলায় হাসি আসবে কেন?

মৈনাক বলল,— সে তোমরা যতই ঠাট্টা করো, মার্কেট এখন এন আর আই-দের। হ্যাঁরে, বোস্টন গ্রিন কার্ড পেয়েছে?

গর্বিত মোরগের মতো ঘাড় নাড়ল নীলাঞ্জনা,— নিশ্চয়ই পেয়েছে। এতদিন ধরে যখন আছে। ওর মা তো কাঁদ-কাঁদ গলায় বলছিল ছেলে বোধহয় আর ফিরবে না।

—বুদ্ধিমান হলে তাই করা উচিত। কিসের ভরসায় ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা এ দেশে পড়ে থাকবে? অ্যাই শ্রবণা, তোর ভাই-এর প্ল্যান কিরে? ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পর জি আর ই দেবে তো?

—কে জানে! ঝিনুক ঠোঁট ওল্টালো,— সবে তো থার্ড ইয়ারে উঠছে, এখনই কি কিছু বলা যায় নাকি?

—না নাহ, লাইফের প্ল্যানিংটা অনেক আগে থেকে সেরে ফেলা উচিত। শুভাশিস ভীষণ সিরিয়াস,— তোর ভাইকে তো দেখেছি, এত ব্রাইট ছেলে! ওরকম ব্রিলিয়ান্ট ছেলের এখনই যদি ক্লিয়ার অ্যাম্বিশান না থাকে...

ছোটন কি সত্যিই খুব ব্রিলিয়ান্ট! মেধা কাকে বলে! ঝিনুকের চোখের সামনে আচমকা একটা পুরনো দৃশ্য ভেসে উঠল। এক পাশ থেকে মা নলেন গুড়ে সন্দেশ আর ছানার পায়েস খাওয়াচ্ছে ছোটনকে, অন্য পাশ থেকে গুনগুন করে সাইন-থিটা কস্-থিটা আউড়ে যাচ্ছে মহার্ঘ টিউটর। বাবা মা দু'জনেই তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে প্রতিটি শব্দ আর খাবারের কণা একসঙ্গে ছেলের শরীরে ঢুকছে কিনা। ওয়ান থেকে এক কাঁড়ি খরচা করে মাস্টার রেখে দক্ষিণ শহরতলির নামী বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে ছোটনকে, তবু প্রতি মুহূর্তে ভয় ছোটন বোধহয় অঙ্কে একটু কাঁচা রয়ে গেছে এখনও! সেই ছোটন মাধ্যমিকে স্টার পাবে, উচ্চ মাধ্যমিকে এইট্টি পারসেন্ট,

খড়্গপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! বাহবাটা কার প্রাপ্য? সাফল্যটা কার? ছোটনের? না ছোটনের পাওয়া সুযোগের? না সুযোগ পাওয়ার ক্ষমতার?

ধস্, এ সব ভাবলেই মনটা এমন খারাপ হয়ে যায়! ঝিনুক দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল। তূণীরটাও বোধহয় আজ আর এল না। আসবেই না যখন, কথা দেওয়ার কি দরকার ছিল? থাকুক ফেভিকলের মতো বসের সঙ্গে সেঁটে। যতক্ষণ খুশি।

ঝিনুক বিশাখাদের বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে একটু জল ছিটোল। গরমে গা হাত পা চিটপিট করছে। বাড়ি ফিরে আবার একবার স্নান করতে হবে। যমগোদা ব্যাগটা থেকে চিরুনি বার করে চুলের সামনেটা অল্প আঁচড়াল। সে কখনও খুব একটা বেশি সাজে না। তার কমনীয় মুখে চিকন ত্বকে এমনিই একটা আলগা লাবণ্য আছে। ধনুকের মতো ভুরুর নিচে তার চোখ দুটো অসম্ভব গভীর। কালো। সেই গাঢ় চোখের কোণে সরু করে কাজল, কপালে ছোট্ট টিপ, হালকা একটু লিপস্টিক, ব্যাস। এতেই তাকে বড় স্নিগ্ধ দেখায়।

ফ্লেয়ারকাট গুজরাটি কামিজের ওপর স্বচ্ছ ওড়না সুন্দর করে সাজিয়ে বাথরুম থেকে বেরোল ঝিনুক। বেরোতেই বিশাখার মা।

—হ্যাঁরে শ্রবণা, তোর শুনলাম খুব শিগ্‌গিরই বিয়ে?

ঝিনুক লজ্জা পেল,— না মাসিমা, মানে এখনও ডেট কিছু ফাইনাল হয়নি। হয়ত...

—অনিন্দিতা মা হতে চলল, তোর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, নীলাঞ্জনারও এবার হয়ে যাবে। আর তোদের বন্ধু? তার কোন হুঁশ আছে?

ঝিনুক বুঝতে পারছিল বিশাখার মা কথাটা কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চায়। মৈনাক এখনও চাকরি পায়নি, মৈনাকের ওপর তেমন আস্থাও নেই বিশাখার মা'র। এই নিয়ে মাঝে মাঝে অনুযোগও শুনতে হয় তাদের।

ঝিনুক পাশ কাটাতে চাইল,— এই তো বিশাখা চাকরি পেয়ে গেল, এবার....

—থাম্ তো, ওর চাকরি পাওয়ার জন্য কি বিয়ে আটকে আছে নাকি? কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে জানিস? বিশাখার মা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,— তোরা তো বন্ধু, তোরা একটু বুঝিয়ে বল না,

ওই ট্যাঙটেঙে ছেলেটার কথা না ভেবে যেন একটু আমাদের কথা শোনে।

বিশাখা মৈনাকের বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ঝিনুক জানে। তা ছাড়া ওদের ব্যক্তিগত সমস্যায় ঝিনুক নাক গলাবেই বা কেন। কোন রকমে ভদ্রমহিলাকে কাটিয়ে ড্রয়িংরুমে ফিরল ঝিনুক।

সুলগ্না ঝিনুককে জিজ্ঞাসা করল,— কিরে, বেরোবি তো? নাকি তূণীরের জন্য আরেকটু ওয়েট করবি?

ঝিনুক ব্যাগ থেকে আরেকটা বাবল্‌গাম বার করে মুখে পুরল। আট'টা দশ। এবার ধরে নেওয়াই যায় তূণীর আর আসছে না। ধ্যাৎ, এর চেয়ে আজ বিকেলে ঠাম্মার কাছে গেলেই ভাল হত। আজ নিয়ে পর পর দুটো বুধবার ওল্ডহোমে যাওয়া হল না।

ঝিনুক বলল,— চল্‌ বেরিয়েই পড়ি।

—দাঁড়া দাঁড়া, আরেকটু দেখে যা। তূণীর এখন শিওর অফিসের চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে। শুভাশিস চোখ বন্ধ করে যেন অনেক দূরের ছবি দেখতে পাচ্ছে এমন ভাব ফোটাল মুখে,— এই, এইমাত্র টয়লেট থেকে নাক ঝেড়ে এল... এবার ওদের রিসেপশনিস্টের পেছনে রাখা গণপতি বাপ্পার মূর্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।... এই এখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সিদ্ধিদাতাকে। এবার পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে একের পর এক ঘরে তালা লাগাচ্ছে....

নীলাঞ্জনা খিলখিল করে হেসে উঠল,— যাহ্‌, তূণীরদের অফিসে মোটেই গণপতি বাপ্পার মূর্তি থাকে না। ওটা বিলিতি অফিস।

ভিতরের চাপা রাগটাকে কয়েক সেকেন্ড কচকচ করে চিবিয়ে নিল ঝিনুক,— তোদের তো বলেই ছিলাম তূণীর ভীষণ অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে।

—খুব চটেছিস মনে হচ্ছে?

—চটতে আমার বয়ে গেছে।

—রাগছিস কেন? সুলগ্না ঝিনুকের কাঁধে হাত রাখল,— এটাই তো কেরিয়ার তৈরির সময়। অনিন্দিতা বলে শুনিস না, ওর বর চেম্বার নার্সিংহোম হাসপাতাল সেরে সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে কোন দিনই ফেরে না? হাত পা ছড়িয়ে সুখ করে থাকতে গেলে খাটতে হবে না?

ঝিনুকের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল, কার সুখ? যাকে ভোর রাত্তিরে কাজে বেরিয়ে গভীর রাতে ঘরে ফিরতে হয়, তার জন্য 'হাত পা ছড়িয়ে থাকা' কথাটা কি নিষ্ঠুর ঠাট্টা নয়! সুখের সংজ্ঞাটাই বা কী?

যার জীবনে কাঠবিড়ালির ঘাসের নিচে বাদাম লুকনোর মনোরম দৃশ্য দেখার অবসর নেই সে কিসের সুখী ! যে মানুষ দুপুরে গঙ্গার বুকে কোনদিন কোটি তারার ঝলকানি দেখার অবকাশ পায় না, তার কোথায় সুখ ! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাতেই ? এই যে তার বাবা, শ্রীযুক্ত মানস সরকার, নিরীহ নিপাট এক ভালমানুষ ভদ্রলোক, কলেজ টিউশনি কোচিং ক্লাস নোটবই লেখা পাবলিশার এত কিছুর গোলকধাঁধাঁয় অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে, সেই মানুষটা কি খুব সুখী ? দিনরাত এভাবে রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে বাবারও কি ভাল লাগে ? ঝিনুকের বুকের গভীরে একটা উষ্ণ বাতাস বয়ে গেল। ভাল লাগে না। নিশ্চয়ই বাবারও ভাল লাগে না। উপায়ই বা কি ? যেভাবে দিন দিন সংসারের চাহিদা বেড়ে চলেছে ! ঝিনুকের নিজস্ব ওয়ার্ডরোবের শখ, ওয়ার্ডরোব এল। মার কালার টিভি চাই, বিশেষ মডেলের কালার টিভি এল। ছোটনের বায়না ভি সি পি, তাও এল। এর সঙ্গে ফ্ল্যাট কেনার দেনা মেটানো আছে, ছোটন আই আই টি-তে পড়ছে, তার একটা বড় খরচা আছে। এ ছাড়া মাকে লুকিয়ে কাকার সংসারে দু'-পাঁচশো টাকা সাহায্য করাও আছে। তাও ভাগ্যিস ঠাম্মা ওল্ডহোমে থাকার কোন খরচ ছেলেদের কাছ থেকে নেয় না !

তূণীরও কি কালে কালে ওইরকম কেজো লোক হয়ে যাবে ?

মৈনাক শুভাশিসের নড়বার কোন লক্ষণ নেই। নীলাঞ্জনারও বাড়ি কাছে, সে আরেকটু গল্প-সল্প চালাবে। ঝিনুক আর সুলগ্না উঠল।

রাস্তায় বেরোতেই একটা গরম হল্‌কা। বদ্ধ ঘরের চেয়েও বাইরে গুমোট আরও ঘন। বাতাস একেবারে থম মেরে আছে। বৈশাখ শেষের আকাশে বারুদের গন্ধ।

সুলগ্না ঝিনুককে টানল,— ঝড় আসছে। চল্ তাড়াতাড়ি মেট্রোতে চলে যাই।

ঝিনুক দ্বিধায় পড়ল,—বাসে গেলে ভাল হত রে। একদম টানা বাড়ি অব্দি...

—ওই বাসে তুই উঠবি এখন ? বাস তো এখন ফার্নেস ! চল্ চল্, আমি রবীন্দ্র সরোবরে নেমে যাব, তুই টালিগঞ্জ থেকে রিক্‌শা ধরে নিস্।

ঝিনুক আবার আকাশ দেখল। কালবৈশাখী আসছে। আসছেই।

দুই

নিউমার্কেটে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রমিতা। পলাশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, রমিতা পাশে নেই দেখে ঘুরে তাকিয়েছে। রমিতা হাত নেড়ে ডাকল পলাশকে,— এই দেখে যাও, জিনসের এই স্কার্টটা কী দারুণ !

সন্ধ্যার সাজে নিউমার্কেট এখন বর্ণাঢ্য আরও। সার সার চমকদার আলোয় চোখ টানছে রকমারি লোভনীয় পশরা। অসংখ্য আলোর সঙ্গে মানুষের নিশ্বাস মিশে বৈশাখী উত্তাপ গাঢ় থেকে গাঢ়তর।

পলাশ রমিতার পাশে এসে সিগারেট ধরাল। শোকেসের গায়ে ক্লিপ দিয়ে টান টান ফ্যাকাশে নীল জিন্‌সের স্কার্ট এমন ভাবে টাঙানো যেন এক অদৃশ্য নারীদেহ পরে আছে পোশাকটা।

রমিতা উচ্ছ্বাসে ঝলমল করে উঠল,— কী এক্সকুইজিট ! তাই না !

পলাশ অবশ্য স্কার্টটাতে বিশেষ কোন সৌন্দর্য খুঁজে পেল না, সিগারেটে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করল,— স্পেশালিটিটা কী ?

—কাটটা কী অসাধারণ। উফ্, এই শেডের জিনস আমার এত ভাল লাগে !

পলাশ মুখে আগ্রহের ভঙ্গি ফোটাল, তবে ভঙ্গিটা যে কৃত্রিম, সেটা নজর এড়াল না রমিতার। রমিতা একটু মুখ ফুলিয়ে শোকেসের সামনে থেকে সরে এল।

পলাশ নীচু গলায় বলল,— কিনবে ওটা ?

—থাক্, অত সুন্দর জিনিসটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারলে না। ইঞ্জিনিয়ারিং-ই পাশ করেছ, কোন রুচি গড়ে ওঠেনি।

রাগলে রমিতার নাকের পাটা ফুলে যায়, রক্তের আভা ছড়িয়ে পড়ে মুখে। সেদিকে তাকিয়ে পলাশ হেসে ফেলল,— আহা রেগে যাচ্ছো কেন ? কিনেই ফ্যালো না।

রমিতা আরেকবার পিছন ফিরে তাকাল। স্কার্টটা ভীষণভাবে টানছে তাকে। দুর্বল হয়েও নিজেকে সামলে নিল,— না থাক্, তোমার মা আবার কী ভাববে !

—মা যেন তোমার স্কার্ট পরা ছবি দেখেনি ! মানালির অর্ধেক ছবিতেই তো তুমি স্কার্ট নয় প্যান্ট পরা, মা কিছু বলেছে দেখে ?

রমিতা প্রতিবাদ করতে পারল না। হানিমুনে রমিতার নানা রকম ড্রেস পরা ছবি দেখে পলাশের মা মুখ টিপে হেসেছে শুধু। এদিক দিয়ে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট আধুনিক। পলাশের বাবাই যা একটু...।

রমিতার মাঝে মাঝে নিজেরই কেমন অবাক লাগে। এই যে পুরুষটা তার সঙ্গে হাঁটছে, এই আলোময় সুদৃশ্য বাজারের মাঝখান দিয়ে, একে তো সে চিনতও না ছ' মাস আগে। পলাশের মা বাবা দাদা বৌদিদের সঙ্গে যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, তার সম্ভাবনাও মনের কোণে উঁকি দেয়নি কখনও। কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায় মেয়েদের জীবন! দু একটা ছোটখাটো যোগাযোগ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, মাত্র কয়েক মাস একত্রে বাস করার অভ্যাস, তাতেই কত চিন্তাভাবনার বদল ঘটে যায়! পলাশের ভাল লাগা মন্দ লাগা, পলাশের পরিবারের প্রত্যেকের পছন্দ অপছন্দ অনিবার্য ভাবে প্রতি মুহূর্তে স্মরণে আসে আজকাল। এই কি বন্ধন!

নিউমার্কেটের বাইরে এসে রমিতা বুক ভরে শ্বাস টানল। বাজারের অসহ্য গুমোট থেকে মুক্তি। কিন্তু না, বাইরেও উত্তাপ কম নয়, বড় বিশ্রী ভ্যাপসা ভাব। বাতাসও সম্পূর্ণ স্থির। নিউমার্কেটের দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। দক্ষিণ গেটের সামনে দু তিনটে অল্পবয়সী ছেলে অবিরাম সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ ভাসিয়ে যাচ্ছে শূন্যে। আলোর প্রতিফলনে জলবিম্ব ক্রমশ রঙিন। রঙিন গোলক ভাসছে। ভাসছে। ভাসতে ভাসতেই ফেটে যাচ্ছে পথচারীদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে।

রমিতা মুগ্ধ চোখে ভাসন্ত বুদ্‌বুদ্‌ দেখছিল, পলাশ আচমকা ছুটেছে,— অ্যাই ট্যাক্সি, ট্যাক্সিইই....

কলকাতা শহরে প্রয়োজনের সময় ট্যাক্সি পাওয়া লটারি পাওয়ার শামিল। অন্ধকার নেমে গেলে তো কথাই নেই, ট্যাক্সি তখন চালকের মেজাজ নির্ভর।

উৎফুল্ল পলাশ ফাঁকা ট্যাক্সির জানলা দিয়ে মুখ গলাল।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল,— কোন্‌ দিক?

—সাউথ। টালিগঞ্জ।

—আমি নর্থ। দার্শনিকের হাসি ট্যাক্সি চালকের ঠোঁটে। হাসতে হাসতেই অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও পলাশ কোন রকমে ঝুঁকে টাল সামলালো।

পর পর কয়েকটা ট্যাক্সির সঙ্গে গন্তব্য নিয়ে লুকোচুরি খেলায় শেষ পর্যন্ত হেরে গেল পলাশ। অসহায় ক্ষোভে ডান হাতের মুঠো ঠুকছে বাঁ হাতের চেটোয়। বিড়বিড় করে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে চলেছে শহরের তাবৎ ট্যাক্সিওয়ালাদের। টকটকে ফর্সা রঙ, একটু মেয়েলি মুখ, পলাশকে এসব সময়ে এমন ছেলেমানুষ লাগে! রমিতা হেসে

ফেলল,— ছাড়ো তো, এসপ্ল্যানেডে গিয়ে মেট্রো ধরি চলো।

পলাশ নিমপাতা খাওয়া মুখে বলল,— তোমার উচিত ছিল আজ বাড়ির গাড়িটা আনা।

—ওই গাড়ি! রমিতা চোখ টিপল,— আচ্ছা, ওই থুরথুরে মরিস মাইনরটা বেচে একটা বাইসাইকেল কিনে নেওয়া যায় না? তুমিও চালিয়ে অফিস যেতে পারো।

—ফাজলামি হচ্ছে! গাড়িটার সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু জানো? দাদুর প্রাণ ছিল ওই গাড়ি। সেকেন্ড ওয়াইফ। জ্যাঠারা বেচে দিতে চেয়েছিল, বাবা সম্পত্তি ভাগের সময় যেচে ওটা নিয়েছে। গাঁক গাঁক করে তেল খায়, তাও। পলাশও খেপাল রমিতাকে,— দাঁড়াও বাবাকে আজ গিয়ে বলছি, তুমি তোমার দিদিশাশুড়িকে নিয়ে ঠাট্টা করছ।

—না না বোলো না প্লিজ।

—বলেও অবশ্য লাভ নেই। বাবা তোমাকে কিস্যু বলবে না।

—কেন? নতুন বউ বলে?

—উঁহু, সুন্দরী বউ বলে।

কন্‌ট্রাস্ট পাড় সবুজ সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়িতে স্তুতিটা আলতো করে মেখে নিল রমিতা। লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে হাঁটছে দু'জনে। হঠাৎ একটা মারুতি সামনে এসে পড়ায় পলাশ জোরে টেনেছে রমিতার হাত, এত জোরে যে পলা আর মুনস্টোন পরা রমিতার আঙুল টনটন করে উঠল।

রমিতা হাত ছাড়িয়ে কয়েক বার মুঠো বন্ধ করল, খুলল,— উফ্, তোমাদের, লিওদের হাত এমন চাষাড়ে হয়!

পলাশ হো হো করে হেসে উঠল,— আর তোমাদের, জেমিনিদের হাত বড় বেশি ডেলিকেট্।

রমিতা জিভ কাটল,— এম্মা একদম মনে নেই, শ্রীযোগী তোমাকে একটা গোমেদ ধারণ করাতে বলেছিলেন। দু রতির।

—মাকে বলেছ? মার একটা ভাল দোকান চেনা আছে। ঠকায় না।

—একদম ভুলে গেছি। এই, তোমার মা'র কী রাশি গো?

—বোধহয় টরাস।

—আমার মনে হয় লিব্রা। তোমার বাবার টরাস হলেও হতে পারে। টরাসরা একটু কন্‌জারভেটিভ্ হয়।

—কেন? আমার বাবার মধ্যে সেকেলেপনার কি দেখলে!

—সেদিন তোমার মাসতুতো বোনের বিয়েতে লাহেঙ্গা চোলি পরে গিয়েছিলাম, তাই নিয়ে মা'র কাছে বাবা গজগজ করছিলেন, আমি নিজের কানে শুনেছি। মা যত বলেন এটাই ফ্যাশান, বাবা কিছুতেই বুঝতে চান না। খালি বলছেন কাসুন্দের চৌধুরী বাড়ির একটা ইজ্জৎ নেই! বনেদী বাড়ির বউ ওরকম একটা পিঠখোলা পোশাক পরে বিয়েবাড়ি যাবে!

—বাবা ওইরকমই। একটু খুঁতখুঁতে। কাসুন্দে ছেড়ে গলফ্ ক্লাবে এসেও সারেকি মেজাজ যায়নি। আফটার অল আগের জেনারেশান তো।

—তুমিই বলো ড্রেসটা কি খারাপ ছিল?

—খারাপ নয়। ডেয়ারিং। পলাশ মুখে চোখে বিচিত্র মুদ্রা করল, —এনি বডি কুড হ্যাভ ফলেন ফর ইউ।

রমিতা আলগোছে ধাক্কা দিল পলাশকে। এখন খুব কথা ফুটেছে পলাশের। মানালিতে হানিমুনে গিয়েও এত লাজুক ছিল প্রথম প্রথম। সন্ধ্যাবেলা উচ্ছল বিপাশার ধারে, হোটেলের বারান্দায়, দীর্ঘ সময় স্থির বসে থাকত তার পাশে। রমিতাকেই কত বার গায়ে পড়ে পলাশের ধ্যান ভাঙাতে হয়েছে, —হ্যাঁ গো মশাই, তুমি নাকি ইংলিশ মিডিয়াম কো-এড স্কুলে পড়েছিলে!

—পড়েছি তো।

—তারপর নাকি চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে ছিলে!

—ছিলাম। সো?

—ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলেই থাকতে তো! নাকি কোন মনেস্ট্রিতে!

পলাশ ভ্যাবলার মত তাকিয়ে থাকত রমিতার মুখের দিকে। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এক সময় চোখ নামিয়ে নিত। রমিতার হাত ছুঁয়ে বলত,— আমাকে কি তোমার মংক্ মনে হয়?

—তাহলে সারাক্ষণ এত চুপচাপ কেন?

—সুন্দরের সামনে চুপ করে থাকাই তো নিয়ম।

—কোন্‌টা সুন্দর? বিপাশা? বরফমাখা পাহাড়? পাইন বন? জলের শব্দ?

—তুমি।

কী আশ্চর্য নরম স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করেছিল পলাশ। তুমি। যেন শব্দ নয় পাইন বনের ফাঁকে ফাঁকে মানালির মিহি বাতাসের স্পন্দন। এখনও শব্দটা রিন রিন করে অনুক্ষণ বাজে রমিতার বুকে। সে যে সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর, এ কথা জন্ম থেকে কয়েক লক্ষ বার

শুনেছে সে। তার ত্বক শঙ্খের মত মসৃণ, বাঁশপাতার মত পাতলা তার ঠোঁট, পল্লবিত আঁখি, দ্যুতিময় মুখমণ্ডল, কাশ্মীরি আপেলের মত গায়ের রঙ। নিজের সম্পর্কে এ সব বিশেষণ মুখস্থ আছে রমিতার। একটু বেশি রকমই আছে। তবু ওই 'তুমি' শব্দটা যেন অনেক অনেক বেশি মায়াময়। অদৃষ্টে গভীর বিশ্বাস রমিতার। সেই অদৃষ্টই বোধহয় পলাশকে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছিল রমিতার জন্য।

রমিতা একটা খাবার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল,— এই, ভেলপুরি খাবে ?

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ! হ্যাহ্। এখন চারদিকে খুব আন্ত্রিক হচ্ছে। কাগজে দেখছ না ?

—যাদের হচ্ছে তাদের হচ্ছে। বাইরে খেলেই আন্ত্রিক হয় না। রমিতা গলা নামাল,— ওই দ্যাখো না সামনের মহিলাকে। এই খেয়েও কেমন স্বাস্থ্য রেখেছে !

পলাশ বিশালকায়া মহিলাকে এক ঝলক দেখে নিল। কী নিপুণ কায়দায় একটার পর একটা ফুচকা ঢুকে যাচ্ছে মহিলার মুখগহ্বরে ! ফিসফিস করে বলল,— স্বাস্থ্য নয়, বলো বপু। সার্কাসের জলহস্তীকে ফুলকপি খেতে দেখেছ কখনও ? অবিকল সেই হাঁ। ওই খেলে তোমারও ওরকম স্বাস্থ্য হবে।

—হবে হবে, আমার হবে। বলো নাগো দুটো ভেলপুরি। ভাল করে সস্ দিয়ে মেখে।

খেতে খেতে মুখ দিয়ে নানা রকম তৃপ্তির শব্দ করছিল রমিতা। পলাশ বলল,— বাবা যদি এখন দেখে, বাড়ির বউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে.....

—কিছুই হবে না। পাশে দাঁড়িয়ে আরেকটা দিতে বলবেন। বাবা খুব খেতে ভালবাসেন, আমি জানি।

—কই আর তেমন খেতে পারে আজকাল ! ডাক্তার তো অর্ধেক খাওয়াই মেরে দিয়েছে। নুন বন্ধ। মিষ্টি বন্ধ। পলাশের কপালে ভাঁজ পড়ল,— বাবাকে নিয়ে বড় চিন্তা হয়, জানো। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে....। এবারও ইয়ার এন্ডিং-এ খুব স্ট্রেইন গেল। বিজনেস নিয়ে যা টেন্‌শান সারাক্ষণ। ফ্রেশ ও ডি-র জন্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

হাওড়াতে পলাশদের পুরনো আমলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরির ব্যবসা। এত দিন স্কুল কলেজে ওই যন্ত্রপাতির চাহিদা ছিল, ইদানীং সে চাহিদায় ভাঁটার টান। কারখানার নিজের অংশটাকে তাই আধুনিক করে গড়ে তুলতে চাইছে পলাশের বাবা। সুবিধা হচ্ছে না। ব্যাংক

এখন সহজে লোন দিতে চায় না। এক হর্ষদ মেহেতাই যা টলমলে অবস্থা করে দিয়েছে ব্যাংকগুলোর !

রমিতা বলল,— বাবাকে ক'দিন নার্সিংহোমে রেখে একটা থরো চেকআপ্ করিয়ে নিলে হয় না ?

—দাদাও সে কথা বলছিল। আমি ভাবছি আগে একটা ভাল কার্ডিওলজিস্ট দেখিয়ে নিই। সিন্‌হাদা ডক্টর সুমিত কেশানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেও দিয়েছেন। শুক্রবার সঙ্গে সাতটায়।

—আশ্চর্য ! শুক্রবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে ! ও দিন না তোমার আমার সঙ্গে মা-বাবার ওখানে যাওয়ার কথা !

—ও নো। পলাশ চোখ বুজে দু'দিকে মাথা দোলালো,— একদম খেয়াল ছিল না। তোমাদের বাড়ি পরের দিন গেলে হয় না ? রাত্রে নয় থেকে আসব।

রমিতা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পই পই করে পলাশকে ওই দিনটার কথা বলে রেখেছে, তবু পলাশ কি করে ভুলে গেল ! সেদিন ও বাড়িতে মেজ মাসি আসবে, বিয়ের সময় জব্বলপুর থেকে আসতে পারেনি, শুক্রবার সারা দিন থাকবে ওখানে। বার বার করে রমিতা-পলাশকে ওই দিন জোড়ে আসতে বলে দিয়েছে বাবা মা। পলাশের কী দরকার ছিল বাবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নেওয়ার ! পলাশের দাদা দশটা-পাঁচটা বাবার ফ্যাক্টরিতে বসেই খালাস, বৌদি বাড়ির কুটো নেড়ে দুটো করে না, তারা এ দায়িত্ব নিতে পারত না ! রমিতার ভীষণ ইচ্ছে সেদিন মাসতুতো বোন মহাশ্বেতার সঙ্গে প্রাণ খুলে আড্ডা মারার, গল্প করার, খুনসুটি করার। কত দিন পর যে দেখা হবে ! দেড় বছর ? না দু বছর ? শুধু বিয়ের পর থেকেই কত কথা যে জমে গেছে রমিতার ! পলাশকে না নিয়ে সেদিন কি করে যাবে বারাসতের বাড়িতে ! রমিতার নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো কী বিশ্রী ভাবেই না জড়িয়ে গেছে এই সদ্য-পরিচিত যুবকের সঙ্গে ! এদের পরিবারের সঙ্গে !

একটা লম্বা নিশ্বাস গড়িয়ে এল রমিতার বুক থেকে। এও কি বন্ধন !

পলাশ নিজের মনে বলে উঠল,— ক'দিন চেঞ্জে গেলে বাবা বোধহয় একটু ফ্রেশ হতে পারে। যদি গুরুদেবের ওখান থেকেও ক'দিন ঘুরে আসে....

রমিতা নিস্পৃহ মুখে শুনল কথাটা, কিছু বলল না।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ক্লোজ সার্কিট টিভি'র সামনে থোকা

থোকা জটলা। ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটের ভারত বনাম সাউথ আফ্রিকার ভিডিও টেপ চলছে। পলাশ টিকিট কেটে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, রমিতা পলাশের হাত ধরে টানল,— একদম নয়। আমি যখন সঙ্গে থাকব, তখন শুধু আমি। আর কিচ্ছু না।

অফিসযাত্রীদের ভিড় কমে গেছে। তবু বেশ কিছু লোক খানিক পর পর লাইন করে দাঁড়িয়ে। পাতালযানের অপেক্ষায়। রমিতা ট্রেনে উঠে বসার সিটও পেয়ে গেল। এক বৃদ্ধ মানুষ বসতে গিয়েও রমিতাকে দেখে সসম্ভ্রমে জায়গা ছেড়ে দিল। এ সব ব্যাপারেও রমিতা খুব একটা আশ্চর্য হয় না। সুন্দরী মেয়েদের এটুকু সুবিধা প্রাপ্য। রমিতা জানে।

পলাশ মাথার ওপরের রড় ধরে রমিতার দিকে ঝুঁকল,— তোমার দিদি আমাদের চিঠির উত্তর দিল না তো!

—দেবে। ওরা যা ব্যস্ত থাকে। এ তো আর আমাদের দেশের গভর্নমেন্টের চাকরি নয়।

—ঠিকই তো। ওদেশে সবাইকেই খেটে খেতে হয়। পলাশ ব্যঙ্গটা ফিরিয়ে দিল,—চলো না, আমরাও কানাডায় চলে যাই। তোমার জামাইবাবুকে একটা জব ভাউচার পাঠাতে বলো।

রমিতার বুকে সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটল। তার থেকে কম সুন্দরী হয়েও কেমন এন আর আই পাত্র জুটে গেছে দিদির। পলাশরা যতই বনেদী হোক, দিদির শ্বশুর বাড়ির তুলনায় কোথায় যেন খামতি আছে এদের। পলাশও কি আর মিহিরদার মতো অত উঁচুতে উঠতে পারবে! সরকারি অফিসের ইঞ্জিনিয়াররা কতই বা আর ওপরে ওঠে! মিহিরদাদের তিন তিনটে মহাদেশ জোড়া কম্পানি, কানাডাতেই বছরে আট মাসের বেশি থাকতে পারে না মিহিরদা। অথচ সেও তো পলাশের মতোই এ দেশ থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। রূপ বেশি থেকেও রমিতা যেন বিয়ের বাজারে সামান্য ঠকে গেছে। আচমকা রুক্ষ হল রমিতা— ইচ্ছে থাকলে নিজেই চেষ্টা করো। অন্যকে বলব কেন?

রমিতার আকস্মিক ঝাঁঝে পলাশ থতমত।

আলো আঁধারের আবছায়া বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে সুড়ঙ্গ পথ ধরে ছুটছে ট্রেন। যান্ত্রিক কণ্ঠ পার করে দিচ্ছে একের পর এক স্টেশন। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন । ভবানীপুর থেকে টানা কামরাগুলোতে ভিড় অল্প বেড়েছে। রমিতার পাশের সিট খালি হতে

পলাশ সেখানে বসল,— কি হল, চুপ মেরে গেলে কেন ? রাগ হয়েছে ?

রমিতা পলাশের অপ্রস্তুত মুখ দেখে হেসে ফেলল,— মনে রাখবে শনিবার নয়, শুক্রবার।

—কী শুক্রবার ! কী শনিবার !

—আমাদের বাড়ি শুক্রবার। তোমার বাবার ডাক্তার শনিবার। নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।

ভূগর্ভ ছেড়ে মর্ত্যে উঠছে পাতালযান। মাটিতে উঠতেই প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা অনুভব করল রমিতা। এসপ্ল্যানেডের গোমড়া আকাশ টালিগঞ্জে কালবৈশাখী হয়ে দাপাদাপি করছে। উন্মত্ত বৃষ্টির দাপটে চতুর্দিক ধোঁয়া ধোঁয়া। ঝাপসা।

বাইরের চাতালে বেশ ভিড় জমেছে। বৃষ্টির ফলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হুড়মুড়িয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে লোকজন, ঠিক ততটাই ভিতরে, যেখান থেকে ছুটে গিয়ে প্রথম বাস বা রিকশায় উঠে পড়া যায়। বৃষ্টি থামলেই।

পলাশ ভিড় ঠেলে রমিতাকে নিয়ে সামনের দিকে এসে দাঁড়াল। খোলা আকাশের নিচে পাঁচ-সাতটা মোটরসাইকেল স্কুটার অনর্গল বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। রাস্তার আলো বৃষ্টির ঝরোখার আড়ালে ম্লান।

পলাশ পলকা রসিকতা জুড়ল,—টু হুইলারগুলোর যাতনা দ্যাখো। অবোধ মোষের মত ভিজছে। সাধে কি আর কিনতে চাই না ! কিনলে ফোর হুইলার।

আকাশচেরা বিদ্যুতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল রমিতা,— কথাই সার। দু মাস ধরে তো শুধু প্ল্যানই ভাঁজতে শুনছি।

—আজ্ঞে না। সিটি ব্যাংকে কথা বলে এসেছি। থার্টি পারসেন্ট ডাউন পেমেন্ট। বাকিটা পাঁচ বছরের মান্থলি ইনস্টলমেন্ট।

হঠাৎ একটা জোর ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল রমিতাকে। রমিতা নিজেকে আড়াল করার সময়ও পেল না। ঠিক তখনই পিঠের খোলা জায়গাতেও এক অচেনা হাতের স্পর্শ। চমকে তাকাতেই হাতের মালিকের চোখে চোখ। বছর কুড়ি একুশের এক রূপবান তরুণ। গলায় সোনার সরু চেন, গায়ে জমকালো ব্যাগি শার্ট, চোখমুখ ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়।

ছেলেটা ঢুলুঢুলু চোখে হাসল। কুৎসিত অশ্লীল চাহনি। রমিতা পলাশের দিকে ঘেঁষে এল। আঁচল টেনে শরীরের অনাবৃত অংশগুলো ঢেকে নিল ভাল করে। পিঠ। কোমর। নাভিদেশ।

আবারও একটা নোংরা হাত স্পর্শ করছে শরীর। রমিতা আরও সরল পলাশের দিকে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে ছেলেটা একা নয়। আরও কয়েকজন আছে। সামনে। পিছনে। পাশে।

পিছন থেকে একজন বেশ জোরে চিমটি কাটল রমিতার নিতম্বে। রমিতা কুঁকড়ে গেল। পাশ থেকে দাড়িওয়ালা বেশ বড়সড় চেহারার এক যুবক কোন কারণ ছাড়াই মৃদু ধাক্কা দিল পলাশকে। পলাশ কিছু বুঝতে না পেরে ঘুরে তাকিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা খেঁকিয়ে উঠল,— সোজা হয়ে দাঁড়ান। গায়ে পড়ছেন কেন ?

—আমি কী করলাম ! আপনিই তো আমায় ধাক্কা মারলেন।

—একদম ফালতু কথা বলবেন না। বলেই ছেঁলেটা আবার ধাক্কা দিল। এবার বেশ জোরে।

পাশ থেকে নীল জিনসের জ্যাকেট পরা একজন বলে উঠল,— হুই, সোজা হয়ে দাঁড়া।

—তুই তোকারি করছেন কেন ? নিজেরা ইচ্ছে করে গায়ে পড়ছেন...

—অ্যাই, মুখ সামলে। কে তোর গায়ে পড়েছে ?

—ইউ স্কাউন্ড্রেল !

—খিস্তি দিচ্ছিস কাকে বে ? ব্যাগি শার্ট হ্যাঁচকা টান মেরে রমিতাকে সরিয়ে দিল পলাশের পাশ থেকে,— মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে রোয়াব বেড়ে যায়, অ্যাঁ ?

পলাশ রাগে ভাষা হারাল। রমিতা পলাশের হাত ধরে টানল,— সরে এসো তো। যত সব রাফিয়ানের দল।

একটা ছেলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। পরিস্কার বোঝা যায় ছেলেগুলো রীতিমত পরিকল্পনা করে একটা অঘটন ঘটাতে চাইছে। হাসতে হাসতেই কালো টিশার্ট পরা ছেলেটা রমিতার থুতনি ধরল,— হোয়াট আ সুইট ভয়েস।

এবার পলাশ জ্ঞান হারাল। ঝাঁপিয়ে পড়ে কলার চেপেছে কালো টি শার্টের। উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে চেঁচাচ্ছে,— দেখেছেন ! দেখেছেন এদের কাণ্ডটা ! আমাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরে এখন আমার স্ত্রীর গায়ে পড়ছে !

—অ্যাই চোপ। দেব এক ঝাপড়। পেন্টু খুলে নাঙ্গা করে দেব।

জনতা নীরব।

পলাশ পাগলের মত চিৎকার করে উঠল,— কে ঝাপ্পড় মারবে ? কোন্ শুয়োরের বাচ্চার সাহস আছে দেখি ?

দাড়িওয়ালা বলশালী ছেলেটার ঠেলা খেয়ে পলাশ নিমেষে মুখ থুবড়ে পড়েছে খোলা চাতালে। ব্যাগি জামা আর কালো টি শার্ট দু দিক থেকে চেপে ধরল রমিতার হাত।

জনতার মুখে রা নেই। যেন রুদ্ধশ্বাস কোন ফিলমের শুটিং দেখছে সবাই।

পলাশ উঠে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে আসছিল। দাড়িওয়ালা মাঝপথে রুখে দিয়েছে তাকে। ধস্তাধস্তিতে ভিড় প্রায় ছত্রখান। হতচকিত ভিড়ের মানুষ যে যেদিকে পারে সরে সরে যাচ্ছে।

রমিতা আর্তনাদ করে উঠল,— কী অসভ্যতা আরম্ভ করেছেন ! ছাড়ুন আমাকে। ছাড়ুন বলছি।

ব্যাগি শার্ট সুর করে গেয়ে উঠল,— আজ না ছোড়ুঙ্গা তুঝে দমদমাদম ...

কালো টি শার্ট নাচের ভঙ্গিতে কোমর দিয়ে ধাক্কা মারল রমিতার কোমরে। তাদের কারুর মুখে এতটুকু ক্রোধের চিহ্নও নেই। হুবহু ফিল্মি নায়কদের ভাবভঙ্গি তাদের শরীরে, দিলমে হ্যাঁয় তুফান বড়া দমদমাদম...

—নাচ মেরি জান জরা দমদমাদম

পলাশ প্রাণপণে বলশালী ছেলেটার হাত থেকে ছাড়াতে চাইছিল নিজেকে,— ইউ ডার্টি বাস্টার্ডস ! আই উইল কিক ইত্তর

দাড়িওয়ালা সশব্দে চড় কষাল তাকে,— কিপ কোয়ায়েট ইউ সান অফ আ বিচ।

রমিতা অসহায় ভাবে ভিড়ের মানুষের সাহায্য চাইল,— আপনারা কিছু করুন। প্লিজ কিছু করুন।

এতক্ষণে ভিড় থেকে গুঞ্জন উঠেছে। টুকরো টুকরো মন্তব্য ফুলঝুরির মত জ্বলে উঠেই নিবে যাচ্ছে।

—কি হচ্ছেটা কি ! ছেড়ে দিন না দাদা।

—মেয়েছেলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এত মাথা গরম করলে চলে ?

—ওকে তো প্রোভোক করল মশাই।

—নিজেরা মারপিট করুন না। মেয়েছেলেটাকে টানছেন কেন ?

—এদের দরকার ঝাড়। বুঝলেন ? ঝাড়। হাত পায়ের আঙুলগুলো থেঁতলে দিলে ...

শেষ কথা বলা মাঝবয়সী লোকটা হঠাৎই ককিয়ে উঠেছে নীল

জিনসের লাথিতে। পলকে গুঞ্জন স্তব্ধ। জনতা আবার বোবা। শুধু বৃষ্টির হাহাকার ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। প্রতিপক্ষহীন মানুষের জঙ্গলে নির্ভীক বীরের দল এবার রমিতাকে নিয়ে উল্লাসে মেতেছে। ঝটকা টানে রমিতার আঁচল লুটিয়ে পড়ল। কালো টি শার্ট রমিতাকে দু হাতে জাপটে ধরে গেয়ে উঠল— চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়...

এক অদ্ভুত-অসহায় ক্ষোভের সঙ্গে চূড়ান্ত অপমান মিশে রমিতার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ অচল হয়ে গেল। কি হচ্ছে, কি ঘটছে, কোন কিছুই বুঝবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেছে তার। দাড়িওয়ালা পলাশকে ঠেলে নিয়ে গেছে দেওয়ালের দিকে। পলাশেরও আর প্রতিরোধের শক্তি নেই।

ভিড়ের একেবারে পিছনে, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ঝিনুক। বৃষ্টি দেখে সে প্ল্যাটফর্ম থেকেই বেরোয়নি। গণ্ডগোল যখন চরমে, আচমকা ভিড় ঠেলে দৌড়ে এসেছে সে। নায়কদের কীর্তিকলাপ দেখে প্রথমটা তারও মস্তিষ্ক অচল। চোখের সামনে এ কোন্ দৃশ্য! এ কি বাস্তব! না কল্পনা!

মুহূর্তে কী যেন হয়ে গেল ঝিনুকের! কাঁধের ব্যাগ দুহাতে চেপে দৌড়ে এসেছে দৃশ্যের মাঝখানে।

—অ্যাই জানোয়ার, ছাড়, ছাড়, বলছি। চেহারাপত্র সব ভদ্রলোকের মত

নীল জিনসের জ্যাকেট কাছে এগোতেই হাতের ভারী ব্যাগ প্রচণ্ড শক্তিতে চালিয়েছে ঝিনুক। উদভ্রান্তের মতো এলোপাথাড়ি ব্যাগ ঘুরিয়ে যাচ্ছে। কালো টি শার্টকে পিছন থেকে জোর টান মারায় রমিতা মুক্ত হয়েছে অনেকটা। লুটনো আঁচল কোনওক্রমে গায়ে জড়াতে জড়াতে সে দেখল কালো টি শার্ট এগিয়ে যাচ্ছে তার রক্ষাকর্ত্রীর দিকে।

তীব্র ঘৃণায় ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠল,— আপনারা এতগুলো লোক হাঁ করে দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সকলের চোখের সামনে একটা মেয়েকে এভাবে ...

কালো টি শার্ট হাত মুচড়ে ধরল ঝিনুকের। অন্য হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে আঘাত হেনেছে তার চোয়ালে। পরক্ষণে তাকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়েছে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিচক্রযানগুলোর দিকে।

ঝিনুক উঠে ঠোঁট মুছতে মুছতে আবার দৌড়ে এল। ততক্ষণে ব্যাগি জামা আর কালো টিশার্ট রমিতাকে নামিয়ে নিয়েছে বৃষ্টিতে।

ব্যাগি জামা একটা মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে। কালো টি শার্ট রমিতাকে টেনে হিঁচড়ে বসাতে চাইছে তার আর ব্যাগি জামার মাঝখানে। দাড়িওয়ালা পলাশকে ছেড়ে আরেকটা মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিতে ছুটল। জিনসের জ্যাকেট আরেকটায়। ঝিনুক ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে দু হাতে টানল রমিতাকে। টানাটানিতে রমিতা ঝিনুক দুজনেই গড়িয়ে পড়ল জলকাদায়।

অবশেষে জনতার চৈতন্য এসেছে। হয়তো বা ঝিনুককে দেখেই! ব্যাগি জামা আর কালো টি শার্টের দিকে রে রে করে তেড়ে গেল কয়েকজন। দু-চারজন পলাশের সঙ্গে দৌড়েছে অন্য দুটো মোটর সাইকেলের দিকে। বিকট গজন তুলে দুটো মোটর সাইকেল পলকে বেরিয়ে গেল। নীল জিনস তৃতীয় বাহনটাকে চালু করার জন্য দমাদ্দম লাথি মারছে। সিক্ত টু হুইলার গোঁয়ারের মত অনড়। আবার লাথি মারল। আবারও। বলশালী যুবক কিছুটা এগিয়েও ফিরে এসেছে বন্ধুকে উদ্ধার করতে। এলোমেলো মোটর সাইকেল ছুটিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে,— কাম অন সুমন। লিভ দ্যাট ব্লাডি জাংক।

নীল জিনসের জ্যাকেট উল্টোপাল্টা হাত চালিয়ে জনতার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল। মরিয়া লাফে উঠে পড়ল বলশালী যুবকের বাহনে। সেকেন্ডের মধ্যে দুজনে উধাও।

রমিতা কাদায় বসে ঠকঠক করে কাঁপছিল, পলাশ তাকে উঠিয়েছে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত,— নোংরা নোংরা। নোংরা ডাস্টবিন হয়ে গেছে শহরটা।

ঝিনুকের ওড়না বৃষ্টি জল কাদায় গড়াচ্ছিল। ওড়নাটা তুলে ঠোঁটের নিচে চাপল ঝিনুক। কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কাঁধের ব্যাগ ছিঁড়ে পড়েছে পায়ের কাছে। শুধু বাবলগামটাই এখনও মুখে রয়ে গেছে তার। সেটাকে অশান্তভাবে চিবোতে চিবোতে সে গনগনে চোখে ভিড়ের দিকে তাকাল,— শহর নোংরা হয় না। শহরের মানুষরা নোংরা হয়। এতগুলো নপুংসক এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকলে ... থুঃ থুঃ।

রমিতা পলাশকে ছেড়ে ঝিনুকের হাত জড়িয়ে ধরল। লোকজনের ভিড় ক্রমশ ঘিরে ফেলেছে তিনজনকে। অজস্র অস্ফুট ধ্বনি থেকে একটি শব্দও পৃথক করা যায় না। অবয়বহীন সেই ভিড়টাকে হিংস্র চোখে দেখছিল ঝিনুক,— চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেক তো মজা দেখলেন, এবার অন্তত থানায় চলুন। বলতে বলতে

পলাশের দিকে ঘুরেছে,— ইমিডিয়েটলি ডায়েরি করা দরকার। বৃষ্টি থামলেই আমরা কিন্তু থানায় যাব।

পলাশ রোবটের মতো মাথা নাড়ল।

রমিতার বুকের ভিতর জমাট অপমান এতক্ষণে কান্না হয়ে ঝরে পড়তে চাইছে। পেট গুলিয়ে বমি এসে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাতে গিয়ে ঝিনুককে আঁকড়ে ধরে ডুকরে উঠল রমিতা।

কালবৈশাখীর বৃষ্টি আসতে যতক্ষণ, মিলিয়ে যেতেও ততক্ষণ। বৃষ্টি থামতে চাতাল থেকে রাস্তায় এল তিনজন।

ঝিনুক বলল,—দাঁড়ান, মোটর সাইকেলটার নম্বর নিয়ে নিই।

পলাশ আর ঝিনুক পরিত্যক্ত যানটার দিকে এগিয়েছে। রমিতা ছেঁড়া ব্লাউজ ঢাকতে আষ্টেপৃষ্টে গায়ে জড়াল শাড়িটাকে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ভিড়টাকে খুঁজল। ভিড়ের মানুষ যে যার মতো ছুটেছে আপন কোটরের দিকে।

তাদের সঙ্গে একটি লোকও নেই।

তিন

—আন্টি ফুল। মা তোমাকে দিতে বলেছে।

ফুটফুটে একরত্তি মেয়েটার ছোট্ট ছোট্ট হাতে গোলাপের তোড়া। তাকে ঘিরে এক ঝাঁক প্রজাপতি।

—আন্টি, তুমি বুঝি গুণ্ডাদের খুব মেরেছ?

—তুমি বুঝি ক্যারেটে জানো আন্টি? কুংফু?

—তোমার কাছে স্টেনগান ছিল না? এ কে ফিফটি সিক্স?

—ভিলেনদের গুলি করে মেরে দিতে হয়। ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা।

—কিচ্ছু ভেবো না আন্টি। বড় হলে পাজি লোকেদের আমি বটি বটি কেটে ফেলব।

খুশিতে ঝিনুকের চোখে জল এসে যাচ্ছিল প্রায়, কোন রকমে ধরা ধরা গলায় বলল,— থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। এবার তোমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বোসো।

তাজা সকালের নতুন রোদ্দুর জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ক্লাসরুমে। নবীন আলোর উত্তাপে দীপ্ত চতুর্দিক। ঝিনুকের মধ্যেও নতুন করে উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছিল। গত দুদিন ধরে এই উত্তাপে বার বার সম্পৃক্ত হয়েছে সে। এক সন্ধ্যার সাহসী প্রতিবাদ, থানার

উত্তেজিত কিছু মুহূর্ত, পর দিন কাগজে কাগজে ছোট্ট খবর। বিক্রমশীলা মহাবিহারের তরুণী শিক্ষিকা শ্রবণা সরকার জীবন বিপন্ন করেও সম্মান রক্ষা করলেন রমিতা চৌধুরী নামের জনৈকা গৃহবধূর। সেই দুপুরেই বাড়িতে সংবাদপত্রের রিপোর্টার, গতকাল কাগজে কাগজে ছবি সহ তার বীরত্বের রোমহর্ষক বিবরণ, সম্পাদকীয়তে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের অজস্র অভিনন্দন। পর পর এত সব দ্রুত ঘটে-যাওয়া ঘটনা ঝিনুককে এক আত্মতৃপ্তির ঘোরে ডুবিয়ে দিচ্ছে বার বার। শ্রবণা সরকার এখন রাতারাতি একটা নাম। একটা তারকা। একটা আদর্শ। এত খুশি যে কোথায় রাখে ঝিনুক!

অথচ এত কিছু যে হয়ে যাবে, ঝিনুক কি ভুলেও ভাবতে পেরেছিল! দিনটা তো ছিল অন্য যে কোন দিনের মতোই। নির্দিষ্ট একটা তারে বাঁধা। সকালে স্কুল। স্কুল থেকে ফেরা। দুপুরে একটু ঘুম। ছোটখাটো কাজ। বিকেল সন্ধেয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। ক্ষণিক বিষাদ। ক্ষণিক ভাললাগা। সবই তো অভ্যস্ত দিন-যাপনের ছকের ভিতর মাপে মাপে কাটা। চকিত কালবৈশাখীতে সেই ছক ওলোটপালোট।

আজকাল খবরের কাগজ খুললে প্রায়ই এ ধরনের খবর চোখে পড়ে। গৃহবধূ হত্যা। গণধর্ষণ। নারী নির্যাতন। শ্লীলতাহানি। তবে সে সব তো শুধু খবরই। সকালে চা খেতে খেতে লোকে এসব কাহিনী গপাগপ গেলে, ট্রেনে বাসে অফিসে বাড়িতে দুদিন আলোচনা করে উত্তেজনার আগুন পোহায়, তারপর স্বাভাবিক নিয়মে ভুলেও যায়। ওই খবর যে কখনও নিজের জীবনেও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, এ কথা কি কেউ কল্পনাও করে সে সময়! ঝিনুকও কি জানত ওরকম একটা ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটবে! সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকবে! মুহূর্তের উত্তেজনায় ঘটনাটার শরিক পর্যন্ত হয়ে যাবে! শুধু শরিক নয়, এক নম্বর নায়িকাও। এত দিনে ঝিনুক বড় কিছু একটা করতে পেরেছে। নাম হয়েছে ঝিনুকের।

টিফিনে স্টাফরুমে বসেও গোলাপগুলোকে শুঁকছিল ঝিনুক। তেমন একটা গন্ধ নেই, বেশ শুকিয়ে এসেছে, তবু যেন প্রাণবন্ত।

দীপিকা বলল,— তোর ঠোঁটের কাছটা তো এখনও বেশ ফুলে আছে রে শ্রবণা! আর কোথাও চোট লেগেছে নাকি?

মাধুরী স্কুলে ঝিনুকের প্রিয়তম সখী। বয়সে ঝিনুকের থেকে কিছুটা বড় হলেও। ঝিনুকের আগে সে বলে উঠল,— তাও তো

কাল-পরশু চেহারাটা দেখিসনি ! গাল-টাল ফুলে যা অবস্থা ছিল ! হ্যাঁরে, তোর হাতের ব্যথাটা কমেছে ? এক্সরে করেছিলি ?

ছোটখাটো স্টাফরুম। বড় একটা টেবিল ঘিরে গোটা কতক চেয়ার, দুটো স্টিলের আলমারি, লম্বাটে কাঠের র‍্যাক। মাথার ওপর পেল্লাই সাইজের ফ্যান। ধীরে ঘুরছে।

ঝিনুক কোণের চেয়ার ছেড়ে ফ্যানের ঠিক নিচে এসে বসল,— জোর চোট লেগেছিল গো। আরও দুদিন রেস্ট নিলে ভাল হত। মা বাবা তো বেরোতেই দিচ্ছিল না। নেহাত আজ গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে, তাই জোর করে চলে এলাম।

রমা টেবিলের এক ধারে বসে বাচ্চাদের জন্য ছুটির লেসন প্ল্যান তৈরি করছিল। গীতালির মতো সেও এক সময় ঝিনুককে ছোট ক্লাসে পড়িয়েছে। মমতা-মাখা গলায় সে বলে উঠল,— ভগবান রক্ষা করেছেন। অতগুলো গুণ্ডার সঙ্গে একা লড়াই করা কি চাট্টিখানি কথা !

গীতালি জিজ্ঞাসা করল,— কি রকম দেখতে রে ছেলেগুলো ! মুশকো মুশকো গুণ্ডা ! হাতে আর্মস ছিল !

—সেরকম কিছু তো চোখে পড়েনি। তবে মনে হয় ড্রিঙ্ক করে ছিল। চোখগুলো ঢুলুঢুলু। লম্পট লম্পট। তবে ঠিক প্রফেশনাল গুণ্ডা-মস্তানদের মতো নয়। ঝিনুক চেয়ারে হেলান দিল,— এখন এক ধরনের ক্লাস তৈরি হয়েছে না, দামি দামি জামাকাপড় পরে, দেদার টাকা ওড়ায়, টকাটক ইংরিজি বলে, মোটর সাইকেল মারুতি নিয়ে ফূর্তি মেরে বেড়াচ্ছে ... রাস্তাঘাটে এরকম ছেলে আজকাল প্রচুর দেখতে পাবেন।

মিতা টিফিন বাক্স খুলতে খুলতে ফুট কাটল,— তার মানে পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে বলছিস্ ?

—পয়সাওয়ালা না হাতি। গীতালি মুখ বেঁকাল,— যত সব দু নম্বরি পয়সা। ঘুষের টাকা। ব্ল্যাক মার্কেট আর শেয়ার মার্কেটের টাকা।

রমা খাতার গোছা পাশে সরিয়ে রাখল,— বউটার ড্রেস কী রকম ছিল রে ? সভ্য ভব্য, না প্রোভোকেটিং ?

—শাড়ি ব্লাউজ। ঝিনুক হাত ওল্টালো,— ব্লাউজটার বুক পিঠ একটু বেশি কাটা ছিল ঠিকই, তা আমার তো তেমন বেখাপ্পা লাগেনি।

—তাই বল। এ কথা তো কাগজের লোকদের বলিসনি। লেখা

এক টুকরো আপেল মুখে পুরল,— ঝড়বৃষ্টির রাত, ওরকম একটা ফাটাফাটি সুন্দরী, তার আবার ব্লাউজ লো কাট! মুনিঋষিদেরই মতিভ্রম হতে পারে...

—এ তুমি কী বললে লেখাদি? দীপিকা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছে,— তাহলে তো সমুদ্রের ধারে বিকিনি পরা মেয়ে দেখলে সব পুরুষকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। শিক্ষা সভ্যতার আর দরকার কী! জঙ্গলে থাকলেই হয়।

—পুরুষদের শিক্ষা সভ্যতার কথা আর বলিস না রে ভাই। লেখা গলা চড়াল। এক বছরও হয়নি লেখার ডিভোর্স হয়েছে। তার ছেচল্লিশ বছরের বর চোদ্দ বছর তাঁর সঙ্গে ঘর করেও এদিক ওদিক মেয়েদের সঙ্গে খুচরো প্রেম করে বেড়াত। তাই নিয়েই মারপিট, চেঁচামেচি, ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ। ছোট ছোট দুটো মেয়ে নিয়ে লেখা এখন একা। উঁচু গলায় সে বলল,—পুরুষমানুষ হল হামলানো টাইপ। ওদের টিট করার জন্য শ্রবণাদের মতো মেয়েই দরকার।

লেখার থেকে মিতা আরও কট্টর পুরুষবিদ্বেষী। তার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, দেখতেও সে খুব সুশ্রী নয়, বহু বার পাত্রপক্ষের সামনে নাজেহাল হতে হয়েছে তাকে, দেখতে দেখতে বয়সও বেড়েছে, বিয়ের সম্ভাবনা তার আর নেই বললেই চলে। সে হিসহিসিয়ে উঠল,— পুরুষমানুষ হল কুত্তার জাত। তফাত শুধু এইটুকুই, ওদের বারো মাসই ভাদ্র মাস।

সকলে হেসে উঠতে যাচ্ছিল, গীতালি চাপা ধমক দিল,— কত দিন বলেছি, স্টাফরুমে বসে কেউ খারাপ কথা বলবে না। ভুলে যেও না, তোমরা এখানে সবাই টিচার।

দীপিকা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিল,— তা হ্যাঁরে শ্রবণা, ছেলেগুলো ধরা পড়েছে?

মাধুরী বলল,— ধরা পড়লে তো কাগজেই বেরোত।

—কাগজের কথা বাদ দে। ওরা সব রসাল খবর ছাপে বিক্রি বাড়ানোর জন্য। দেখিস না, একদিন-দুদিন গপ্পো ফেঁদেই কেমন চুপ মেরে যায়।

—কাগজে বেরোলে লাভও আছে। ওদের না ধরে পুলিশের এখন উপায়ও নেই। চাইলেও কেস চাপতে পারবে না। তাই না রে শ্রবণা?

—হুঁ, আমারও কাজ বাড়বে। ঝিনুক কাঁধ ঝাঁকাল,— আমাকেও

হয়তো থানায় গিয়ে আইডেন্টিফাই করতে হবে।

রমা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল,— তোর ভয় করবে না? আবার ওই গুণ্ডাবদমাশদের সামনে যাবি?

ঝিনুক হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল,— না না আন্টি, ওরা আর কিস্যু করতে পারবে না। ধরলে পুলিশ ওদের এমন মাখন করে দেবে...।

মাধুরী বলল,— দ্যাখ্ পুলিশ কবে ধরে। সেদিন যে ডায়েরি নিয়েছে এই কত ভাগ্যি।

—না রে মাধুরীদি, ও সিটা লোক ভাল। আমাদের দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বসতে বলে সব কথা মন দিয়ে শুনল। নিজেই বলল, ভাববেন না, একটা মোটর সাইকেল যখন পড়ে আছে, ও বাছাধনদের আর ট্যাঁ ফোঁ করতে হবে না। আমি এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছি, মোটর সাইকেল থানায় নিয়ে চলে আসবে। আমার কলেজের এক বন্ধু আছে সুলগ্না, ওর মামা লালবাজারে আছে, ও বলছিল লালবাজারেও নাকি সাড়া পড়ে গেছে। পুলিশ কমিশনার নিজে থানায় খবর নিচ্ছেন।

—খবর নেওয়াই সার। দু দিন তো কেটে গেল, মূর্তিমানরা কোথায়?

—আমার মনে হয়. ডিউটি অফিসারটা কিছু প্যাঁচ কষছে। সেদিনই এমন বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করছিল!

রঞ্জনার জুলাইতে বিয়ে। সে এতক্ষণ দূরে বসে শুনছিল আলোচনাটা। হঠাৎ সে কৌতূহলী হয়ে উঠল,— কি রকম? কি রকম প্রশ্ন?

ঝিনুক একবার আড়চোখে গীতালিকে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল,— সত্যিই শ্লীলতাহানি হয়েছে, না শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে? কোন চিহ্নটিহ্ন আছে? বলতে বলতে আরও নামাল গলাটা,— কোথায় কোথায় হাত দিয়েছিল? তেমন কোন জায়গায় ইনজুরি হয়ে থাকলে এখনই মেডিকেল টেস্ট করাতে হবে।

মিতা বলল,— জানি। পুলিশরা ওইরকম অসভ্য হয়। সব সময়ই ওদের জিভ লকলক করে। পারলে ওরা কথা দিয়েই ধর্ষণ করে নেবে। আর কাজের বেলায় সব নেহারবানু। গুণ্ডাই হোক আর পুলিশই হোক, আসলে বেটাছেলে তো।

সব সময়ই মিতার এই ধরনের কথা ঝিনুকের ভাল লাগে না। প্রশ্নগুলো ভাল ছিল না ঠিকই কিন্তু কী করা যাবে? কিছু রুটিন প্রশ্ন পুলিশকে তো করতেই হয়। আবার মিতার কথাও পুরোপুরি উড়িয়ে

দেওয়া যায় না, নইলে অত খুঁটিয়ে সব জেনে নেওয়ার পরও এখনও ছেলেগুলো ছাড়া থাকে কী করে !

গীতালি দরজার পাশের বেসিনে টিফিন-কৌটো ধুচ্ছিল, বলল,— আমার এখনও কেমন অবাক লাগছে ভাবতে। এই আমাদের সেই শ্রবণা ! ক্লাসে এসে ভিতু ভিতু মুখে বসে থাকত, চোখ পাকিয়ে তাকালেই ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না ! সেই একবার কী একটা দুষ্টুমি করেছিল, প্রণতিদি আটকে রেখেছিল দারোয়ানের ঘরে, ওমা, দরজা খুলে দেখি সে কি দশা মেয়ের ! চোখ জবাফুলের মতো লাল ! হেঁচকি তুলছে ! সেই মেয়ে এখন গুণ্ডা পেটাচ্ছে, গটগট করে থানায় যাচ্ছে, টকাটক রিপোর্টারদের কথায় জবাব দিচ্ছে !

—সত্যিই। রমা উঠে এসে থুতনি নেড়ে দিল ঝিনুকের,— আমার তো বাবা থানার নাম শুনলেই হাঁটু কাঁপতে শুরু করে।

ঝিনুকের রোঁয়া ফুলে উঠল। এক কালবৈশাখী ঝড়ে তার আত্মবিশ্বাস একশ গুণ বেড়ে গেছে। কথাবার্তা হাঁটাচলায় তার এখন রাজহংসী ভাব।

স্কুলে যে কোন বড় ছুটি পড়ার আগে সুনীতার ঘরে সমস্ত শিক্ষিকাদের নিয়ে একটা ছোট্ট মিলনোৎসব হয়। মর্নিং-এর প্রাইমারি বাড়ির আলাদা উৎসব, দুপুরের হাইস্কুলের জন্য আলাদা। এতে নাকি টিচারদের সঙ্গে স্কুলের আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়। টিচাররা অবশ্য আড়ালে ঠাট্টা করে বলে লাড্ডু পার্টি। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ উৎসবে লাড্ডু চানাচুর ছাড়া আর কিছু খাওয়ানো হয় না। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। শুধু নতুন সংযোজন সুনীতার ভাষণ। শ্রবণা শুধু আমাদের স্কুলের শিক্ষিকাই নয়, আমাদের প্রাক্তন ছাত্রীও বটে। আমাদেরই স্কুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে যে অসীম সাহসিকতার কাজ করেছে সেজন্য সমস্ত স্কুল আজ গৌরবান্বিত। মিস্টার সেনগুপ্ত বলেছেন, গরমের ছুটির পর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রবণাকে স্কুলের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হবে। সে অনুষ্ঠানে মর্নিং, ডে দুটো সেকশানেরই ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত থাকবে। মিস্টার সেনগুপ্ত তাই চান।

অন্য দিন হলে ঝিনুক মুখ টিপে হাসত একটু। আজ অহংকার মাখা লজ্জায় বিভোর। ফিসফিস করে বলল,— দেখেছিস মাধুরীদি, আন্টির কাণ্ড !

মাধুরী ঝিনুককে চিমটি কাটল,— মানপত্রটা তুই রাখিস। উপহারটা আমায় দিস। যদি অবশ্য লাড্ডু ছাড়া আর কিছু দেয়।

ঝিনুক হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে স্কুল থেকে বেরোল। স্কুল গেটে চার-পাঁচটা শিশু শুকনো মুখে বসে। ওর মধ্যে দু-তিনটে বাচ্চাকে ঝিনুক হাড়ে হাড়ে চেনে। ভয় ডর বলে কোন বস্তু ওদের অভিধানে নেই। একমাত্র ওই নিরীহ বুড়ো দারোয়ান জীবনদাকে একটু সমঝে চলে ওরা। হয়তো বা খাঁকি উর্দিটার জন্যই।

মাধুরী বলল,—ঘড়িটা দেখেছিস? বারোটা চল্লিশ। এখনও মায়েদের টিকি নেই।

—যতক্ষণ ওরা বাড়িতে না থাকে ততক্ষণই বাড়িতে শান্তি। বড় হলে যে কি হবে এক-একজন।

—তোর গুণ্ডাগুলোর মতো হবে বলছিস?

—হতেও পারে। বিচিত্র কি! ওই ছেলেগুলোও নিশ্চয়ই এরকমই কোন স্কুলে পড়েছে। ওরা সেদিন যে গান গাইছিল, এ বাচ্চাগুলো তো এখনই সে গান গায়। পেট থেকে পড়তে না পড়তে এদেরও যে রকম রক্তের মধ্যে রিভলবার বন্দুক ঢুকে পড়ছে! ঝিনুক অন্যমনস্ক হল,— ভাবতেই খুব ভয় করে রে মাধুরীদি। আমাদের ছেলেমেয়ে যে কী রকম হবে!

—রাম না জন্মাতেই রামায়ণ! আগে বিয়েটা তো কর্। মাধুরী শব্দ করে হেসে উঠল,— তারপর সে শর্মার কী খবর? তোর তূণীর? খুশিতে লাফাচ্ছে? গেয়ে গেয়ে শোনাচ্ছে তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান?

—প্রায় তাই। ঝিনুকও হেসে ফেলল,— পর দিন সকালে কাগজ দেখেই ছুটে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে গিয়েও ঝিনুক সামান্য হোঁচট খেল। কালকের কাগজে তাকে নিয়ে স্টোরি বেরোনর পর বিকেলে তূণীরকে খুব আশা করেছিল। আসেনি। ফোনও করেনি। অফিসে কোন জরুরি কাজে আটকে গিয়েছিল কি!

ট্রামে উঠেও মাধুরী মিটিমিটি হাসছে,— কপাল করে এসেছিলি রে। তোর খোঁপায় এখন শুধু পালক গোঁজা চলছে। দু-একটা পালক খুলে পড়লে আমাকে দিস।

—কী করবি নিয়ে?

—শাশুড়িকে দেখাব। যদি লাল নীল পালক দেখে মন ভেজে। প্রাণে দয়া জাগে।

—ইশশ্, সেধে শাশুড়ির চামচাবাজি করিস, আবার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না হচ্ছে!

—কি করি বল। বুড়ো মানুষের সংস্কার। মাধুরী উদাস হল,— শ্বশুরমশাই গত হওয়ার পর শুচিবাইটা হঠাৎ বেড়ে গেল। পাঁচ বছরের নাতিটাকে পর্যন্ত কাচা প্যান্ট-জামা ছাড়া ঘরে ঢুকতে দেয় না। বাড়িতে কাজের লোক যে রাখতে দেবে না, এ আর এমন কি!

—যাই বলিস ত্রিদিবদাও একটু মেনিমুখো আছে। মাকে বলতে পারে না, বউ চাকরি করে! তার একটা বাইরে পরিশ্রম আছে!

—সেধে কোন্ পুরুষমানুষ সংসারের ঝামেলায় নাক গলাতে চায় রে ভাই?

—ত্রিদিবদা কিন্তু অন্যায় করছে। স্কুলের খাটুনির পর বুড়ির লক্ষ ফরমাস খাটা, এই কাপড় কাচো রে, বাসন মাজো রে, হেঁশেল ঠ্যালো রে ত্রিদিবদাও তো তোকে বাড়ির কাজে সাহায্য করতে পারে। নাকি বউ-এর কাজে হাত লাগালে মান যাবে?

—কপাল রে, সবই কপাল। মাধুরীর মুখে ফিকে হাসি,— তোর কপালে পালক আর তূণীর। আমার কপালে ওই বুড়ি আর ওই বর। তেমন কিছু তো ঘটেও না আমাদের সামনে। তোর মতো। তাহলে তবু নিজের কেরামতি দেখিয়ে বরের সামনে মাসল ফোলাতে পারতাম। একটু ওয়েট বাড়ত।

মাধুরী যথেষ্ট নাদুসনুদুস। মাঝে মাঝে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে ডায়েটিং-এর চার্ট করে আনে, সাতদিনের মধ্যেই সেই চার্ট ফেলে দিয়ে দ্বিগুণ খাওয়াদাওয়ায় মত্ত হয়।

ঝিনুক অপাঙ্গে মাধুরীকে জরিপ করল,— বাপস্! আরও ওয়েট চাস!

মাধুরী পায়রা ওড়ানো শব্দ করে হেসে উঠেছে। দুপুরের ট্রাম বেশ ফাঁকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা লোকজন মাধুরীর হাসিতে ঘুরে তাকিয়েছে। সচকিত মাধুরী গলা নামাল,— একবার বিয়ের জল গায়ে পড়ুক, একটা দুটো নামা, তারপর তোর ওজনও দেখব। ইভনিং শো-এ সিনেমা যাবি?

অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে প্রসঙ্গ বদলাতে পারে মাধুরী। অন্তহীন পরিশ্রমের পরও কি করে যে সিনেমা দেখার, মেলায় ছোটার উৎসাহ থাকে তার! হয়তো এটাই মাধুরীর সুপ্ত বিদ্রোহ। দম বন্ধ করা খাটুনির বিরুদ্ধে। অবিচারের বিরুদ্ধে। মরুভূমির কাঁটাগাছের মতোই অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি।

ঝিনুক বলল,— আজ থাক। সন্ধেবেলা বাড়িতে তূণীর আসতে পারে।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর আগের স্টপে নেমে গেল মাধুরী। ঝিনুক সাধারণত ট্রাম ডিপোয় নিমে রিক্‌শা ধরে নেয়। হাঁটেও মাঝে মাঝে। ছ বছর আগে ঝিনুকরা যখন ফ্ল্যাট কিনে প্রথম এদিকে এসেছিল তখনও আশপাশে বেশ কয়েকটা পুকুর ছিল। গাছপালাও ছিল অনেক বেশি। মহানগরীর বাহু অক্টোপাসের শুঁড় হয়ে একটু একটু করে শুষে নিচ্ছে শেষ সবুজ চিহ্নগুলোকে।

ঝিনুক রাস্তা পার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেট্রো স্টেশনের চাতাল চড়া রোদে ঝিমোচ্ছে। কয়েকটা রাস্তার কুকুর শুধু ছায়া খুঁজে খুঁজে উদভ্রান্ত। ছায়া নেই।

কী নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে চাতালটাকে! কী নির্বিকার!

চার

ফ্ল্যাটে ঢুকে ঝিনুক থমকে গেল। ঠাম্মা।

বসার আর খাবার জায়গাটাকে নেটের পর্দা টাঙিয়ে পৃথক করে নিয়েছে সুজাতা। ক্রিমরঙ পর্দা সুদৃশ্য রডের দু ধারে সরানো। খাবার টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছেন মৃণালিনী।

—ঠাম্মা! ঝিনুক লাফাতে লাফাতে পৌঁছে গেছে মৃণালিনীর কাছে। বিপুল উচ্ছ্বাসে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষল খানিকক্ষণ। শোঁ শোঁ করে নিশ্বাস টানল। সেই চেনা হালকা মিষ্টি গন্ধ। মৃণালিনীর শীতল শরীরে এই মিষ্টি গন্ধটা থাকবেই। এ গন্ধ শুধু ঝিনুকই পায়। আর কেউ না। হয়তো স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া বৃদ্ধাবাসের একাকিত্বের যন্ত্রণার সঙ্গে প্রিয়-পরিজনদের জন্য তীব্র ভালবাসা মিশে জন্ম হয়েছে এই গন্ধটার। মৃগনাভির মতো।

মৃণালিনীও নাতনির আদর চুপচাপ উপভোগ করছিলেন। ঝিনুক ধপ করে তাঁর পাশের চেয়ারে বসল,— এত চড়া রোদ্দুরে বেরনোর কী দরকার ছিল শুনি?

—তোরও তো গরমের ছুটি পড়ে গেছে, তুই কেন বেরিয়েছিলি?

—এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটা রিনিউ করে এলাম। তা আমার বয়স আর তোমার বয়স? ঝিনুক আবার মৃণালিনীর গালে গাল ঠেকিয়ে গন্ধটা শুঁকল,— আমি তো আজকালের মধ্যে তোমার ওখানে যেতামই।

—না এসে কি ওঁর উপায় আছে। সুজাতার স্বরে চাপা গর্ব,— যা একখানা কাণ্ড করেছে নাতনি! সব্বাই ভেবে মরছে।

মৃণালিনী স্মিত মুখে বললেন,—বানপ্রস্থে আছি, সন্ন্যাস তো আর নিইনি বৌমা। সাংসারিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত হতে পারলাম কই? সামনের দোকান থেকে টেলিফোন করার চেষ্টা করলাম—তা চার দিনেও বেহালা থেকে টালিগঞ্জের লাইন পাওয়া গেল না। তা হ্যাঁ রে ঝিনুক, তুই তো ঠিকই আছিস মনে হচ্ছে, খুব চোট তাহলে লাগেনি? কাগজের লোকেরা বুঝি তবে বেশি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছে? পড়ে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ...

—চোট আবার লাগেনি? সেদিন যদি ওই বেপরোয়া মেয়ের হাল দেখতেন! ডান গাল এই বড় টোবলা হয়ে ফুলে আছে। মুখময় রক্ত। হাত নাড়তে পারছে না। ওড়না ছিঁড়ে কুটিপাটি। গা ভর্তি জ্যাবজেবে কাদা। চুল খুলে রাক্ষুসীর মতো ...

—আহ্ মা, থামবে? নাগো ঠাম্মা, আই অ্যাম ফাইন নাউ। একেবারে দোকানের ফুলের মতো তাজা। ঝরঝরে।

—কচু। কাল রাত্তিরেও তো কোঁকাচ্ছিল হাতের ব্যথায়। পেইন কিলার খেয়ে ঘুমোল।

মৃণালিনী ঝিনুকের হাত দুটো হাতে তুলে নিলেন,— হুঁ, এখনও তো বাঁ হাতটা বেশ ফুলে আছে দেখছি।

ঝিনুক লজ্জা লজ্জা মুখে হাসল,— বাঁ হাতের কবজিটা এমন মুচড়ে দিয়েছিল! সেদিন তো হাত নাড়ারই ক্ষমতা ছিল না। বাবা জল গরম করে কতক্ষণ সেঁক দিয়ে দিল।

সুজাতা ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করছিল। গ্রীষ্মের চড়া তাপ আটকাতে প্রতিদিনই দুপুরে সব আগল তুলে দেয়। তবুও দেওয়াল ফুঁড়ে, সিলিং ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসতেই থাকে নির্দয় উত্তাপ। একেবারে ওপরতলার ফ্ল্যাট বলে এ উত্তাপ থাকেও বহুক্ষণ। সন্ধে নেমে আসার পরও।

মৃণালিনী বললেন,— তোর বাবার তাহলে জোর ধকল গেছে বল।

সুজাতা রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল,— ধকল বলে ধকল! ধন্যি নাতনি আপনার। যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। আমি বার বার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই, নটা বাজে, সাড়ে নটা বাজে, দশটা বাজে... আপনার ছেলে সমানে হানটান করছে, একবার চারতলা থেকে একতলা যায়, আবার উঠে এসে ওর বন্ধুদের নম্বর খুঁজে খুঁজে ফোন করে, ভয়ে টেনশানে সে কী অবস্থা তার! এত বড় একটা মেয়ে বন্ধুরা বলছে সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ির জন্য রওনাও দিয়ে

দিয়েছে সেই মেয়ে যদি এগারোটা অব্দি না ফেরে আপনার ছেলে তো ... সে তো কি বলব তার অবস্থা ... !

মৃণালিনী অমলিন মুখে বললেন,— আরে বলোই না ভয়ে কাঁপছিল, তাই তো ? আমার ছেলেকে আমি চিনি না ? ভয় আর দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কোন অনুভূতি আছে তার ?

সুজাতা শাশুড়ির দিকে খর চোখে তাকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

ঝিনুক বলল,— ঠিকই বলেছ। বাবার সব কিছুতে বাড়াবাড়ি। রাতে আমাকে দেখে ঠকঠক করে কাঁপছে আবার ভোরবেলা কাগজে আমার নাম দেখে হৈ চৈ। লাফালাফি।

—বাড়াবাড়ি নয় রে দিদি, ওটাই স্বাভাবিক। নিজের জগত ছোট্ট হয়ে গেলে সামান্যতেই বেশি শোক পায় মানুষ। বেশি খুশি হয়। ভয়ও পায় বেশি।

খুশির হিল্লোল এখনও বইছে ঝিনুকের শিরা উপশিরায়। মৃণালিনীর কথা তার কানে পৌঁছেও পৌঁছল না।

সুজাতা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল,— চান করে আয়। খেয়ে নিয়ে যত খুশি গল্প কর ঠাম্মার সঙ্গে।

ঝিনুক টেবিলে তবলার তাল ঠুকল,— আগে খাওয়া পরে চান। বড় ক্ষিদে। বড় ক্ষিদে। ঠাম্মা তুমিও আমার সঙ্গে বসবে তো ?

—না রে সোনা, আমি খেয়ে এসেছি। মৃণালিনী উঠে দাঁড়ালেন,— তোরা খাওয়াদাওয়া কর, আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই। তিনটে নাগাদ বেরোতে হবে।

বছর সাতেক আগে করুণাকেতন মারা যাওয়ার ঠিক দু মাসের মাথায় নিজে জেদ করে বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেছেন মৃণালিনী, ছেলে ছেলেবউদের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে। সেই থেকে কোন ছেলের বাড়িতে কখনও একটা রাতও কাটাননি। মাঝে মধ্যে আসেন, সন্ধে অবধি থাকেন বড় জোর। কখনও কখনও মানসের সঙ্গে দেখা করেও ফেরেন। একটু রাত করে।

ঝিনুক বলল,— এখন এই ঠাঠা রোদ্দুরে তোমার কোথাও বেরোন চলবে না। রোদ পড়লে তবে বেরোবে।

—উপায় নেই রে। বিভুর ওখানেও যেতে হবে একবার। গত হপ্তায় বিভু আমার কাছে গেছিল। রুমকির নাকি থেকে থেকে জ্বর আসছে।

—সে কি ! কাকামণি তো ফোন করেছিল। কাগজে খবরটা দেখেই। কই, তখনও তো রুমকির কথা কিছু বলল না ! ঝিনুক

সামান্য উদ্বিগ্ন হল,— কাকামণিকে কতবার বলেছি রুমকিকে একটা স্প্যাসটিক স্কুলে ভর্তি করে দাও। মন ভাল থাকলে, সঙ্গীসাথী পেলে ও বেচারা এত ভোগে না।

সুজাতা টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল, বলে উঠল,— আপনার ছোট ছেলে কারুর কোন পরামর্শ শোনে কোনদিন ? আপনার বড় ছেলেও তো কত বুঝিয়েছে। ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হলে হয়তো লেখাপড়াও কিছু শিখত মেয়েটা। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের দিকে কি একটা ঠিকানাও দিয়েছিল গেলই না !

—ওর কথা বাদ দাও। আজকাল কেই বা কার পরামর্শের ধার ধারে।

—এ কথা কেন বলছেন মা ? আপনার পরামর্শে নরেন্দ্রপুরের জমিটা বেচে দেয়নি আপনার বড় ছেলে ? ভাল পরামর্শ হলে শুনবে না কেন ?

মৃণালিনী মৃদু হাসলেন,— রাগ কোরো না বৌমা, একটা কথা বলি। অন্যের পরামর্শ কেউ ভাল বলে মানে না, পরামর্শটা নিজের পছন্দসই হলে তবেই মানে। ওই সময়ে মণ্টুর টাকার দরকার ছিল তাই আমার কথাটা ভাল লেগেছিল। ভাইবোনেদের টাকা অবশ্য বুঝিয়েও দিয়েছে। এসব ব্যাপারে মণ্টুর কাজে ফাঁক থাকে না। তবে তার আগেও তো আমি একবার জমিটা বেচার কথা বলেছিলাম। রুমকির চিকিৎসার জন্য। তখন তোমরা রাজী হওনি।

—তখন জমির একদম দাম পাওয়া যেত না। দালালরাই বলেছিল ধরে রাখতে। সুজাতার গলা ঘন হল,— তা ছাড়া রুমকির চিকিৎসা তো তখন টাকার জন্য আটকে থাকেনি মা। আপনার বড় ছেলে কোঅপারেটিভ থেকে লোন তুলে টাকা দিয়েছে। আপনার মেয়ে-জামাই টাকা পাঠিয়েছে।

সুজাতা কথাগুলো বলছিল ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তেমন যেন জোর পাচ্ছিল না। বাহাত্তর বছরের এই ঋজু ব্যক্তিত্বময়ী মহিলার সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না সুজাতা। মৃণালিনী যেন অন্তর্যামীর মতো ধরে ফেলেছেন সুজাতাদের সেই সময়কার মনের গোপন কথাটি। তখন জমি বিক্রি করলে সবার ভাগের টাকাই বিভাসকে দিয়ে দিতে হত। চক্ষুলজ্জার খাতিরে।

মৃণালিনী বুঝি সান্ত্বনা দিলেন একটু,— তোমরা সবাই আছ সেটুকুনিই যা বলভরসা। তোমরাই তো করো। বিভুটা তো উঞ্ছবৃত্তি করেই জীবন কাটিয়ে দিল। রোজগারপাতির দিকে মন নেই,

সংসার নিয়ে ভাবনা নেই !

ঝিনুক চুপ করে মা ঠাকুমার কথা শুনছিল। কাকামণিটা সত্যি কেমন যেন ! চাকরিবাকরি না পেয়েই টুপ করে একটা বিয়ে করে বসল ! যাও বা দু-একটা চাকরি জুটেছিল, কোনদিন অফিসেই গেল না ঠিক মতন ! এখন এই নেতার পিছন পিছন ঘুরছে, সেই নেতার তল্পি বইছে ! বোকাসোকা লোক ধরে লাইসেন্স পাইয়ে দেব বলে ঠকানো ! বাবা বকাবকি করলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এ কাজ তোর ঘটে ঢুকবে না। এটাকে বলে রাজনৈতিক দালালি। দাঁও মারতে পারলে একবারে মোটা টাকা। কবে যে বেঘোরে মার খেয়ে মরবে ! মাঝখান থেকে কাকিমা বেচারীর কী হিমসিম অবস্থা ! ঘরে বসে চব্বিশ ঘণ্টা সেলাই মেশিন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘরের হাওয়া সামান্য ভারী যেন। সুজাতা করুণ মুখে বলল,— রুমকিটার জন্যই কষ্ট হয় সব থেকে বেশি। বারো বছরেই কী বড়সড় চেহারা হয়ে গেছে। মনটাই বাড়ল না। দেখি, পারলে আজকালের মধ্যেই আমি ও বাড়ি ঘুরে আসব। আগে আপনার বাহাদুর নাতনির ঝামেলাটা একটু সামলে নিই।

মৃণালিনী ঝিনুক-ছোটনের ঘরের দরজা থেকে ফিরে এলেন,— বার বার ওকে বেপরোয়া বাহাদুর বলছ কেন বৌমা ? কি এমন সাংঘাতিক বাহাদুরির কাজ করেছে ঝিনুক ?

শেষ পাতের ভাতটুকু মাখতে গিয়ে ঝিনুকের হাত থেমে গেল। সুজাতার চোখ কপালে,— বাহাদুরি নয় ! একপাল গুণ্ডার সঙ্গে মারপিট করল ! থানায় গিয়ে পুলিশদের দাবড়ে এল ! খবরের কাগজে কি এমনি এমনি ছবি ছাপিয়েছে !

চশমার কাচের আড়ালে মৃণালিনীর চোখ পলকের জন্য জ্বলে উঠল,— ওদিন ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে এর থেকে কম আর কী করতে পারত ঝিনুক ? একটা স্বাভাবিক মানুষের যা করা উচিত, ঝিনুক তো তাই করেছে।

ঝিনুকের আঁতে লাগল কথাটা। তার কান লাল হয়ে গেছে। রক্তের খুশির কণিকাগুলো আচমকা পাথরের ঠোক্কর খেয়ে চমকিত যেন। অপ্রতিভ স্বরে সে বলার চেষ্টা করল,— বাহাদুরি নয় ঠিকই। তবে একটু গাট্‌স লাগে, এটা তো মানবে। একগাদা লোক তো দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ তো এগিয়ে আসেনি !

—তাতে কী প্রমাণ হয় রে দিদি ? অন্যায়টা চোখের সামনে দেখাটাই স্বাভাবিক ? মেরুদণ্ড না থাকাটাই স্বাভাবিক ? নাকি অন্যায়

করাটা স্বাভাবিক ?

মৃণালিনী ঘরে ঢুকে গেলেন। সুজাতা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বক্রচোখে একবার তাকাল ঝিনুকদের ঘরের দিকে, তারপর গলা নামিয়ে বলল,— তোর ঠাম্মা একখানা চিজ বটে। কারুর কোন কিছুতে কখনও খুশি হতে দেখলাম না। তোর বাবা আহ্লাদ করে সেবার বলতে গেল, মা আমি রিডার হয়েছি, তাতেও কত টেরা টেরা কথা ! রিডার হলে তোর টিউশনি বাড়বে ! নামের পাশে রিডার লিখলে নোটবুই বেশি বিক্রি হবে, না রে মণ্টু !

ঝিনুকের কান বুজে গেছে। মার কথা শুনতে পাচ্ছে না। ভাতের শেষ দলা নামছে না গলা দিয়ে। এ কদিনের কুলকুল আনন্দের ঝরনা হঠাৎই জমাট হিমানী।

স্নান সেরে ঝিনুক ঘরে এসে দেখল মৃণালিনী ছোটনের খাটে শুয়ে। সুজাতা শাশুড়িকে ননদের চিঠি পড়ে শোনাচ্ছে। চিঠি শেষ হতে মৃণালিনী বললেন,— শুনেছিস ঝিনুক, পুজোর সময় রানু কলকাতায় আসতে পারে।

ঝিনুক বিশেষ কৌতূহল দেখাল না। অনেকক্ষণ শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেও তার ক্ষোভ এতটুকু প্রশমিত হয়নি। এখনও মৃণালিনীর কথা হুলের মতো বিঁধছে। খাটের পাশে রাখা ড্রেসিং টেবিলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আলগা মন্তব্য করল,— পিসিমণি ওরকম লেখেই, আসে না।

—এবার আসবে। বাবলির বিয়ে ঠিক হচ্ছে। তোর কাকিমার দেওয়া সেই পাত্রটার সঙ্গে।

—অ। তা ছেলে কি করে ?

—ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করে। সুজাতা বলল,— তোর কাকিমার জেঠতুতো দিদির ছেলে। ভালই হল। একসঙ্গে তোর বিয়েটাও লেগে যাবে। বাবুয়া তো আছেই। ছোটনও এসে খাটাখাটি করবে।

বুকের ভিতর ধিকিধিকি ক্ষোভ, তবু মজা লাগছিল ঝিনুকের। বাবুয়া কলকাতায় থাকে বলে মার সুবিধা হবে ! কী ভাবে যে মানুষের সুবিধা অসুবিধার স্রোত প্রয়োজন মতো দিক পাল্টায় ! এই বাবুয়াকেই না মা এ বাড়িতে রাখতে রাজী হয়নি ! কত বাহানা ! আমার এই ছোট ফ্ল্যাট ! ছোটনেরই এখানে এসে পড়াশুনো করতে অসুবিধা হয়, বাবুয়ার কি সুবিধা হবে ! তার ওপর আমাকে তো দেখছই। অর্ধেক দিন কোমরের ব্যথায় পড়ে থাকি। ঝিনুক তো উড়ছে নিজের মনে।

নইলে বাবুয়া কি আমার পর ! পিসিমণির অনুরোধকে কী কায়দা করে কাটিয়ে দিল ! বাবার চেঁচামেচিকে পাত্তা দিল না। বাবুয়া বেচারাকে এখন আলিপুরদুয়ার থেকে যাদবপুরের হোস্টেলে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হচ্ছে। কলকাতায় মামার বাড়ি থাকা সত্ত্বেও। ঝিনুক কি বোঝে না, মা কেন আপত্তি করেছিল বাবুয়ার এখানে থাকায় ! ঈর্ষা। নিজের ছেলে আজীবন হোস্টেলে থাকবে আর ননদের ছেলে গৃহসুখ ভোগ করে যাবে, এটা মার সহ্যই হবে না।

মৃণালিনী কাছে ডাকলেন ঝিনুককে,— এই মেয়ে, আমার কাছে এসে একটু বোস তো।

ঝিনুক নিস্পৃহ মুখে মৃণালিনীর পাশে এসে বসল। তার বাঁ হাতের কবজিতে আলগা হাত বুলোচ্ছেন মৃণালিনী। শিরা ভরা হাতের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগছে ঝিনুকের হাতে। হাত বেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। বুকের ঠিক মাঝখানটাতে পৌঁছে গেল। এখানেই কি হৃদয় ? এক স্নিগ্ধ অনুভূতি জাগছে ঝিনুকের। নিবিড় মধ্যাহ্নে অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে থাকার অনুভূতি।

মৃণালিনী বললেন,— তুই যে তোর তূণীরকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবি বলেছিলি, তার কী হল ?

ঝিনুকের ক্ষোভটা জুড়িয়ে এল,— যাব। ওর এখন অফিসে খুব কাজের চাপ যাচ্ছে।

সুজাতা উঠে পুব দিকের জানলার একটা পাট খুলে দিচ্ছিল। এদিকে গোটা কতক গাছপালা আছে। একটা ডোবাও। মাঝে মাঝেই বেশ সুন্দর বাতাস আসে। জানলার পর্দা সরিয়ে সুজাতা ঝিনুকের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল,— সত্যি ছেলেটার বড্ড কাজের চাপ। ওকে ছাড়া তো ওদের ডিরেক্টররা চোখে অন্ধকার দেখে। এ বাড়িতেই বেশি আসতে পারে না, অন্য কোথাও যাওয়ার সময় কোথায় !

তূণীরকে নিয়েও ঠাকুমার সঙ্গে মার মৃদু রেষারেষিতে মজা পেল ঝিনুক।

মৃণালিনী ঝিনুকের কবজিতে চাপ দিলেন সামান্য। ঝিনুক আঁ আঁ করে উঠল। ঝিনুকের ভঙ্গি দেখে হাসছেন মৃণালিনী,— খুউব ব্যথা এখনও ! তা হ্যাঁ রে, সেই মেয়েটির খোঁজ নিয়েছিলি ?

ঝিনুক আড়ষ্ট হয়ে গেল। সত্যি তো, এ কদিনে ওই মেয়েটার কথা সেভাবে একবারও মনে পড়েনি কেন ! চোখ বন্ধ করে ঝিনুক কালবৈশাখীর মুহূর্তটাকে মনে করার চেষ্টা করল। কিছুতেই

মনঃসংযোগ করতে পারছে না। মেয়েটার চূড়ান্ত অপমান, ছেলে চারটের কুৎসিত আচরণ, জমে থাকা ভিড়ের নিরুত্তাপ মনোভাব ছাপিয়ে কাগজে ছাপা নিজের মুখের ছবিটা বার বার চলে আসছে চোখের সামনে। অথবা গোলাপ হাতে শিশু। থানা। রিপোর্টার। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সপ্রশংস দৃষ্টি। আশ্চর্য! রমিতা নেই!

ঝিনুক নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল,— না, খবর নেওয়া হয়নি। কেন মনে পড়ল না খবর নেওয়ার কথা?

মৃণালিনী ঝিনুকের হাত ছেড়ে দিলেন,— খুব অন্যায়। মেয়েটার ওরকম অবস্থার পরে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রইলি! তোর চোট তো কদিনেই সেরে যাবে, মেয়েটার কথা ভাব। লজ্জাঘেন্নায় মেয়েটার কী অবস্থা হয়েছে কে জানে!

মুহূর্তে ঝিনুক উঠে দাঁড়িয়েছে। কী যেন ঠিকানা ছিল মেয়েটার! কী যেন! কী যেন! হ্যাঁ, মনে পড়েছে তেইশের বি গলফ্ ক্লাব অ্যাভিনিউ। মেয়েটার শ্বশুরবাড়িতে কি টেলিফোন আছে?

দ্রুত পায়ে বসার ঘরে গেল ঝিনুক। ঝড়ের গতিতে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাচ্ছে। চৌধুরী চৌধুরী চৌধুরী। গল্ফ ক্লাব রোড গল্ফ ক্লাব অ্যাভিনিউ ... এই তো রয়েছে একটা! চৌধুরী সমরেন্দ্র নারায়ণ। তেইশের বি গলফ্ ক্লাব। মেয়েটার শ্বশুরের নাম নাকি? হতে পারে।

ঝিনুক ডায়াল বাটন টিপে রিসিভার কানে চাপল। বাজছে। বেশ খানিকক্ষণ পর এক মহিলার কণ্ঠস্বর,— হ্যালো?

—এ বাড়িতে কি রমিতা চৌধুরী থাকে?

—হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

মহিলার গলা একটু জড়ানো। ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হয়।

ঝিনুক পরিচয় দিল,— আমি শ্রবণা সরকার। রমিতার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

ও প্রান্ত থমকেছে। কয়েক সেকেন্ড। তারপর স্পষ্ট হল,—আমি রমিতার শাশুড়ি। রমিতার সঙ্গে কী দরকার?

—না মানে এর মধ্যে খবর নিতে পারিনি। রমিতা ভাল আছে তো?

—না। ভাল নেই। ডাক্তার ওকে বিছানা থেকে উঠতে বারণ করেছে।

—ডাক্তার কেন! কী হয়েছে ওর!

—বললাম তো অসুস্থ। ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। ডাকতে হবে না, আমি বরং বিকেলে ওকে দেখতে যাব। আপনাদের বাড়ির ডিরেকশনটা যদি কাইন্ডলি বলেন

—কোন প্রয়োজন নেই। মহিলার স্বর আচমকা রূঢ়,— তুমি এলে ওর টেনশান হতে পারে।

ফোনটা কট করে কেটে গেল।

পাঁচ

দরজায় একটা শব্দ হতেই শিউরে উঠল রমিতা। হাতের ম্যাগাজিন খসে পড়ে গেছে, সাংঘাতিক গতিতে চলতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। আজকাল যে কোন সামান্য শব্দেও এরকম চমকে ওঠে রমিতা, কনকনে এক শীতল অনুভূতি তার মেরুদণ্ড কাঁপিয়ে দেয়, দাঁতে দাঁত লাগতে চায়। বোবায় ধরে রমিতাকে। হঠাৎ কখনও কখনও রাত্রে ঘুম ছিঁড়ে গেলে নিজের বুকের লাবডুবে নিজেই কাঠ রমিতা। মুখ থেকে কণ্ঠা, কণ্ঠা থেকে বুক পেট কোমর পা বেয়ে তখন ওঠানামা করতে থাকে শতসহস্র অদৃশ্য মাকড়সা। রমিতা মরিয়া হয়ে ঘুমন্ত পলাশকে ডাকার চেষ্টা করে, একটা শব্দও আসে না গলায়, ঘুমও আসে না আর। ডাক্তারের দেওয়া কড়া ঘুমের ওষুধেও না। সারা রাত তখন শুধু নিষ্পন্দ জেগে থাকা।

লীনা ঘরে ঢুকে বলল,— এত মন দিয়ে কী ম্যাগাজিন পড়ছিস রে?

রমিতার কানে বড় জা'র প্রশ্নটা ঠিক ঢুকল না। লীনা যেন তীক্ষ্ণ চোখে বড় বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। আজকাল এমন করেই তাকে দেখে সব্বাই। যেন কোন দাগ ধরেছে রমিতার গায়ে। তার ভেলভেটের মতো সুখী জীবনে এ কী বিড়ম্বনা এল! রমিতা জোর করে বিছানায় উঠে বসল,— তুলতুল ঘুমিয়েছে?

—মনে তো হল ঘুমিয়েছে। মটকা মেরে পড়ে আছে কিনা কে জানে! মহা জ্বালাতন করে সারা দুপুর।

রমিতার নিজের জ্বালা এখন এত বেশি, অন্যের জ্বালাযন্ত্রণার কথা তার মাথাতেই ঢোকে না।

লীনা খাটে বসল। রমিতার চোখে চোখ রেখেছে,— শুনেছিস আজ সকালে কী হয়েছে?

রমিতার চোখের পাতা কেঁপে উঠল,— কী হয়েছে ?

—ওমা জানিস না, পলাশ বেরোনর আগে থানা থেকে ফোন এসেছিল ! লীনার গলা খাদে নামল,— ছেলেগুলো নাকি ধরা পড়েছে। আইডেন্টিফাই করতে যেতে হবে।

এত বড় খবরটা রমিতা জানতে পারেনি ! এ বাড়ির কেউ তাকে কিছু জানাচ্ছে না ! রমিতার নিজেকে কেমন অপমানিত মনে হল। অন্য দিন অফিস যাওয়ার আগে পলাশ একটু একান্তে ডাকে রমিতাকে, কিছুই না, এক চিলতে হাসি আর প্রায় রুটিন করে একটু গালে ঠোঁট ছোঁওয়ানো, আজ কিছু না বলেই বেরিয়ে গেছে পলাশ। দুপুরে খাওয়ার সময় শাশুড়িও তো কত এতালবেতাল কথা বলছিল, একবারও রমিতাকে কোনও আভাস দিল না ! অশোক মাঝে মাঝে হাসি-তামাশা করে রমিতার সঙ্গে। ছোট ভাই-এর বউকে নিজের বোনের মতোই স্নেহ করে সে। ঠাট্টা করতে করতেই সংসারের ছোটখাটো গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয় হাটের মাঝে, সেও দিব্যি খেয়েদেয়ে বাবার সঙ্গে কারখানায় বেরিয়ে গেল ! বাড়ির সবাই সব জানে, শুধু রমিতাই কিছু জানতে পারল না !

রমিতার গলা থমথম করে উঠল,— কবে ধরা পড়েছে ছেলেগুলো ?

—কাল রাত্রে।

—সে খবরটা আমাকে জানালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?

লীনা খাটে পা ছড়িয়ে বসল। যেন তার দু বছরের মেয়ে তুলতুলকে ভোলাচ্ছে এমন গলায় বলল,— জানিসই তো এ বাড়ির ব্যাপার স্যাপার। সব কিছুতেই হাশহাশ চুপচুপ। তোর ভাসুর বলেছিল তোকে আগে জানানোর কথা, পলাশ বলল তোর মেন্টাল ডিপ্রেশান চলছে, শুনলে আরও আপসেট হয়ে পড়তে পারিস। তাই শুনে বাবা বললেন, তাহলে আর তোকে জানিয়ে কাজ নেই, পলাশ একাই থানায় গিয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে আসুক।

রমিতার অপমানবোধটা মিইয়ে এল ধীরে ধীরে। তাহলে বোধহয় এরা ঠিকই করেছে। সত্যি তো, সে রাতে এমন বিশ্রী কান্নাকাটি করেছিল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না থেকে হঠাৎ হঠাৎ আর্তনাদ। গোঙানি। ঘুমের ঘোরেও নাকি সারাক্ষণ বিড়বিড় করে গেছে, অ্যাই ছুঁয়ো না আমাকে। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি। প্রথম দু-তিনটে রাত সে তো পলাশের স্পর্শও সহ্য করতে পারেনি। সেই তাকেই যদি আবার দাঁড়াতে হয় ওই শয়তানদের মুখোমুখি ! নাহ্,

রমিতা ভাবতে পারছে না।

ছেলেগুলোর মুখ এক পলকের জন্যও মনে আনতে চায় না রমিতা। মনে পড়লেই প্রাণপণে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করে। যত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য তার হৃদয়ে জন্ম থেকে জমা আছে, সবগুলোকে পর পর সাজিয়ে ভেবে যেতে শুরু করে সে। বাবা। মা। অফুরন্ত আদর। দিদি। খুনসুটি। শৈশব। কৈশোর। স্কুল-কলেজের বুক জুড়োনো দিন। বন্ধুবান্ধব। ছোটবেলাতে একবার পেনসিল ছুলতে গিয়ে আঙুল কেটে গেছে, ছোট্ট রমিতার কান্না থামাতে তিনটে বড় বড় মিল্ক চকোলেট হাজির করেছে বাবা। স্কুল থেকে মাদার টেরিজার হোমে বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে গেছে রমিতারা। জামাকাপড় ব্যাগ রঙ-পেনসিল পুরনো খেলনা সোয়েটার। মাদার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রমিতা প্রণাম করতেই তার মাথায় হাত রেখেছেন মা। কী অপূর্ব স্বর্গীয় অনুভূতি। সব সব দৃশ্য ছিন্নভিন্ন করে ছেলে চারটের মুখই কেন যে দুলে দুলে ওঠে! তাড়া করে রমিতাকে। জোরে চোখ টিপে রমিতা স্কুলে শেখা প্রার্থনা আউড়ে যেতে থাকে...যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না। কেন না সদা প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া । যখন আমি । যখন আমি বার বার। কোন লাভ হয় না। ভয় অপমান তীব্র বিবমিষা হয়ে আলোড়িত করে চলে রমিতার শরীর। অপরূপ এক সুন্দর শরীর নোংরা হাতে ছুঁয়েছে কয়েকটা বুনো হায়না। বড় হওয়ার পর কখনও কোন পুরুষ যে তাকে স্পর্শ করেনি এমন নয়, তাদের বারাসতের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে তার মাসতুতো দাদা তাকে প্রথম চুমু খেয়েছিল। কলেজে পড়ার সময়ে কৌশিক বেশ কয়েক বার নিভৃতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। অসংখ্য পুরুষ মহার্ঘ আপেল ভেবে বহু বার তাকে চোখ দিয়ে লেহন করেছে।

কিন্তু সে সব ছিল ভিন্ন অনুভূতি। যেন পুরুষদেরই এই জগতে পুরুষের আয়নায় নিজের মূল্য যাচাই করা। লোভ থাকলেও সে লোভে বন্দনা মিশে থাকে। আর এ তো শুধুই পাশবিকতা। রাস্তাঘাটে হাওয়ায় ভাসানো অশ্লীল মন্তব্যের চেয়ে লক্ষগুণ কুৎসিত। ট্রাম বাসের ভিড়ে অভব্য পুরুষের নোংরা ছোঁয়ার থেকে কোটি গুণ নির্মম।

লীনা বলল,— কী এত ভাবিস বল তো দিনরাত? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তোর তো আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি

ওরা।

রমিতা নিজের মনে বলে উঠল,— ক্ষতি করতে পারেনি বলছ ?

—পারেনিই তো। ভুলে যা ওসব কথা। লীনা রমিতার কাঁধে হাত রাখল,— বেঁচে গেছিস তো। যদি তুলে নিয়ে চলে যেত ...।

—কিছু যখন হয়ইনি, তবে কেন মা খালি বলছেন মেয়েমানুষের গায়ে একটা দাগ পড়লেই মৃত্যু পর্যন্ত সে খুঁতো হয়ে যায় !

—বনেদি বাড়ির ব্যাপার তো, এদের কথার ধারাই এরকম।

—কেন ! মা তো বেশ মডার্ন ! চলনে বলনে ! পোশাক আশাকে !

—জানি না রে ভাই মর্ডান কাকে বলে। লীনা ঠোঁট ওল্টালো,— বিয়ে হয়ে ইস্তক চার বছর ধরে তো দেখছি। ওসব মডার্ন ফর্ডানের পলেস্তারা বাইরে থেকে একটা টোকা পড়লেই ঝুরঝুর করে খসে পড়ে। তখন শুধু কথায় কথায় শোনাবে কবে এ বংশের কোন কর্তা কত সামান্য কারণে বউকে সদর দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল। তোকে শোনায়নি গল্পটা ?

— না তো।

—শোনাবে। শোনাবে। এবার ঠিক শোনাবে। শ্বশুরমশাই-এর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা না কে যেন একদিন বৈঠকখানায় বসে ইয়ারবকশি নিয়ে আড্ডা মারছিলেন, ভেতর মহলে তখন তাঁর ছেলের সান্নিপাতিকে যায় যায় অবস্থা। ছেলের মা বার বার খবর পাঠাচ্ছেন কর্তাকে, তিনি শুধু গড়গড়ায় টান মেরে বলেন, যাআই। শেষমেশ গিন্নী মরিয়া হয়ে নিজেই বৈঠকখানায় চলে এসেছেন। উত্তেজনায় মাথার ঘোমটা যে খসে গেছে সে খেয়ালটাও নেই। কর্তা তো রেগে কাঁই। ছেলে মরছে বলে বাড়ির বউ মাথার কাপড় খসিয়ে বাইরের লোকের সামনে আসবে ! এ স্পর্ধা কি মার্জনা করা যায় ! ব্যাস, সেই দণ্ডেই বউ গেটআউট। এক বস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হল গিন্নীকে। শুধু মাথার কাপড় খসে যাওয়ার অপরাধে।

রমিতা হাসার চেষ্টা করল,— যাহ্, বাবা মোটেই ওরকম নন।

—আমি কি বলেছি বাবা ওরকম ? এ বাড়ির কোন ছেলেই ওরকম নয়। নয় যে, সেটাই তো সুযোগ বুঝে মা শুনিয়ে দেন। আমাদের শাশুড়ি ঠাকুরুনটি একটি চিড়িয়া বুঝলি। বিউটিপার্লারেও যাচ্ছেন আবার পেডিগ্রি নিয়েও মটমট করছেন। ভড়ং।

রমিতা চুপ করে রইল। লীনা সুযোগ পেলেই শাশুড়ির একটু নিন্দা করে নেয় বটে, আবার রমিতা কিছু বেফাঁস বললে বেমালুম

শাশুড়িকে লাগিয়েও দেয় সেটা। এ বাড়িতে এসে প্রথম প্রথম শাশুড়ির দু-একটা অভ্যাস দৃষ্টিকটু লেগেছিল রমিতার। বিশেষত বড় ছেলের বউকে একটু যেন ঠেস দেওয়ার মনোভাব। লীনার বাপের বাড়ি নাকি হাঘরে, ছেলে কী দেখে যে মজেছিল লীনাতে—এইসব। শাশুড়ির সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের সময় অবলীলায় রমিতার মতামত সে জানিয়ে দিয়েছিল শাশুড়িকে। রমিতা অপ্রস্তুতের একশেষ। তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছে সে।

লীনা আবারও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, পাশের ঘরে মেয়ের কান্নার আওয়াজ পেয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়েছে,— ওই শ্যামের বাঁশী বাজল। দাঁড়া, একটু চাপড়ে দিয়ে আসি।

রমিতা জানলার বাইরে তাকাল। নিদাঘবেলার সূর্য রাগী দস্যুর মতো গনগনে চোখে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরে উঠে যাওয়া আকাশ প্রায় ফ্যাকাশে। বর্ণহীন। জানলার দিকে ঝুঁকে আসা কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোর একটা পাপড়িও কাঁপছে না। নিঃশব্দে পুড়ছে বাইরের পৃথিবীটা। সেদিনের ঝড়বৃষ্টির পর আবার কেমন একই রকম নিরাসক্ত চতুর্দিক। নির্লজ্জের মতো দুপুরের মনে দুপুর গড়িয়ে চলেছে। কোথায় গলফ্ ক্লাব অ্যাভিনিউ-এ কে এক রমিতা দত্ত থুড়ি রমিতা চৌধুরী কী এক অজানা আংশকায় ছটফট করছে তাতে কীই বা আসে যায় এই উদাসীন দুনিয়ার!

পলাশ ফিরল সন্ধের পর। বাতাসহীন উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল রমিতা। অন্য দিনের মতো পলাশ আজ আগে দোতলায় এল না, সোজা বাবার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেছে। সঙ্গে শাশুড়িও। জোর আলোচনা চলছে নিচে। কেউ রমিতার খোঁজও করল না।

রমিতা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সমরেন্দ্র বেশ কয়েক বছর আগে হাওড়ার শরিকি বাড়ির অংশ বেচে নতুন বাড়ি করেছে এখানে। এদিকটায় এখনও তেমন বাড়িঘরের জঙ্গল গজিয়ে ওঠেনি। সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ। বিকেলে ছেলেরা ফুটবল ক্রিকেট খেলে। সন্ধের পর দু-চার জোড়া কপোত-কপোতী এসে বসে কোন কোন সময়। সামনের রাস্তার উজ্জ্বল নিওন পেরিয়ে রমিতার চোখ দূরে অন্ধকারে ঘন হয়ে থাকা শিশু গাছগুলোর দিকে ভেসে গেল। হঠাৎ ওদিকে তাকালে মনে হয় দিগন্তে যেন ভৌতিক ছায়া। রমিতার ভাসন্ত চোখ সেই ছায়ায় ডুবে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছনে শব্দ হতে চমকে তাকিয়েছে। পলাশ।

পলাশ বারান্দার বেতের চেয়ারে বসেছে। আলো আধাঁরে তার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না রমিতা। দূরের শিশুগাছগুলোর মতো সেখানেও যেন এক অপ্রাকৃত ছায়া। রমিতার বুক টিপটিপ করে উঠল। সাহস করে প্রশ্ন করে ফেলেছে,— তুমি থানায় গেছিলে ?

—তোমাকে কে বলল থানার কথা ? মা ? বৌদি ?

—তা জেনে কি হবে। রমিতা আরেকটা বেতের চেয়ার টেনে পলাশের পাশে বসল,—বলো না গো কী হল ? ওই ছেলেগুলোই কি সেই ... ?

হুঁ। পলাশ চেয়ারে পিঠ রাখল,— সব কটাই ধরা পড়েছে।

—হাজতে ছিল সারা রাত ?

—তাই তো থাকার কথা।

—তুমি কি গরাদের এপাশ থেকে আইডেন্টিফাই করলে ?

—হুঁ।

—অফিস যাওয়ার সময় গেছিলে ? না ফেরার সময় ?

পলাশের গলায় বিরক্তি,— তুমিও তো পুলিশের মত জেরা শুরু করলে দেখছি।

রমিতা নীরব হল। সারাদিন খাটাখাটুনি করে ফিরেছে, তার সঙ্গে থানার হ্যাপা, এ সময়ে পুরুষমানুষকে জিরোতে দিতে হয়। বাবা বাড়ি ফিরলে দিদির নামে নালিশ জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত কিশোরী রমিতা, মা তখন প্রায়ই এ কথাটা বলত। রমিতা অনেক সময় ধৈর্য হারাত, কেন বলব না শুনি ? দিদি সারাদিন আমাকে চুলের মুঠি ধরে মারবে, আমার খেলনাবাটি লুকিয়ে রাখবে, আমি বলব না বাবাকে ?

আজ এই আলো আঁধারে রমিতার মনে হচ্ছে মা'ই ঠিক। তবুও ভিতরের অস্থিরতা সংযত রাখতে পারছিল না রমিতা। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবারও বলল,— আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? রাগ করবে না ?

পলাশ মুখ ফেরাল।

—শ্রবণাদিকে থানায় ডেকেছিল ?

—শ্রবণা সরকার আবার তোমার দিদি হল কবে থেকে ?

—তা না। রমিতা ঢোঁক গিলল,— আফটার অল আমার থেকে বয়সে বড় তো।

—বড় না আরও কিছু। বিশ্বপাকা।

—কেন ? কি করেছে ?

—থানায় মেয়েদের আইডেন্টিফিকেশানের জন্য যাওয়ারই

প্রয়োজন হয় না, উনি ওস্তাদি মারতে গিয়েছিলেন। পলাশ ঝাঁঝিয়ে উঠল,— যত সব চালবাজি কথাবার্তা! বারফাট্টাই। কেন আপনারা রিপোর্টারদের মিট করলেন না! ওসব সিলি বজ্জাতদের ভয় পাওয়ার কোন মানেই হয় না! হ্যাহ্। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল।

—আসতে বলেছ?

—কোন আসার দরকার নেই। যা ফায়দা লোটার তা তো লুটেই নিয়েছে।

—তুমি আসতে মানা করে দিলে?

—সোজাসুজি বলিনি। কায়দা করে বলেছি। যা বোঝার তাতেই বুঝে যাওয়া উচিত।

—কী বললে?

—বললাম আপনি আমার বউকে উদ্ধার করেছেন, তার জন্য উই আর এভার গ্রেটফুল টু ইউ। আমরা চাই না বাড়ির বউ এই নোংরা ঘটনায় ফার্দার জড়িয়ে পড়ুক। পলাশের গলা দুমড়ে মুচড়ে গেল,— খুব খবরের কাগজের হিরোইন হয়েছেন এখন। অ্যাট দা কস্ট অফ ইওর স্ক্যান্ডাল।

—স্ক্যান্ডাল! কিসের স্ক্যান্ডাল!

—একটা রগরগে অ্যাক্সিডেন্টকে নিয়ে বেশি কচলালে, কাগজে কাগজে স্টোরি ফাঁদলে, মাতামাতি হৈ হৈ করলে সেটা স্ক্যান্ডালেই পরিণত হয়, বুঝেছ? পাবলিকও সেটা চাটতে ভালবাসে।

রগরগে শব্দটা বুকে বাজল রমিতার। শব্দটা কী বিকৃত করে উচ্চারণ করল পলাশ! যেন নোংরা নর্দমা থেকে বুড়বুড়ি কেটে উঠল।

—ওভাবে বলছো কেন?

—বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার কী? তুমি তো বাড়িতে শুয়ে শুয়ে আর কেঁদে কেঁদেই খালাস। কথা তো শুনতে হচ্ছে আমাকেই। বাড়ি, আত্মীয়স্বজনদের কথা বাদই দাও, হোয়াট অ্যাবাউট মাই অফিস? বন্ধুবান্ধব? প্রত্যেকে সিমপ্যাথিতে চুকুচক করছে। অ্যান্ড আসকিং ডার্টি কোয়েশ্চেনস্।

রমিতার স্বর নড়ে গেল,— কী জিজ্ঞেস করছে?

—জিজ্ঞেস করছে শ্লীলতাহানি মানেটা ঠিক কী। রেপ আর মলেস্টেশানে তফাত কতটা। পলাশ দাঁতে দাঁত ঘসল, —কিসব ভাষা নিউজপেপারের! মলেস্টেশান! আউটরেজ অফ মডেস্টি! আমাদের ডেপুটি চিফ তো কায়দা করে জানতে চাইছিল এটাকে রেপ

বলা যায় কি না। অ্যাজ ইফ্ রেপের খবরটা চেপে আমিই মলেস্টেশান লিখিয়েছি।

—তুমি কড়া করে শুনিয়ে দিতে পারলে না ?

—না, পারলাম না। বউকে রেপ করেছে, না মলেস্ট করেছে, করলে কতখানি করেছে তাই নিয়ে অফিসে ঝগড়া করা যায় না। কোন সেন্সিবল্ হাজব্যান্ড্ তা করতে পারে না।

রমিতার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। সাত দিন ধরে মনে এত উষ্মা পুষে রেখেছে পলাশ ! অথচ সর্বক্ষণ প্রায় শান্ত কোমল ব্যবহার করে গেছে রমিতার সঙ্গে ! দায়িত্বশীল স্বামীর মত বটগাছ হয়ে ছায়া দিতে চেয়েছে তাকে ! একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েও রমিতা পলাশের বুকের গরগর আওয়াজটা শুনতে পায়নি !

অপরাধী না হয়েও একটা অপরাধবোধ ছুঁয়ে যাচ্ছে রমিতাকে। এই প্রথম। ঘটনার সাত দিন পর।

পলাশ কোন কথা বলছে না। দু হাতে চুল খামচাচ্ছে নিজের।

রমিতা পলাশের হাতে হাত রাখল, —প্লিজ তুমি মনটাকে ছোট কোরো না।

—মনটা কি ময়দার তাল যে ইচ্ছে মত মাপে কেটে নেব ? পলাশ টানটান, —লোকে আরও কি বলছে শুনবে ? জিজ্ঞেস করছে, ছেলেগুলোর সঙ্গে তোমার আগে পরিচয় ছিল কি না।

খর গ্রীষ্মেও কুয়াশা নামল রমিতার চোখে, —তার মানে !

—মানে তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে ওই ছেলেগুলোর অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার ছিল কি না। আরও তো অনেক মেয়ে ছিল ওখানে, তোমাকেই কেন টার্গেট করল ওরা ? ওই শ্রবণাটাকে কেন টার্গেট করেনি ?

দীর্ঘ সময় পরে একটা এলোমেলো বাতাস উঠেছে। বাতাসটা বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় খেলা করে শান্ত হল। রমিতার গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, —তোমারও কি ধারণা, ওদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল ?

—কি করে বলব ? তোমার বিয়ের আগের কথা আমি কতটুকু জানি ?

পরিপাটি বিছানায় শুতে গিয়েও থমকাল রমিতা। ড্রয়িংহলে স্টার টিভি চলছে। শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর জা সকলে এখন ওখানে। হয়তো বা পলাশও। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর একসঙ্গে টি ভি দেখা

এ বাড়ির রেওয়াজ।

রমিতা ফিরে ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়াল। কারুকাজ করা বেতের ফ্রেমে ডিম্বাকৃতি আরশি। ঘরের টিউব আলোতে প্রতিফলিত এ কার মুখ আরশিতে! এটা কি রমিতা! পল্লবিত চোখের নিচে কালির পোঁচ, কাশ্মীরি আপেলের মত রঙে কালচে ছায়া, শঙ্খমসৃণ ত্বক শুকনো ফ্যাকাশে। ভীষণ অন্যমনস্ক রমিতা ত্বক পরিশোধক ক্রিমের শিশি আর তুলো হাতে তুলে নিল। বাড়ি থেকে কদিন এক পাও বেরোয়নি, তবু রোমকূপে এত ময়লা! সাদা তুলো দেখতে দেখতে কালো।

মুখ পরিষ্কার করে রমিতা আবার বিছানায় ফিরল। বিয়েতে পাওয়া লো ইংলিশ খাটের মাথার কাছে ছোট্ট বক্স। বক্স খুলে একটা কাগজ বার করল সন্তর্পণে। কয়েক দিন আগের পুরনো খবরের কাগজ। প্রথম পাতার নিচের দিকে শ্রবণা সরকারের ঝকঝকে হাসিমুখ। ছবির মুখটাকে চোখের খুব কাছে এনে দেখছিল রমিতা। সময় পেলেই দেখে। তেমন রূপসী না হলেও মেয়েটা যথেষ্ট লাবণ্যময়ী। নরম সরম। এই মেয়ে কি করে সেদিন লড়ে গেল গুণ্ডাদের সঙ্গে! চোটও তো যা কিছু লাগবার লেগেছে মেয়েটারই!

রমিতা ছবিটাতে হাত বোলাতে গিয়ে সচকিত হল। দ্রুত কাগজটা পুরে দিল বক্সে। পলাশ আসছে।

পলাশ ঘরের দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল একটা। আড়চোখে রমিতাকে দেখল। রমিতা কোন কথা বলল না। বালিশ দেওয়ালের দিকে টেনে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। নিজেরই বুকের ধকধক শব্দে কেঁপে উঠছে সে। না তাকিয়েও টের পাচ্ছে পলাশ পুরো সিগারেট খেল না। দু-এক টানের পর নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় বসেছে। হঠাৎই ঝুঁকে পড়ে পিছন থেকে রমিতাকে জড়িয়ে ধরল, —আয়াম সরি রুমু। আমি কিছু মিন করে কথাটা বলিনি তখন। রাগের মাথায় হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।

রমিতা শরীর শক্ত করে ফেলল। দুরন্ত অভিমানে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট।

পলাশ এক টানে তাকে কাছে টেনে নিল।

রমিতার চোখ ভিজে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে পলাশের বুকে মুখ গুঁজেছে সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, —তোমরা সকলে মিলে আমাকে দায়ী করছ কেন? আমি কী জানি? আমি কী জানি?

পলাশ বেডসুইচ টিপে ঘরের উজ্জ্বল আলোটাকে নেবাল। কয়েক

পল অন্ধকারের পর নাইটল্যাম্পের মৃদু নীলচে আলোয় সুরভিত গোটা ঘর। পলাশ রমিতার ঘন চুলে আঙুল ডোবাল, —কি করব বলো। মা ভট্ করে বলে বসল, আমরা তো জামাকাপড় সিনেমা থিয়েটার শপিং কোন ব্যাপারেই রমিতার স্বাধীনতায় হাত দিই না, সেই মেয়ের কি উচিৎ ছিল না থানায় রিপোর্ট লেখাতে যাওয়ার আগে একবার আমাদের কথা ভাবা ? আমি কত করে মাকে বোঝালাম, ওই মেয়েটাই জোর করে আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মা বিশ্বাসই করে না। মা'ও হেল্পলেস্...। ঘাড়ের ওপর মহিলা সমিতির পাণ্ডারা এসে নিশ্বাস ফেলছে.... একবার গ্রিন সিগনাল পেলেই সব হাল্লা মাচাতে শুরু করে দেবে.... থানার সামনে গিয়ে গাঁক গাঁক করে চেঁচাবে... জঘন্য জঘন্য পোস্টারিং করবে.... নিউজওয়ালারাও আবার জুস্ পেয়ে যাবে। অসহ্য। .....মা অবশ্য মেজমাসিকে দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলেছে সমিতিওয়ালিদের। ওদের নয় চেপে দেওয়া গেল, বাকিরা ? এই তো ফুল কাকিমা এসে সেদিন চান্স পেয়ে তোমার পিঠকাটা চোলির কথাও শুনিয়ে দিয়ে গেল। বাবা আরও খেপে আগুন হয়েছে কেন জানো ? তোমার ছেঁড়া ব্লাউজটাকে থানায় ডিপোজিট করে আসার জন্য।

—আমি কী করব ? ওরা তো বলল সেটাই নিয়ম।

পলাশ রমিতাকে ছেড়ে দু হাতের চেটোয় মাথা রেখেছে। চোখ বন্ধ করে শুল, —বলল আর তুমিও ওমনি সুড়ুত করে ওসির কোয়ার্টারে গিয়ে তার মেয়ের ব্লাউজ পরে চলে এলে ? বাড়ির বউ-এর একটা প্রেসটিজ জ্ঞান থাকবে না ?

রমিতা চোখ মুছল, —তুমি তো ছিলে, তুমি বারণ করলে না কেন ?

—আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া ওই পজিশানে একটা অচেনা মেয়ের সামনে আমি তোমার ব্লাউজ নিয়ে কথা বলব ?

—আড়ালে ডেকে বলতে পারতে।

—কাকে বলব ? তুমি তখন সেন্সে ছিলে ? সারাক্ষণ ওই মেয়েটার গায়ে এঁটুলির মতো....। এবার কোর্টে উকিলরা ওই ব্লাউজ নিয়ে নাড়াবে। বুঝেছ ? এগ্জিবিট নাম্বার ওয়ান....

রমিতা দমে গেল। খোলা জানলা দিয়ে একটা তরল অন্ধকার গুড়ি মেরে ঢুকছে ভিতরে। পলাশ কনুই-এ ভর রেখে রমিতার দিকে ফিরল, —আজ থানায় যা ইনসাল্টেড্ হয়েছি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। যে চারটে ছেলে ধরা পড়েছে তার মধ্যে একটাই গুণ্ডা

ক্লাসের। বাকি তিনজন ভদ্র বাড়ির। ওয়েল অফ ফ্যামিলির। তাদের বাড়ির লোকেরাও থানায় এসে বসেছিল। তাদের সামনে আইডেন্টিফাই করা... পিওর বস্তি ক্লাশের গুণ্ডা বদমাশ হলে তাও কুকুর বেড়াল ভেবে উপেক্ষা করা যায়.... এ যেন নিজেরাই নিজেদের চেনাচ্ছি।

কপালে ঘাড়ে গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল রমিতার। মাথার ওপর পাখাটা যেন তেমন জোরে ঘুরছে না। রমিতা অস্ফুটে বলল, —তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

পলাশ নিজেকে শান্ত রাখতে চেয়েও উত্তেজিত বার বার, —অনেক কথাই তুমি বুঝতে পার না রুমু। বুঝতে পার না তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউন দেখলে তোমার বাড়ির লোক কিভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। তোমাকে দেখতে এসে তোমার বাবা যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন... অ্যাজ্ ইফ আমি তাঁর মেয়েকে প্রোটেকশান দেওয়ার যোগ্য নই।

রমিতা ক্ষীণ আপত্তি জানাল, —মোটেই বাবা-মা তোমাকে কিছু বলেনি। তাদের মনের অবস্থা....

পলাশ উল্টো দিকে ফিরল, —সব কথা বলতে হয় না। চোখ মুখ দেখেও অনেক কথা পড়ে নেওয়া যায়।

রমিতার রাগটা ফিরে আসছিল, —এই সাত দিনে তুমি একবারও তো এসব কথা বলোনি! আজ এত কথা উঠছে কেন! নতুন করে থানায় যেতে হল বলে?

—ধরো তাই। ভদ্রলোকের ছেলেদের রোজ রোজ থানায় যেতে ভাল লাগে না। পুলিশের কাছে বার বার স্টেট্‌মেন্ট দিতেও না।

—কারণ থাকলেও নয়?

পলাশ হাত বাড়িয়ে সাইড টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট টানল। রমিতা ছোট্ট করে হুল ফোটাল, —নাকি থানায় গিয়ে শ্রবণা সরকারের সামনে আনইজি লাগছিল? ভাবতে আঁতে লাগছিল, ওই মেয়েটাই তোমার বউকে রক্ষা করেছে? তুমি যা পারোনি?

বারুদে সজোরে কাঠি ঠুকে দেশলাই জ্বালাল পলাশ, —বাহ, তোমারও দেখছি এখন অনেক বুলি ফুটেছে। সারাক্ষণ ওই ঝাঁসি রানির ছবি দেখে দেখে? হুঁহ, বীরাঙ্গনা! মিনিমাম ফেমিনিন ডিগনিটিটাও নেই। থানায় আবার পুলিশকে উপদেশ দিচ্ছিল কিডন্যাপিং চার্জটাকে ভালভাবে স্ট্রেস্ দেওয়ার জন্য!

ফেমিনিন ডিগনিটিটা কী জিনিস? নারীর মর্যাদা? না নারীত্বের

মর্যাদা ? চোখের সামনে শ্রবণাকে দেখতে পাচ্ছে রমিতা। উদ্‌ভ্রান্তের মত ভারী ব্যাগ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছে একপাল জন্তুকে।

রমিতা আচমকাই ফণা তুলল, —ভুল কি বলেছে ? কিডন্যাপিংই তো করতে চেয়েছিল ওরা। মোটরসাইকেলে তুলতে যায়নি ?

পলাশের চোখও সহসা কুটিল, —কিডন্যাপিং কেস দিলে তোমার খুব মজা লাগে, না ? পুরনো আশিকরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে....

—তোমার মুখ দেখতে আমার ঘেন্না করছে। ছি। ছি। রমিতার গলা আর্তনাদের মত শোনাল।

—করছে বুঝি ? পলাশ ঘষে ঘষে অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাচ্ছে। রমিতার দু কাঁধ খামচে ধরল, —কী ভাল লাগছে ? ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে ?

—ছোঁবে না। একদম ছোঁবে না তুমি আমাকে। ছাড়ো বলছি। ছেড়ে দাও।

—এখনও বুঝি ছেলেগুলোর ছোঁয়া ভুলতে পারোনি ? পলাশের কণ্ঠ ঘাতকের মত নির্দয়। মত্ত হস্তীর দাপটে চূর্ণ করছে রমিতার প্রতিরোধ। রমিতা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। পোড়া কাঠের মতো পড়ে থাকা তার শরীরটার ওপর পৌরুষ বর্ষণ করে চলেছে পলাশ। উন্মাদের মত বিড়বিড় করে চলেছে, —দেখি কোন্ শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে। দেখি। দেখি।

আকাশে চাঁদ নেই। রাস্তার নিওন বাতিগুলো নিবে গেছে কখন। অমাবস্যার অন্ধকার গিলে ফেলেছে পৃথিবীকে। নিদালির মায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে বিশ্বচরাচর। নিজের দাপটে বিধ্বস্ত পুরুষও তলিয়ে গেছে নিদ্রায়। শুধু রমিতার চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎই নিকষ অন্ধকার ছিঁড়ে একটা মাতালের হুঙ্কার কাঁপিয়ে দিয়েছে দশ দিক, —অ্যাই স্‌স্‌সসালা অন্ধকার, আমাকে তুই ভয় দেখাচ্ছিস ? আমি কি ডরপুক আছি ? হঠ যা। হঠ যা বলছি সামনে থেকে। হঠ্। হঠ্।

রমিতা নিঃসাড়ে মাথার কাছের বক্সটার দিকে হাত বাড়াল।

ছয়

সরকার পক্ষের উকিল মেল ট্রেনের গতিতে কেস ডায়েরি পড়ে যাচ্ছে। একঘেয়ে সুরে। মাথামুন্ডু কিছুই তার বুঝতে পারছিল না ঝিনুক। তার চোখ ঘুরে ফিরে কাঠগড়ার দিকে। চার মূর্তি ! উসকো

খুশকো চুল। গালে বেশ কদিনের না কামানো দাড়ি। দু সপ্তাহ পুলিশ হাজতে থাকার পর আজ আবার চার বাবু উঠেছেন কাঠগড়ায়। জামিনের আশায়। তিন ওস্তাদের মাথা নিচু। শুধু একজনের চোখ গোটা কোর্টরুমে চক্কর মারছে। ঝিনুকের মুখে এসে থমকাল চোখ দুটো। থমকেই আছে। ঠাণ্ডা খুনির দৃষ্টি। ঝিনুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বাড়িতে কাউকে বলে আসা হয়নি। এখানে আজ না এলেই বোধহয় ভাল হত।

ঝিনুকের ঠিক সামনের বেঞ্চে তিন সুট-প্যান্ট-টাই পাথরের স্ট্যাচুর মতো বসে। পাশের একজন প্রথম বেঞ্চের টাকমাথা বয়স্ক উকিলের সঙ্গে ফিসফিস করছে। পরিবেশটাই কেমন রহস্যময়। ব্রিটিশ আমলে ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে তৈরি ঘর। উঁচু উঁচু সিলিং-এ ঝুলন্ত সিমেন্টের চাবড়া। যে কোন সময়ে ছাদ ভেঙে পড়বে মাথায়। পলেস্তারা ওঠা দেওয়াল। স্বাধীনতার পর আর কলি ফেরানো হয়েছে বলে মনে হয় না। বিবর্ণ দেওয়াল নোংরা বালব্‌গুলোর আলো শুষে নিচ্ছে। ক্রমান্বয়ে আর্তনাদ করে চলেছে একটা লম্বাডাঁটি সিলিং ফ্যান। ঘরময় ছড়িয়ে দিচ্ছে উৎকট ভ্যাপসা গন্ধ। লাল শালুতে মোড়া এজলাস। কাঠের পাটাতন, চেয়ার টেবিল কাঠগড়া সবেতেই পাতলা ধুলোর আস্তরণ। অল্প উঁচুতে অপেক্ষাকৃত কম নোংরা আসনে বসে আছেন মহকুমা বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশের একজন অফিসার ছাড়া দুটো খেঁকুরে চেহারার কনস্টেবল হুকুমবরদার হয়ে দরজায় খাড়া। তাদের টপকে বাইরের হট্টগোল জুত করে ঢুকতে পারছে না ভিতরে। মেলে না। সিনেমা টিভির কোর্টরুমের সঙ্গে এক বিন্দু মিল নেই ঘরটার।

হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজে সচেতন হল ঝিনুক। ফার্স্ট বেঞ্চের টাকমাথা বয়স্ক ল'ইয়ার উঠে দাঁড়িয়েছে, —ইওর অনার, এই কেস ডায়েরি আর আমার লার্নেড পাবলিক প্রসেকিউটরের বক্তব্যই স্বীকার করে নিচ্ছে অভিযুক্তরা মোটামুটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির সন্তান। ফার্স্ট অ্যাকিউজড্ পার্থ শিকদার অ্যালিয়াস গুলু প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর নীহার শিকদারের একমাত্র সন্তান। সেকেন্ড অ্যাকিউজড্ সুমন হালদারের বাবা বিদেশ হালদার এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। রাকেশ গুপ্তা অ্যালিয়াস রিকির পিতা রাধেশ্যাম গুপ্তা রিনাউনড্ কনস্ট্রাকশান মার্চেন্ট।

—কনস্ট্রাকশান মার্চেন্ট! প্রোমোটার বলতে বাধে নাকি!

ঝিনুক শরতের কথায় কান দিল না। কচকচ করে বাবল্‌গাম

চিবোচ্ছে। তার কান উকিলের চড়া গলার প্রতিটি শব্দে নিমগ্ন।

—চতুর্থ অভিযুক্ত বাদল চ্যাটার্জি ওরফে ল্যাটা এক দরিদ্র ঘরের অনাথ সন্তান। ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড অ্যাকিউজড্ কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। চতুর্থ জন এদেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাদল চ্যাটার্জির বাবা লেট বঙ্কিম চ্যাটার্জি ছিলেন রামরতন হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক। এই সব মানী বাড়ির ছেলেরা স্যার কখনই এ ধরনের অশালীন কাজ করতে পারে না। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পুলিশ এদের পরিবারের শান্তি এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করতে চাইছে।

—অ্যাকিউজড্‌দের থানায় আইডেন্টিফাই করা হয়েছে স্যার। আর ওই বাদল চ্যাটার্জির এগেন্‌স্টে ক্রিমিনাল রেকর্ডও আছে।

টাকমাথা হেসে উঠল, —লার্নেড প্রসেকিউটর কয়েকটা কথা মনে হয় ভুলে গেছেন স্যার। প্রথমত থানায় আইডেন্টিফিকেশানের কোন লিগাল ভ্যালিডিটি নেই। দ্বিতীয়ত এফ আই আর- এ এদের কারুরই নাম ছিল না। অতএব ফারদার ইনভেস্টিগেশানই বা আর কী থাকতে পারে! তৃতীয়ত ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের তিনশ চুয়ান্ন, তিনশ তেষট্টি আর পাঁচশ নয় ধারা এদের ওপর প্রযুক্ত হতে পারে কিনা তা বিচারসাপেক্ষ। ফোর্থলি বাদল চ্যাটার্জির বিরুদ্ধেও কোন প্রুভেন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। প্লিজ নোট ইওর অনার। প্রুভেন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। ফাইনালি যদি এদের সাসপেক্ট বলে ভাবাও হয়, এদের স্ট্রং সোশাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা মনে রেখে মহামান্য কোর্ট এদের বেল্ মঞ্জুর করতে পারেন।

এতক্ষণে সরকারি উকিলেরও গলা চড়েছে, —না স্যার। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলেই আমি এদের জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করছি। যাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশি, সামাজিক দায়িত্ববোধও তাদের বেশি থাকা উচিত। যে অপরাধে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা শুধু একজন মহিলার অপমান নয়, গোটা সমাজের অপমান। সভ্যতার অপমান।

ঝিনুকও এতক্ষণে সামান্য উদ্দীপ্ত হল। আত্মগতভাবে বলে ফেলেছে, —যাক, আজও জামিন পাচ্ছে না তবে।

শরৎ ঝিনুকের দিকে ঝুঁকল, —নাহ্, পেয়ে যাবে। শুনলেন না পুলিশ রিপোর্টটা?

—না, মানে ঠিক, এমন তাড়াতাড়ি পড়লেন ভদ্রলোক...

—পুলিশই বলছে প্রাইমা ফেসি তদন্ত কমপ্লিট। আর পুলিশ

কাস্টডির প্রয়োজন নেই। কোর্ট চাইলে এবার জেল কাস্টডিতে দিতে পারে। এর পর কি আর বেল্ আটকাবে ?

শরৎ ঘোষালের কথাই সত্যি হল। ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পেয়ে গেল চারজনই। সঙ্গে আদালতের আদেশ নব্বই দিনের মধ্যে পুলিশ যেন অবশ্যই চার্জশিট ফ্রেম করে। আর কেস্ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তরা যেন আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে এই শহর ছেড়ে না যায়।

ঝিনুক খুবই বিষণ্ণ বোধ করছিল। তার চোখের সামনে দিয়ে মূর্তিমানরা এক্ষুনি বেরিয়ে চলে যাবে। প্রকাশ্য রাস্তায় আবার বুক ফুলিয়ে ঘুরবে অন্য সব শহরবাসীর মতো। কে খেয়াল করবে, এই ছেলেরাই একটা জঘন্য অপরাধ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে আবার ! ধুস। কোর্টে না এলেই ভাল হত আজ।

বাইরের বটগাছের তলায় এসে ঝিনুক ক্ষোভটা উগরে দিল, —পুলিশের জন্য। পুলিশের জন্যই জামিন পেল ওরা।

শরৎ হা হা করে হেসে উঠল, —আরে না না। জামিন ওরা এমনিই পেত। পুলিশ তো নিমিত্ত।

—মোটেই না। ডায়েরি করার দিন থেকেই দেখছি কিডন্যাপিং ব্যাপারটাকে পুলিশ পাত্তা দিতে চাইছে না।

—তা কেন ? রিপোর্টে সেকশানটা তো রয়েছে। চার্জশিটে কী থাকবে সেটা অবশ্য পরের কথা। থাকলেও প্রমাণ করতে রবীনদার জান নিকলে যাবে।

—কেন ? মোটিভ তো ক্লিয়ার ?

—ইনফ্লুয়েন্সের জোরে মোটিভ কোথায় ভেসে যাবে ম্যাডাম। ওই নীহার শিকদারের ক্ষমতা জানেন ? তিন-চারটে মিনিস্টার ওর পেশেন্ট। নেহাত কাগজে লেখালেখি হয়েছে, নইলে ওকে থোড়াই ধরা হত।

আকাশে মেঘ জমেছে, রোদ নেই, তবু ইঁট কাঠ মাটি উজাড় করে দিচ্ছে উত্তাপ। বেশ খানিকটা দূরে দুটো মারুতি আর একটা অ্যাম্বাসাডর। সেখানে দাঁড়িয়ে কোর্টরুমের তিন সুট-প্যান্ট-টাই। তিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ! ঝিনুক সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

শরৎ ঘোষাল বলল, —চলুন। চা খাবেন ?

শরতের সঙ্গে ঝিনুকের পরিচয় সামান্যই। ঠাম্মাদের শান্তিপারাবারে বার কয়েক দেখা হয়েছে মাত্র। এক দিন মৃণালিণীর ঘরে অবশ্য অনেকক্ষণ আড্ডাও মেরেছিল একসঙ্গে। এটুকু পরিচয়ে

একটা লোকের সঙ্গে বসে চা খাওয়া যায় !

ঝিনুক বলল, —আজ থাক। একটু আলিপুর ক্যাম্পাসের দিকে যাব ভাবছিলাম।

—তা কী করে হয় ? মৃণাল-মা যদি শোনেন তাঁর নাতনিকে আমাদের বাড়ি থেকে আদর আপ্যায়ন না করে ছেড়ে দিয়েছি, আমাকে আস্ত রাখবেন ?

—মোটেই আমার ঠাম্মা অত রাগী না।

—রাগী না ? ওরে বাবা ! মুখে চোখে বিচিত্র ভঙ্গি করল শরৎ, —মৃণালমা যা চেঁচিয়ে তাকান !

—সেটা কী জিনিস ?

—মানে ওঁর তাকানোর মধ্যে কেমন গর্জন ফুটে ওঠে। শুধু তাকানো নয়... একটা... একটা... মানে... আপনি মহিষাসুরমর্দিনীর চোখ দেখেছেন ?

ঝিনুকের ভীষণ ভাল লেগে গেল উপমাটা। মৃণালিনীর জন্য যথার্থ বিশেষণ। তবে ওই মুখে কোথায় যেন বিষাদও লুকিয়ে থাকে। গর্জন তেল মাখা বিসর্জনের প্রতিমার মত।

টালির ছাদের নিচে চতুর্দিক খোলা মেঠো চা মিষ্টির দোকান। দুনিয়ার সব রকমের মানুষজন সেখানে আহার আলাপে ব্যস্ত। প্রত্যেকের ভঙ্গিতে অদ্ভুত রহস্যময় গোপনীয়তা।

ঝিনুক শরতের সঙ্গে একটা সরু টানা বেঞ্চিতে বসল।

—আপনি কিন্তু আমাকে চমকে দিয়েছিলেন।

—কেন ? এখানে রুটির ধান্দায় আসি বলে ?

—ওল্ড-হোমের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আলিপুর পুলিশ কোর্টের সরকারী উকিল, এ কথা কেউ ভাবতে পারবে ?

পুরু ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল শরৎ, —হোমিওপ্যাথিটা আমার নেশা। আর এটা পেশা। যদিও নিষিদ্ধ পেশা কিছু নয়, তবু আড়ম্বর করে বলে বেড়ানোর কোন দরকার আছে ?

ঝিনুক মাথা নাড়ল, —উফফ্, আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে আমি যা বেঁচেছি ! এর আগে কখনও কোর্টে আসিনি, কিছুই থই পাচ্ছি না, যেদিকে তাকাই শুধু টাইপরাইটার, কালো কোট আর মানুষের মাথা। আর সবাই শুধু দৌড়চ্ছে। ঠিক সিনেমার কুইক মোশানের মতো।

—হুঁ হুঁ। এ বড় আজব জায়গা। প্রত্যেকে বিজি। ম্যান অফ বিজনেস।

—ল'ইয়ারদেরও বিজনেসম্যান বলছেন ?

—ইন্টেলিজেন্ট্ প্রশ্ন। বিজনেস সেন্টারই বটে। মানি মেকিং। মক্কেল ধরো আর আইনের বই দিয়ে পিষে দাও । তবে এখানে যত লোক দেখছেন, তাদের ফিফটি পারসেন্টেরই কোন কাজ নেই। এমন কি, যত পেঙ্গুইন ঘুরতে দেখছেন, তাদেরও অনেকের এই দশা।

এই গরমেও শরৎ ঘোষাল সাদা ফুলহাতা শার্ট পরে আছে। শার্টের বোতাম গলা অব্দি আটকানো। গলার বোতাম খুলে ঘাড় স্বচ্ছন্দ করল শরৎ, —কেউ কেউ তো আবার কৌতূহলে কৌতূহলেও ঘুরছে। আপনার মতো।

—আসলে আমার আজ একটা কাজ ছিল। ইউনিভার্সিটির আলিপুর ক্যাম্পাসে। ভাবলাম এত দূর এসেছি... ছেলেগুলোকে যখন তুলছে, একটু দেখেই যাই।

—ভালই করেছেন। শরৎ কব্জি উল্টে হাতা ফাঁক করে ঘড়ি দেখল, —আপনার অনারে আমারও চার মক্কেলকে দেখা হয়ে গেল। আগের দিন নিউজ পেপারের দৌলতে যা ভিড় হয়েছিল ! বাপস !

—আজ তো একদম ভিড় নেই ?

—এ শহর কিছু মনে রাখে না ম্যাডাম। আজ যা নিয়ে নাচে, কাল সেটা বেমালুম ভুলে মেরে দেয়। এই আপনিই হয়তো তিন মাস পরে কেসটার কথা মনে রাখতে পারবেন না।

—কেসটা তার মানে তিন মাসের আগে আর উঠবেই না ?

—উঁহু। নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারেন। পুলিশ আরও উইটনেস খুঁজবে, তাদের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করবে, তারপর তো কেস সাজানো। হাজার প্রসেডিওর আছে।

টেবিলে চা মিষ্টি হাজির। ঝিনুক হতাশ মুখে কাপ হাতে তুলল, —তার মানে আপাতত ধামাচাপা ?

—ধামাচাপা পড়বে না। ম্যাজিস্ট্রেটটা খুব কড়া আছে। চার্জশিট নব্বই দিনের মধ্যেই জমা পড়ে যাবে। তারপরই তো আসল খেলা শুরু। আজ এই সাক্ষী আসবে না, কাল ওই সাক্ষী আসবে না, কোনদিন ওদের উকিল ডেট নেবে। তারপর এখানে কন্‌ভিকশন হলে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে, হাইকোর্ট আছে, সবার শেষে সুপ্রিম কোর্ট আছে।

—মেয়েটার যে চূড়ান্ত অপমান হল, তার প্রতিকার এভাবে...

ঝিনুক চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল, —কেউ অপমানটার কথা ভাববেই না ?

—আইনের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকে ম্যাডাম। ইমোশান নেই। অর্চনা গুহর কেসটাই দেখুন না। পনেরো বছর তো হয়ে গেল, কারুর পানিশমেন্ট হয়েছে ? আপনার কেসে যদি কনভিক্শান হয়, ভাবছেন শিকদার মশাই গুপ্তাজীরা ছেড়ে দেবে ? দেখবেন হয়তো এই কেস টানতে টানতে ভিক্টিম দিদিমা হয়ে যাবে। যদি অবশ্য কেসটা ততদূর এগোয়।

ঝিনুক চোখে অন্ধকার দেখল। তার এত বড় একটা প্রতিবাদ হাস্যকর রকমের মূল্যহীন ! সমস্ত বীরত্ব আর সাহসিকতার যোগফল শূন্য ! এ বিগ জিরো ! অশ্বডিম্ব !

শরৎ যেন ঝিনুকের মন বুঝতে পেরেছে। হাসতে হাসতে বলল, —আপসেট লাগছে ? এ তো গেল শুধু ট্রায়াল প্রসেডিওর। এ ছাড়াও আরেকটা দিক আছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কেসটা নিয়ে আপনি খুব মেন্টালি ইনভলভড্। কিন্তু আপনি কি গ্যারান্টি করতে পারেন ভিক্টিম হারসেলফ্ আপনার মতো করেই ভাবছেন ?

ঝিনুক ধন্দে পড়ল। রমিতার শাশুড়ি কী অভদ্রের মতো কথা বলেছিল তার সঙ্গে ! পলাশও তাকে থানাতে দেখে কেমন শামুকের মতো খোলের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে ! কেমন যেন অসহিষ্ণু ! বিরক্ত !

ঝিনুক মিনমিন করে বলল, —মেয়েটা নিজের মানসম্মানের কথা ভাববে না ?

—ভাবলেই ভাল। শরৎ কসরৎ করে প্যান্টের পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করল। কৌটোতে তর্জনী ঠুকতে ঠুকতে বলল, —আপনার মুখচোখের যা হাল দেখছি, আপনারও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য থাকবে তো ?

ঝিনুক আরক্ত হল। লোকটা কী ভাবছে তাকে ? এত অল্পেই নিরুৎসাহ হয়ে যাবে সে ? শরৎ ঘোষাল জানে না ঝিনুক অত সহজে হেরে যাওয়ার মেয়ে নয়। সে যা শুরু করে, তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। কলেজে ঢোকার সময় স্টুডেন্ট ইউনিয়নে চাঁদা দিতে রাজি হয়নি ঝিনুক। মুখের ওপর বলে দিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না, আমি তোমাদের মেম্বার হব কেন ? একটা ছেলে বিশ্রী ভাষায় অপমান করেছিল ঝিনুককে। ঝিনুক ছেলেটাকে ছাড়েনি। ইউনিয়ন অফিসে ছেলেটার নামে কমপ্লেন করেছিল, তারা

পাত্তা দেয়নি, বলেছে প্রিন্সিপালের কাছে যাও। প্রিন্সিপাল হাত উল্টে বলেছেন, ওরে বাবা, ওসব পার্টির ব্যাপারে আমি নেই। ওসব মাইনর ব্যাপার গা থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলাই ভাল। ঝিনুক লোকাল পার্টি অফিসে গেছে, লাভ হয়নি। ডিস্ট্রিক্ট অফিসে গেছে, তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে 'দেখছি' বলে চেপে গেছে। ঝিনুক সোজা স্টেট কমিটির অফিসে হাজির। ডু সামথিং। নইলে আমি নিউজপেপারে ফ্ল্যাশ করব। শেষ পর্যন্ত ছেলেটাকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল ঝিনুকের কাছে। তূণীর এখনও তাই নিয়ে কম ঠাট্টা করে! তূণীরের ঠাট্টাটাই শরতকে শোনাল ঝিনুক, —বন্ধুরা আমাকে কী বলে জানেন? বলে শ্রবণার ধরা মানে কচ্ছপের কামড়।

শরৎ চোখ কুঁচকে তাকাল, —আর যদি সেই কচ্ছপকে চিত করে দেওয়া হয়? তখন কচ্ছপ কিভাবে হাত পা ছোঁড়ে দেখেছেন তো? হাত নেড়ে কচ্ছপের অসহায় ভঙ্গিটা দেখাচ্ছে শরৎ, —ই ই ই ই....

ঝিনুক রাগ রাগ চোখে দেখল শরতকে, —দেখবেন টেনাসিটি থাকে, কি থাকে না।

মোটা বাদামি ফ্রেমের চশমা খুলে শরৎ রুমালে মুছছে, —আমার কথা সিরিয়াসলি নেবেন না। জাস্ট মনে হল, বলে দিলাম। আমরা আসলে অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে মেলাতে চেষ্টা করি তো। অনেককেই প্রথম প্রথম অন্যরকম লাগে। কিছু দূর গিয়ে দেখা যায়, সকলেই কোথাও না কোথাও একই। বাঁধাধরা ছকের বাইরে মানুষ কি সহজে বেরোতে পারে? বড় কোন ধাক্কা না খেলে?

শরতের স্বর এত আন্তরিক যে, ঝিনুকের ভিতরের ঝাঁঝটা মরে আসছিল। মৃণালিনীর ঘরে বসে এরকমই কি একটা কথা বলেছিল না লোকটা? রাগ দ্বেষ আনন্দ শোকে যতই বিহ্বল হয়ে পড়ুক না কেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি নাকি কিছুতেই বদলায় না? শুধু তিন-চারটে নিয়ম জানলেই সবাইকে নাকি পুরোপুরি শনাক্তকরণ সম্ভব?

ঝিনুক হালকা গলায় বলল, —আপনার সেই পুরোন থিয়োরি তো? সত্ত্ব? রজঃ? তম?

শরৎ আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠল, —হল না। হল না। বাত। কফ। পিত্ত। এর বাইরে মানুষ নেই। হের হ্যানিম্যান তাই বলেছেন।

—তবে যে সেদিন অন্য কথা বলছিলেন?

—সেটাও যা এটাও তাই। টাকার দুটো পিঠ তো আলাদা। তা

বলে কি পিঠ উল্টোলে টাকাটা বদলে যায় ? আমার স্বভাব হল উল্টো জায়গায় উল্টো কথা বলা। রুগী দেখার সময় দেখি রুগীর স্বভাবচরিত্র আর কোর্টে দেখি মক্কেলের শরীরের ধাত। ব্যস্। তাতেই আমার অর্ধেক কাজ ওভার।

ঝিনুক ছদ্ম কোপে নাক কোঁচকাল, —অ। তাই শান্তিপারাবারের ঠাম্মাদের অসুখ সারে না !

—আপনি আমাকে সত্যিকারের ডাক্তার ভেবেছেন নাকি ! সর্বনাশ ! আমি তো শান্তিপারাবারে রোগ সারাতে যাই না ! নির্ভেজাল আড্ডা মারতে যাই। আর সত্যি কথা বলতে কি.... শরৎ গলা নামিয়ে যেন মিলিটারির গোপন তথ্য ফাঁস করছে, —ওঁদের তো একটাই অসুখ। সে অসুখ সারে না।

—কী অসুখ ? বাতিকগ্রস্ত সব, তাই তো ?

—না নিঃসঙ্গতা। টোটাল লোনলিনেস্।

ঝিনুকের হৃৎপিণ্ড নাড়া খেয়ে গেল। শরৎ ঘোষালকে যত দেখছে, অবাক হচ্ছে সে। যাদুকরের মতো কথার জালে মানুষকে আটকে ফেলতে পারে লোকটা। সাধে কি আর শান্তিপারাবারের বুড়িরা শরৎ ডাক্তার বলতে অজ্ঞান !

ঝিনুক হঠাৎই লক্ষ করল লোকটার চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো। এত কালো চোখের মণি সাধারণত দেখা যায় না।

শরৎ আবার ঘড়ি দেখছে।

ঝিনুক অপ্রস্তুত বোধ করল, —আপনার বোধহয় দেরি করিয়ে দিচ্ছি।

—না। সেকেন্ড হাফে কেস। দুটোয়।

—কোর্টের চাকরি আপনার ভাল লাগে ? একটা ডাক্তারির চেম্বার ফেম্বার তো খুলে বসতে পারেন ?

—এখানকার থ্রিলটাই আলাদা ম্যাডাম। শারীরিক দিক দিয়ে শক্তসমর্থ একটা মানুষ অসহায়ের মতো ছটফট করছে, তাকে আবার সাহস জোগানো এই আমার আজকের কেসটাই কি কম ইন্টারেস্টিং ? একটা মেয়ে তার আগের স্বামীর কাছে খোরপোষ চাইতে গিয়েছিল, তা সেই স্বামী মহাত্মা বেধড়ক পিটিয়েছে বউটাকে। লোকজনের সামনে বউ-এর শাড়ি খুলে দিয়েছে।

ঝিনুকের গা শিরশির করে উঠল, —তারপর ?

—তার আর পর নেই। মহাপ্রভু এখন বেলে ছাড়া আছেন। আর মেয়েটা রোজ আমার হাতে পায়ে ধরছে ফৌজদারি মামলাটা

তুলে নেওয়ার জন্য। তাতে যদি লোকটা দয়া করে কিছু টাকাপয়সা দেয়।

—মেয়েটা অপমান ভুলে গেল ?

—আগে পেট না আগে অপমান ? শরৎ ঈষৎ বিরক্ত, —আমাদের মধ্যবিত্তদের এই দোষ। আগেই মেয়েটার সম্মান, শরীর এসব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিই। আরে বাবা, ছেলেরা নিজেদের দরকারে মেয়েদের শরীরের সম্মান বাড়ায়। নিজেদের দরকারেই আবার তাকে বিবস্ত্র করতে ছাড়ে না।

ঝিনুক গোঁজ হয়ে তাকাল, —আপনি বলতে চান, মেয়েদের শারীরিক শুচিতার কোন মূল্য নেই ?

—আমরা ছেলেরা চাই বলে মূল্য আছে। আমরা না চাইলেই নেই। চেস্টিটিটা কী জানেন ম্যাডাম ? আমার যে ছেলেটা জন্মাচ্ছে সেটা যে আমারই, মানে আমিই যে তার বাবা, সেটা নিশ্চিত করে রাখার একটা অস্ত্র। ও অস্ত্রটা আমরাই চালাই। আমি যে সম্পত্তি বানাব, টাকা জমাব, সেটা একটা কোকিলের ছানা এসে ভোগ করবে এতো হতে পারে না !

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ব্যক্তিমালিকানা থাকলেই সতীত্ব-ফতীত্বর প্রশ্ন আসে ? নইলে নয় ?

—ওরে বাস্। অত শত দর্শনের কথা আমি জানি না। শুধু জানি সতীত্ব আর সততা একই শব্দের রকমফের। ওই টাকার দুটো পিঠের মতো। নিজের কাছে সৎ থাকাই সতীত্ব। সে ছেলেদের ক্ষেত্রেই হোক বা মেয়েদের ক্ষেত্রে।

ঝিনুকের ধারণার সঙ্গে ঠিক মিলতে চাইছে না কথাগুলো, তবু সম্মোহিতের মতো শুনছিল ঝিনুক। তর্ক করার ভঙ্গিতে বলল, —তাহলে কি রমিতা চৌধুরীর অপমানটাকে আপনি অপমান বলবেন না ?

—অপমান তো বটেই। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে মানসিক ভাবে বা শারীরিক ভাবে আঘাত করাটাই অপমান। তার শাস্তিও হওয়া উচিত। রাস্তায় পাগলা কুকুর কামড়ালে আমরা কি কুকুরটাকে ক্ষমা করি ?

ঝিনুক মনে মনে বলে ফেলল, —আপনি মশাই একটা আস্ত পান্থপাদপ। আঙুল ফোটালেই রস বেরিয়ে আসে। মুখে বলল, —আর নয়। আর দেরি করলে ক্যাম্পাসে স্যারেদের রুমে তালা পড়ে যাবে।

ঝিনুক চায়ের দোকান থেকে বেরোতে গিয়ে আবার তাকাল শরতের দিকে। একটা বছর তিরিশেকের বউ জড়সড় হয়ে কথা বলছে শরতের সঙ্গে। মেয়েটার সঙ্গে দুটো বাচ্চা। একটা কোলে ঝুলছে। শরৎ ঘোষাল চোখ বুজে কিসব বলছে বউটাকে। বউটার সিঁথি সিঁদুরে মাখামাখি। কপালেও সিঁদুরের চাকা টিপ। হাতভর্তি শাঁখা পলা।

এই মেয়েটাকেই কি স্বামী পিটিয়েছিল ? খোরপোষ দেয় না ? এই মেয়েটাকেই কি ? .... এই মেয়েটাকেই কি ? হায় রে মেয়ে !

রমিতা চৌধুরী এই মেয়েটার মতো হবে না তো !

সাত

ছোট্ট একটা ঝড় উঠেছিল বিকেলে। আনসান ধুলোর সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় দানার বৃষ্টি। তখন থেকেই মধ্য জৈষ্ঠ্যের দাপট অনেক মোলায়েম।

ঝিনুক ফুটপাথ থেকে শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে আলগা মারল তূণীরের পিঠে, —তোর কথা ফলে গেছে বলে খুব মজা লাগছে, না ?

লেকের ধার ঘেঁষে এই রাস্তাটা বেশ মনোরম। দু পাশে সার সার বৃক্ষরাজি। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গুলমোহর শিমূল শিরিষ। মাঝে প্রশস্ত বুলেভার্ড। সবুজের মোহ মাখা। বাঁয়ে লেক। গরমের বিকেলে লেকের পাড় গমগম। তুলনায় ফুটপাথে পথচারী কম। অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই।

তূণীর মিটিমিটি হাসছিল, —মজা লাগবে না ? আমি শুধু কোর্টের সিনটা ভিসুয়ালাইজ করছি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছোঁড়া চারটে তোকে প্যাট প্যাট করে দেখছে। দেখছে আর ভেতরে ভেতরে মরমে মরে যাচ্ছে। একটা পাঁচ ফুটি মেয়ের হাতে মার খেয়ে কী ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা !

—মোটেই আমি পাঁচ নই। পাঁচ এক।

—দ্যাট মেকস নো ডিফারেন্স।

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলো ছিটিয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। রাস্তা বেয়ে গাড়িঘোড়ার শব্দহীন স্রোত। রাধাচূড়া ফুলেরা অন্ধকারে হাসল।

তূণীর বলল, —অ্যাই, মা তোকে একবার যেতে বলেছে।

—কেন ?

—লজেন্স ফজেন্স দেবে বোধ হয়। মেয়েতে মেয়েতে এসব ব্যাপারে খুব ইউনিটি থাকে তো। একটা মেয়ে বীরত্ব দেখিয়ে ফেললে অন্য মেয়েরা গর্বে ফুলে ওঠে। দিদি তো রোজ একবার করে মৌলালি থেকে ঢাকুরিয়ায় এসে তোর কীর্তন গেয়ে যাচ্ছে। তোর আর ভাবনা নেই রে তুনাই। বিয়ের পর ঝিনুকই তোকে প্রোটেক্ট করবে। রাস্তায় কেউ কিছু বললে তুই তোর ঝিনুককে খবর দিয়ে দিবি। ব্যস, তারপর ঝিনুকই সামলে নেবে।

—তনিমাদির কথা তোর গায়ে ফুটছে বুঝি ? হিংসে ?

—একটুও না। মেয়েরা তো জেনেটিকালি ভিতুই। তার মধ্যে একটা-আধটা মেয়ে কোন সাহসের কাজ করে ফেললে....সেই জাহাজের গল্পটা জানিস না ? জাহাজ থেকে একটা লোক মাঝসমুদ্রে পড়ে গেছে। ডেকে দাঁড়িয়ে সবাই হায় হায় করছে, কিন্তু কেউ লোকটাকে বাঁচাতে নামে না। হঠাৎ এক সাহেব শিপ থেকে ডাইভ মেরেছে। তারপর কোনরকমে হাঁচোড়পাচোড় করতে করতে দুজনে জাহাজে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্রু প্যাসেঞ্জার সব্বাই সাহেবকে ধন্য ধন্য করছে। সাহেব তখন রেগে টং। সে খালি চোখ লাল করে সকলের দিকে তাকায়। শেষে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছে, ওসব ভ্যাজারং ভ্যাজারং ছাড়। শুধু বলো, আমাকে পেছন থেকে ঠেলেছিল কে ?

—পুওর জোক। ঠোঙা হয়ে গেছে।

—গল্পটার শেষটা তো জানিস না। ওটা সাহেব ছিল না। ছিল মেমসাহেব। পরে সেটা আবিষ্কার করা গেছিল। তোকে কে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল দেখতে পেয়েছিলি ?

—ভাল হবে না বলছি। মনে আছে কিরকম পিটিয়েছিলাম তোকে ? আবার পেটাব সেরকম ? বলতে গিয়ে ঝিনুক ফিক করে হেসে ফেলেছে।

...থার্ড ইয়ার কমার্সের তূণীর মজুমদার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ফার্স্ট ইয়ার পল সায়েন্সের ক্লাসে ঢুকেছে। ফ্রেশার্স ওয়েলকামের আগে রুটিন র‍্যাগিং। ঝিনুকের সামনে এসে দাঁড়াল—তুই নাকি ঢুকেই ইউনিয়নের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিস ? খুব গাটস ? বাহ্। আমাকে পছন্দ হয় ?

—মন্দ কি। চলেবল্। মুহূর্তের অসাবধানে ঝিনুক ওভারস্মার্ট।

—মনে কর আমি বচ্চন। তুই রেখা। প্রেম কর আমার সঙ্গে।

ঝিনুক পাথর। এ কি র‍্যাগিং ? না নোংরামি ?

—শুরু কর। শুরু কর। মেদহীন তামাটে তূণীর সামনে দাঁড়িয়ে জগিং করে চলেছে।

ঝিনুক অবাধ্য ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে, —আমি পারব না।

—পারবি না মানে? দলের একটা মেয়ে হেঁকে উঠল।

—পারব না মানে পারব না।

—তবে কী পারবে তুমি খুকি?

—ফাইটিং পারবে?

বিশাখা কানের কাছে গুনগুন করল, —এই বোকা, যা হোক কিছু করে দে। নইলে এরা তোকে ছাড়বে না।

রাগে অপমানে ঝিনুক তখন জ্বলন্ত চুল্লি। চোখ গনগন, যা ইচ্ছে করতে পারি তো? এই অমিতাভ বচ্চনটাকে? বলেই ধাঁ করে এক ঘুঁষি তূণীরের পেটে। হেঁচকা টান মারল ছেলেটার চুল ধরে। তারপর বুকে পিঠে দমাদ্দম কিলচড়।

—অ্যাই কি করছিস! কি করছিস! আরে মেয়েটা কি পাগল নাকি!

আট-দশটা হাত ছাড়াতে চাইছে ঝিনুককে। ঝিনুকও নেহি ছোড়ুঙ্গি। ক্রমাগত পিস্টনের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির তূণীর প্রায় ফ্ল্যাট। দম নিতে পেট চেপে বসে পড়েছে। ঠোঁটে তবু হাসি ঝকঝক। ...

ঝিনুক উন্মন। এক সময় এই তূণীরকে দেখলে মাথায় রক্ত চড়ে যেত ঝিনুকের। এক জণ্ডিসে পিকচার পুরো উল্টো। সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার আগেই। গরমের ছুটিতে। তূণীর তখন পার্ট টু দিয়ে এক্স স্টুডেন্ট। হঠাৎ এক কাঠফাটা দুপুরে গরু চোরের মুখে শয্যাশায়ী ঝিনুকের বাড়িতে হাজির। কথা নেই বার্তা নেই, হাতে এক প্রকাণ্ড বাতাবি লেবু। জণ্ডিসে নাকি খেতে হয়। দ্বিতীয় দিন কাঁধে ইয়া লম্বা আখ। জণ্ডিসে নাকি আখের রস ভাল। তৃতীয় দিন পকেটে এক আপাং কাঠির মালা। জণ্ডিসে নাকি গলায় পরতে হয়। ঝিনুকের আগে সুজাতাই গলে গেল। চতুর্থ দিন সুজাতা ঠায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, কখন ছেলেটা আসবে। তূণীর বেল বাজাতে মাসাইদের ঢাক ঝিনুকের বুকেও। আজ না জানি কী নিয়ে আসে ছেলেটা!

এনেছিল। হাসি। পাথর নিংড়ে জল বার করা হাসি। সে হাসিতে গোবি সাহারাও শ্যামল বনানীতে ছেয়ে যায়, ঝিনুক তো কোন ছার।

সেই শুরু। ছ বছর ধরে ফোঁটা ফোঁটা তূণীর ছড়িয়ে পড়েছে ঝিনুকের অস্থিমজ্জায়। শিরায়। ধমনীতে।

ঝিনুকের গলা কোন কারণ ছাড়াই কেন যে ধরে এল!

—অ্যাই, তোর মনে আছে?

—কি?

—সেই সব দিন?

তূণীর মুখে কিছু বলল না, ঝিনুকের হাত আঁকড়ে ধরল শুধু। কোন কোন সময়ে নৈঃশব্দ্যও এত বাঙ্ময়! এসব নীরব মুহূর্তে কেজো তূণীর কেমন মায়াবী নিষাদ হয়ে ওঠে। এ সময়ে কোন অতীত নেই। ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু এই পাশাপাশি নির্বাক হেঁটে চলা। শুধু এক অনাদি অনন্ত বর্তমান।

—আমার ভীষণ মন খারাপ লাগে রে আজকাল।

তূণীর ঝিনুকের হাতে চাপ দিল—কেন?

—জানি না রে। ঘাই হরিণীর শিহরন ঝিনুকের শরীরে—একা থাকলেই ভীষণ ভীঈঈষণ মন খারাপ হয়ে যায়। দুপুরবেলা যদি কোন দিন ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙলেই কী যে চাপ চাপ কষ্ট! কেন কষ্ট কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। কিছু ভাল লাগে না তখন। কিছু না। কথা বলতে না। শব্দ শুনতে না। টিভি না। বন্ধুবান্ধব না। কিচ্ছু না।

—আমাকেও না?

ঝিনুক নিশ্বাস চাপল। তুই তখন কোথায়! তখন তো তুই অফিসে কম্পিউটার হয়ে বসে আছিস!

তূণীর আলগা টান দিল ঝিনুককে, আগে বলিসনি তো! এ তো খুব মারাত্মক ডিজিজ! দুপুরাইটিস।

—কিইই?

—দুপুরাইটিস। খুব সিরিয়াস টাইপের অ্যালার্জি। লাভেরিয়ার ভাইরাস শরীরে থেকে গেলে...

ঝিনুক চিমটি কাটল তূণীরের হাতে, ইয়ার্কি মারিস না।

—ইয়ার্কি নয়। এই অ্যালার্জির একটাই ওষুধ। বিয়ে। একটাই পথ্য। হানিমুন। ওষুধের অনুপানও আছে। নির্জন পাহাড় চাই। কাচের বাংলো চাই। সঙ্গে সারাদিন ঝিরঝির বরফ। দুপুরবেলাও ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেস। ঘরে তুই আর আমি। আমি আর তুই। এরকম সাতটা দুপুর। সব অ্যালার্জি ফক্কা।

ঝিনুক আবার চিমটি কাটল। এবার বেশ জোরে।

—নারে, আমি সিরিয়াস। অফিসের সান্যালও জুলাই-এ বিয়ে করে ফেলছে। আমার থেকে এক বছরের জুনিয়ার, সেও কিনা সিনিয়ার হয়ে যাবে ?

—কে তোকে জুনিয়ার হতে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? মা তো কবে থেকে বলছে, তুই পিছিয়ে যাচ্ছিস। তনিমাদিও তো সেদিন এসে বলে গেল...

—শখ করে কি আর পিছোচ্ছি ? ল্যাডারটা ঠিক না ধরে বিয়ে করাটা ওয়াইজ হবে না। তার ওপর বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে এখনও টাগ অব ওয়ার চলছে।

—তুই যে বললি কম্পিউটার-ট্রেন্ড লোক পাঠাবে ? তোদের কুরুভিলার তো কম্পিউটার ট্রেনিং নেই ?

—নেই কথাটা হাফ ট্রুথ রে। বল ছিল না। একটা আমেরিকান সফটওয়্যার ইনস্টিটিউটে ক্র্যাশ কোর্স করছে। বাইশ হাজার টাকা খরচা করে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন ? বাইশ হাজার টাকা ! টুয়েন্টি টু থাউজেন্ড বাকস্ !

—সো হোয়াট ? তোর পরিশ্রম, তোর সিনসিয়ারিটির মূল্য দেবে না কম্পানি ?

—পরিশ্রম করাটা বড় কথা নয়। পরিশ্রম করছি দেখানোটাই বড় কথা। কুরুভিলা সে ব্যাপারে এক্সপার্ট। তূণীরের ঠোঁটে বিদ্রূপ, ও কর্তাদের সুইচটা চেনে।

বুলেভার্ডের ওপারে সার সার সুরম্য অট্টালিকা। প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাট থেকে আলোকরশ্মি ঠিকরে আসছে। মাঝে এক-একটা তলায় রহস্যজনক অন্ধকার।

ঝিনুক সান্ত্বনা দিল, তোর ক্যালিবার আছে, তেমন হলে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবি।

—অত সহজে হাল ছাড়বার ছেলে তূণীর মজুমদার নয়। বলল বটে, কিন্তু তেমন আস্থা ফুটল না তূণীরের গলায়। পলকা ঠাট্টা ছুঁড়ল, ম্যানস ওয়ার্ল্ডে তো ঢুকলি না, কী টাফ যুদ্ধ যদি বুঝতিস !

—তোদের নীলম বুঝছে, না রে ?

তূণীর ঝিনুকের হাত ছেড়ে দিল।

নীলম পাঞ্জাবি মেয়ে। তূণীরদের অফিসে তূণীরদের পোস্টেই সম্প্রতি জয়েন করেছে, একই কিউবিকল শেয়ার করে দুজনে। নীলমের চার্টার্ড-এর রেজাল্ট তূণীরের চেয়েও ভাল। সদ্য বিয়ে করে মালহোত্রা থেকে দাশগুপ্ত বনেছে নীলম।

—কিরে, চুপ মেরে গেলি যে ?

তৃণীর গম্ভীর,—আজও নীলম স্টেটমেন্টে তিনটে ভুল করেছে। আমি না দেখিয়ে দিলে আজ ফিনান্স ডিরেক্টর ওর খবর নিত। নেহাত মেয়ে বলেই ছাড় পেয়ে যায়।

ঝিনুক কৌতুক বোধ করল। নীলমের কথা উঠলেই তৃণীর নীলমের অযোগ্যতার লিস্ট তৈরি করতে শুরু করে। করবেই।

সাফারি পার্কের সামনে বেশ কিছু লোকের জমায়েত। সার সার পার্ক করা গাড়ির আশেপাশে ফুচকা ভেলপুরি ঝালমুড়ির সান্ধ্য আসর। একটা বাচ্চা ছেলে ভ্রাম্যমাণ উনুনে চায়ের কলসি বসিয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দাঁড় করিয়ে দু ভাঁড় চা নিল তৃণীর।

ঝিনুক বলল, ছোটন আজ তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল, তুই নাকি ওকে প্রন ককটেল খাওয়াবি বলেছিস ?

—সামনের মাসে। বাবুয়াটাও ফিরুক। শুধু ওরা কেন, মাসিমাকেও নিয়ে যাব।

ঝিনুক আবার তৃণীরকে চিমটি কাটল। তৃণীরের মেজাজটাকে ছন্দে ফেরাতে চাইছে, অ্যাই, বিয়ের পরেও তুই আমার মাকে মাসিমা বলবি নাকি ? আমার সঙ্গেও তুইতোকারি করে যাবি ?

—সে তো তুইও করিস।

—আমি এক দিনে অভ্যেস চেঞ্জ করে ফেলব।

—মেয়েরা পারে। মেয়েদের পারতে হয়। আমি ওভারনাইট চেঞ্জ করতে পারব না। তৃণীরের চোখে হাসি, মুখে গাম্ভীর্য, হানিমুন শেষ হওয়ার আগে তো কথাই ওঠে না।

ঝিনুক আবার একটা প্রচণ্ড জোর চিমটি কাটল। এত জোরে যে উউউ করে চেঁচিয়ে উঠেছে তৃণীর। সামনের ভিড় থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা চোখ তাদের দিকে। ঝিনুক লজ্জা পেয়ে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে গেল।

—হ্যাঁ রে, তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, সেই কাপলটা কোর্টে গিয়েছিল ? তৃণীর দ্রুত হেঁটে ধরে ফেলেছে ঝিনুককে।

—নাহ্।

—ছেলেটাও আসেনি ?

—উঁহু।

—তবেই দ্যাখ, যার বিয়ে হয় তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই ! যার বউ লুট হয়ে যাচ্ছিল, সে ব্যাটা ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে আছে, তুই ফালতু ফালতু সারাদিন কোর্টে গিয়ে বসে রইলি।

ঝাড়ও খেলি মাসিমা মেসোমশাইয়ের কাছে।

ঝিনুক একটু ম্লান হয়ে গেল। বাবা মা এমন অবুঝ হয়ে যায় মাঝে মাঝে! এত আতঙ্ক এত সংশয় নিয়ে বেঁচে থাকা যায়! ছোটনটাও হয়েছে তেমনি! বাবা মার তালে তাল দেওয়া স্বভাব!

ঝিনুক তূণীরের পাশে সরে এল, এই তোকে একটা কথা বলাই হয়নি! হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কোর্টে না একটা দারুণ মজার লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শরৎ ডাক্তার। শরৎ উকিলও বলতে পারিস। ঠাম্মাদের ওল্ডহোমে হোমিওপ্যাথি করে। আবার এদিকে আলিপুর কোর্টে গভর্নমেন্ট প্লিডার। মানুষকে নিয়ে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত থিয়োরি দেয় লোকটা! যা কথা বলে না...শুনলে তুই মোহিত হয়ে যাবি।

—উকিলদের ব্যবসাই তো কথা বেচে খাওয়া। তূণীর বিশেষ পাত্তা দিল না।

—নারে, তুই দেখলে বুঝতে পারতিস। আমার মনের জেদটাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জ লড়েছি। শেষ অবধি কেসটা নিয়ে আমার ধৈর্য থাকবে, কি থাকবে না।

তূণীরের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, খিটকেল বুড়ো উকিল বুঝি?

ঝিনুক মনে মনে হাসল। তূণীর কায়দা করে ভদ্রলোকের বয়স জানতে চাইছে। ছেলেরা প্রিয় নারীর মুখ থেকে অন্য পুরুষের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে না।

ঝিনুক খেলিয়ে উত্তর দিল, —বুড়ো বোধহয় ঠিক বলা যাবে না। চল্লিশ হতে পারে। পঁয়তাল্লিশ হতে পারে। পঞ্চাশ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিছু মানুষ আছে না, যাদের শরীর বয়সটাকে বলতে গিয়েও বলতে পারে না, ঠিক সেরকম। মনই বয়সকে ইচ্ছেমত ঘোরায় ফেরায়। হযবরল'র হিজবিজবিজের মত। কখনও বাড়তি, তো কখনও কমতি।

—তার মানে গিঁটমারা চেহারা।

—তাও নয়। ছোটখাটো। রোগাসোগা। গায়ের রঙও বেশ কালো তবে খুব ব্রাইট। লোকটার সব থেকে যেটা টানে সেটা হল চোখ। হিরে যদি কুচকুচে কালো হত....

—বুঝেছি। দাঁড়কাক টাইপ। তূণীর উদাস ঠাট্টা ছুঁড়ল, —দেখিস, মাঝবয়সী লোকদের আবার একটু ইয়ের দোষ থাকে।

একটা মোড়ে এসে বাঁ দিকে ঘুরল দুজনে। এ রাস্তায় অপেক্ষাকৃত

আলো বেশি। আলোতে তূণীরের মুখের অর্ধাংশ স্পষ্ট। সে মুখ ঝিনুকের দিকে ঘুরল অকস্মাৎ—ঝিনুক, তুই কিন্তু ব্র্যাভাডোর নেশাতে পড়ে যাচ্ছিস। মাথায় রাখিস ওরা ছাড়া পেয়ে গেছে।

—তো ?

—ওরা তোকে মার্ক করে রেখেছে।

—তাতে আমার কাঁচকলা। দু সপ্তাহ ধরে পুলিশ যা দিয়েছে তাই চাঁদুরা সামলে উঠুক।

—কিছুই জানিস্ না। পুলিশ সহজে বড় ঘরের ছেলেদের গায়ে হাত দেয় না। লকআপে ওরা পুলিশকে ম্যানেজ করে নেয়। রিজার্ভ ব্যাংকের কড়কড়ে সার্টিফিকেট নাকের সামনে নাড়ালে জেলখানাই ফাইভস্টার হোটেল হয়ে যায়।

—অত সহজ নয়। ও. সিটা বেশ টাইট আছে। আমি নিজে কথা বলে দেখেছি। ঝিনুক শক্ত গলায় প্রতিবাদ করল, —তা নাহলে তো ধরাই পড়ত না।

—ওভাবে কিছু বলা যায় না। হয়তো পুলিশের সঙ্গে দরে বনেনি। কিম্বা নিউজওয়ালাদের চেল্লামিল্লিতে স্টেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। তূণীরের চশমায় পথের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, —ওই সব ইনফ্লুয়েনশিয়াল বাড়ির ছেলেরা সহজে অপমান হজম করবে ভেবেছিস ? কে বলতে পারে, হয়তো এখনই তোকে ফলো করছে !

কথাটা শুনেই কেন যে বাঁ পাশে চোখ চলে গেল ঝিনুকের ! সঙ্গে সঙ্গে বুকে আচমকা ধাক্কা। সত্যিই খানিকটা তফাতে এক দাড়িওয়ালা লোক হাঁটছে ! তাদের সঙ্গে ! সমান তালে ! লেকের অন্ধকার ধরে ! এদিকেই তাকাচ্ছে কি !

ঝিনুকের পা আটকে গেল। দমাদম কেউ হাতুড়ি পিটছে বুকে। অবচেতনে চুয়িংগাম বার করে মুখে পুরল। খামচে ধরেছে তূণীরকে। দেখাদেখি যেন লোকটাও নিশ্চল। এবার এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুয়িংগাম চিবোতেও ভুলে গেল ঝিনুক। তারপরই ভুল ভেঙেছে। এক গাঁট্টাগোট্টা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় ধীর পায়ে তাদের অতিক্রম করে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না।

তূণীর হাসিতে ফেটে পড়ল, —জেনেটিক ফ্যাক্টরটা তাহলে ভুল বলিনি বল্ ? তোর মত বীরাঙ্গানাও কেমন কাঁপছে ?

ঝিনুকও প্রাণ খুলে হাসতে চাইছিল। পারল না।

তূণীরের হাত ঝিনুকের কাঁধে, —এত নার্ভাস হচ্ছিস কেন ? আমি

তো সঙ্গে রয়েছি। দ্যাখ্, আমার দিকে তাকা।

জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে ঝিনুকের। নিজের অজান্তেই কখন তার দু কান গরম। আগুন ছুটছে।

আট

ঝিনুক চিঠিগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। সংবাদপত্রের অফিস থেকে রিডাইরেক্ট করা চিঠি। কদিন ধরে মাঝেমধ্যেই আসছে। দুটো। তিনটে। পাঁচটা। কাকদ্বীপ থেকে দেবিকা কয়াল। রায়গঞ্জ থেকে মানশ্রী বসু। কাঁথি থেকে স্কুলশিক্ষিকা অমিতা ভট্টাচার্য। সব চিঠিরই বয়ান মোটামুটি এক। আমরা পথেঘাটে ট্রেনে-বাসে প্রতিদিন যে অস্বস্তির সম্মুখীন হই, আপনি আমাদের একক প্রতিনিধি হয়ে সেই সমস্ত লজ্জাকর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আপনার দুরন্ত সাহস আমাদের প্রেরণা। ....পুরুষের চিঠিও আছে কয়েকটা। অভিনন্দন। অজস্র অভিনন্দন আপনাকে। দু একটা চিঠির সুর অন্যরকম। আপনার মতো দুঃসাহসী নারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে ইচ্ছুক। আশা করি, স্বাধীনচেতা শ্রবণা সরকার আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেবেন। ....

শেষের চিঠিগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ল ঝিনুক। জানলার বাইরে উড়িয়ে দিল। কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাচ্ছে বদ্ধ ডোবার দিকে। দু-চারটে টুকরো মাটি অবধি পৌঁছল না, তার আগেই আটকে গেছে আগাছায়।

ঝিনুক অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। ভোররাতের স্বপ্নটা ফিরে ফিরে আসছে। গত সাতদিনে তিনবার স্বপ্নটা দেখল ঝিনুক। এক স্বপ্ন। এক বাড়ি। একই উঠোন। এক কুয়ো। গাছপালা। গান। নারকেল গাছ।

বাড়িটা অনেকটা ঝিনুকদের চারু মার্কেটের পুরনো বাড়ির মতো। দু পাশে টানা বারান্দা, মাঝখানে ঠাম্মা দাদুর ঘর, ঝিনুকদের ঘর, কাকামণি কাকিমার ঘর। কিন্তু সে বাড়িতে তো এত বড় উঠোন ছিল না! এত ঝোপঝাড়! বড় বড় গাছপালা! অত বড় এক বিশাল কুয়ো! কুয়োতলার পিছনে কাঠের বাথরুম! কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো কালচে ছায়া মেখে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সেখানে। হুট করে দরজা খুলে সেই ভূতুড়ে আলোছায়ায় বেরিয়ে এল এক দশ বছরের মেয়ে। হাড়কাঁপানো শীতের রাত আষ্টেপৃষ্ঠে সাপটে ধরেছে

মেয়েটাকে। মেয়েটা হি হি কাঁপছে। যত না শীতে, তার থেকে বেশি ভয়ে। নির্জন রাতের অন্ধকারে এত ভয় ছড়িয়ে থাকে! ভূতের ভয়। রাক্ষস খোক্ষসের ভয়। সাপ-ব্যাঙের ভয়। লাল লাল চোখ চোর ডাকাতের ভয়। সব থেকে বেশি ভয় বুঝি অজানা অন্ধকারটাকেই। দশ বছরের মেয়ে ভয়ে শীতে মাখামাখি হয়ে বাথরুমের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যেই না পা বাড়ায় অমনি উঠোন বাথরুম হুশ করে সরে যায় দূরে। গাছপালা সব দৌড়ে আসে সামনে। এক্কেবারে গায়ের ওপর। ছুট্টে চৌকাঠে ফিরে এলেই আবার যে কে সেই। আবার এগোয় গুটিগুটি, আবার গাছপালা পড়িমরি করে সামনে। উফ্, কি করে যে বাথরুমে যাবে মেয়েটা? যেতেই হবে। মেয়েটা এবার চোখ কান বুজে লাফিয়ে নামল। নামতেই কোথায় গাছপালা! কোথায় ঝোপঝাড়! চতুর্দিক ধুধু। প্রকাণ্ড কুয়োটা শুধু হাঁ হাঁ করছে মাঝ উঠোনে। মেয়েটা ঝুঁকে কুয়োর ভিতরটা দেখল ভয়ে ভয়ে। অতলস্পর্শী গহ্বরে অন্ধকারও নেই, জলও নেই এক বিন্দু। চকচকে গভীর খাদে এক সিংহ শুধু কেশর ফুলিয়ে গর্জন করে চলেছে। কোত্থেকে গান বেজে উঠল, আজ না ছোড়ঙ্গা তুঝে দমদমাদম। সুলগ্না চেঁচিয়ে উঠল, খলনায়কের গানটা চালিয়ে দে না। বিশাখা আর মৈনাকের গলা শোনা গেল, জানিস না গানগুলোকে তো টাডায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে। মেয়েটা কুয়ো থেকে মুখ তুলতেই উঠোন বাড়ি রাত্রি সব ভোঁভো। ঠা ঠা রোদে খাড়া দাঁড়িয়ে এক নারকেল গাছ। ঠিক ঝিনুকের চোখের সামনে ডোবার ধারে এখন যে গাছটা দাঁড়িয়ে, হুবহু সেই গাছটাই।

কী অর্থ হতে পারে এই স্বপ্নের? মেয়েটার চেহারা দশ বছরের কিন্তু মুখটা এখনকার ঝিনুকের। মনটাও। কুয়ো উঠোন গাছপালাদেরও নির্ভুল ভাবে চেনা যায়। শিমুলতলার। কিন্তু শিমুলতলায় তো দশ বছর বয়সে যায়নি ঝিনুক! কতদিন আগে গেছে? বড় জোর বছর তিনেক। ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে। অনিন্দিতাদের বাগানবাড়িতে। সে বাড়ির ইঁদারায় ছোটবেলার গল্পের সিংহটা এল কি করে! ওই নারকেল গাছটাই বা কেন! ঘুম ভাঙলে স্বপ্নের রেশ মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। শুধু চোখের সামনে রয়ে যায় ওই নারকেল গাছ। মিনারের মতো দীঘল। কিন্তু কেন? এ স্বপ্নের মানে কি?

তূণীরকে কাল বিকেলে স্বপ্নটার কথা বলবে ভেবেছিল ঝিনুক।

পারেনি। কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকেছে। মনে হয়েছে তূণীর বুঝি জেনে যাবে তার ভিতরের ভয়টাকে। আচ্ছা, এও তো হতে পারে কদিন ধরে মনটা ভীষণ বিক্ষিপ্ত আছে বলেই এরকম স্বপ্ন দেখছে ঝিনুক ? সত্যি তো দু দুবার ভয় পেয়েছে সে। কাঠগড়ার সেই হিংস্র খুনি চোখ। আর লেকের অন্ধকারে দাড়িওয়ালা মুখ। সেই ভয়ই কি স্বপ্ন হয়ে বার বার... ? তবে কি ভয়ের বীজ লুকিয়েই থাকে অবচেতনায় ? কাল্পনিক জুজু হয়ে ? তাই যদি হয় তাহলে ভয়কে মেরে ফেলার বীজই বা কেন থাকবে না মানুষের মনে ?

রান্নাঘর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। ঝিনুকের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। গোবিন্দর মার সঙ্গে আবার লেগেছে মা'র।

সুজাতা চিল-চিৎকার করে উঠল, দশ দিনে বাড়িতে গুঁড়ো সাবান শেষ ! পনেরো দিনে বাসনমাজার পাউডার ! আমার হিসেব করা মশলাপাতি মাস শেষ হওয়ার আগে ফুরোয় কি করে !

নাইটির ওপর হাউসকোট জড়িয়ে ঝিনুক দরজায় এসে দাঁড়াল। ছোটন কী একটা ফুট কেটেছে, মার গলা স্কেল ছাড়িয়ে গেল, হাজারবার বলব। কুড়ি দিনও চলবে না গ্যাস ? যা খুশি তাই করবে ? ভেবেছেটা কি ? কাল রাত্তিরে দশটা রুটি বেঁচেছিল, দশটাই সকালে গিলে বসে আছে !

গোবিন্দর মা'রও স্বর সপ্তমে—মোটেই দশটা খাইনি। নটা খেয়েছি। তুমিই তো বলেছ রাতে যা রুটি বাঁচবে সকালে খেয়ে নিও।

—তা বলে খাওয়ার একটা সীমা-পরিসীমা থাকবে না ? এই সকালে অতগুলো রুটি... ! ফ্রিজ থেকে কে তোমাকে তরকারি নিতে বলেছে ?

—সাত সকালে খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিওনি। খিদের তাড়নায় খাটতে আসা। গতর খাটিয়ে খাই। এক বাড়ি গেলে আমার দশ বাড়ি আছে।

ঝিনুকও গোবিন্দর মাকে বিশেষ পছন্দ করে না। মাঝে মাঝেই তার কাছ থেকে দশ বিশ টাকা নেয়, ফেরত দেয় না। গত মাসেও ছেলের অসুখ বলে কুড়ি টাকা নিয়েছে। তা বলে রুটি নিয়ে চেঁচামেচি !

ঝিনুক দরজা থেকে গলা চড়াল, গোবিন্দর মা, তুমি চুপ করো তো। আর মা, তোমার যদি গোবিন্দর মাকে না পোষায়, অন্য লোক

দেখো। রোজ রোজ খেঁচামেচি ভাল লাগে না।

সুজাতার আর গোবিন্দর মা-তে মন নেই, তার চোখ রান্নাঘর থেকে এবার ঘুরে গেছে ড্রয়িং স্পেসের ক্যাবিনেটে রাখা ভি সি পি-তে। ফুটকির মতো লাল আলো জ্বলছে। ছোটন কাল অনেক রাত অবধি এ ঘরে বসে ক্যাসেট দেখেছে। উইক এন্ডে হোস্টেল থেকে এলে খুব বেশি সিনেমা দেখা হয় না, তাই গরমের ছুটিতে সমস্ত না দেখা সিনেমা গোগ্রাসে গিলছে সে। আর প্রায়শই ভি সি পি বন্ধ না-করে শুয়ে পড়ছে।

সুজাতা দুপদাপ গিয়ে সুইচ অফ করে এল। ছোটনের বিকার নেই। খাবার টেবিলে বসে মন দিয়ে সে খেলার পাতা পড়ে চলেছে। ঝিনুক ভাই-এর সামনে এল—রোজ কী এত সিনেমা দেখিস রে ? সবই তো এক নাচ, এক গান, এক ফাইট, একই গল্প ! দুই ভাই ছোটবেলায় বিছড়ে গেল ! একজন বড় হয়ে পুলিশ হল ! অন্যজন গুণ্ডা ! আর তার সঙ্গে নিরেট কিছু বোকা ভিলেনের দল !

—তোর মধ্যে বড় বেশি দিদিমণি দিদিমণি ভাব এসে গেছে রে দিদি। ছোটন হাই মাইনাস পাওয়ারের চশমা নাকের ওপর নামাল, তবে তোর হার্টটা একদম সোনা দিয়ে মোড়া।

ঝিনুক হেসে ফেলল, মস্কা মারিস না। কাজের কথা বল। মাল্লু চাই বুঝি ?

—তুই কি থটরিডিং করছিস নাকি ?

—কত লাগবে ?

—যা পারিস। একশ দুশ তিনশ।

—অত টাকা দিয়ে কি করবি ?

—ওই যে বললাম দার্জিলিং ট্যুর। নেক্সট সানডে।

—সে তো তুই বাবাকে জপিয়ে ফেলেছিস ?

—বাবার একটু টান যাচ্ছে। তোদের ইউনিভার্সিটির সব এগজাম চলছে তো, নেক্সট ব্যাচ ধরতে ধরতে বাবার গরমের ছুটি কাবার হয়ে যাবে। তাও হাজার দেবে বলেছে। স্টিল, হাতে দু-চারশ টাকা এক্সট্রা না থাকলে চলে ?

—ছ দিনের ট্যুরে হাজার টাকা উড়িয়ে দিবি, আবার আমার কাছে চাইছিস ?

—ফালতু জ্ঞান ছাড়। দিবি কি দিবি না বল।

—দেব না। বাবার গাদা গাদা টাকা ধ্বংস করছিস...

—ধ্বংস নয়। বল ইনভেস্টমেন্ট। ছোটন তুড়ি মেরে ঝিনুকের

কথা উড়িয়ে দিল, এক্সপেনডিচার তো তুই। স্রেফ বাজে খরচা।

—কি বললি তুই? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

ঝিনুকের গলা উচ্চ গ্রামে উঠে গিয়েছিল, সুজাতা ছুটে এসেছে, —তোরাও সাতসকালে শুরু করে দিলি? তোকেও বলি ঝিনুক, দুদিনের জন্য ভাইটা আসে...

—দুদিনের জন্য আসে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? যা ভাষা হয়েছে তোমার ছেলের!

ছোটন হি হি করে হাসছে, অ্যাই দিদি, বেশি রাগিস না, পারমানেন্ট ভাঁজ পড়ে যাবে কপালে। মুখের শেপ চেঞ্জ হয়ে যাবে। তূণীরদা ওই মুখ দেখলে ফেন্ট আঁআঁআঁআঁ।

—গেলে যাবে। ঝিনুক রাগের সঙ্গে বলতে গিয়েও ভাই-এর মুখচোখের ভঙ্গিতে হাসছে ফিকফিক।

সুজাতা বলল, তোমার দিদি তো এমনিতেই ভিরমি খাওয়াচ্ছে ছেলেটাকে। হুটহাট এমন তর্ক জুড়ে দেয়...

—ভুল বললে তর্ক জুড়ব না? ঝিনুক প্রতিবাদ জানাল, তূণীরের কথা কি বেদবাক্য নাকি?

—বেদবাক্য কিনা জানি না, তবে তোমার থেকে তূণীরের প্র্যাকটিক্যাল সেন্স অনেক বেশি। কিসে কি হয় ও অনেক ভাল বোঝে।

—ঘোড়ার মাথা বোঝে। আমিও চাকরিবাকরি করি। রাস্তায় ঘাটে চরকি মারি। আমাকেও চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়।

—হুঁহ্। কোথায় তূণীর আর কোথায় তুই? ও কতরকম মানুষ দেখে, কত রেসপন্সিবল পোস্টে রয়েছে, কত অভিজ্ঞতা...তার কাছে তোর ওই লিলিপুটদের পড়ানোর চাকরি!

ঝিনুক তর্ক বাড়াল না। মা বরাবরই হবু জামাই-এ আপ্লুত হয়ে থাকে। ছেলে চারটের জামিন পাওয়ার অবধারিত ঘটনাটা আগেভাগেই বলে ফেলে ইদানীং সে মা'র আরও গভীর বিশ্বাসের পাত্র। তার সামান্যতম সমালোচনা করাও এখন বাতুলতা। মাকে কি করে ঝিনুক বোঝায়, ওই লিলিপুটদের মধ্যেই বিশ্বদর্শন হয়ে যায় তার? প্রতিটি শিশুই পৃথক পৃথক পরিবারের প্রতিচ্ছবি। বাবা, মা, একটাই ছেলে অথবা একটাই মেয়ে। বড় জোর দুটো ছেলেমেয়ে। নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি। বেশিরভাগ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবশ্য এর থেকে বেশি প্রোটন নিউট্রন থাকে। এই নিউক্লিয়াস 'হাম দো হামারা দো'-তেই শেষ। যে কোন বাচ্চার সঙ্গে দু মিনিট কথা বললেই জানা

যায় তার বাবা কিরকম রোজগার করে, মা চাকরি করে কিনা, মা বাবার সম্পর্ক কেমন, তারা টিভিতে কি কি সিরিয়াল দেখতে ভালবাসে, বাবা মদ খায় কিনা, মার সঙ্গে বাবার কি নিয়ে ঝগড়া হয়, বাবা মাকে কখন আদর করে, কোন সময় দুজনেই ভাল মেজাজে থাকে। কত সামান্য আয়াসে চাঁদও কিনে আনতে পারে বাবা-মা। ঠার্কুদা ঠাকুমা বাড়িতে এলে কি ধরনের আচরণ করে মা। অথবা দাদু-দিদাকে দেখলে বাবা। একজন তো একবার বিজ্ঞের মতো বলেছিল, বাবা-মার একদম অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না আন্টি, বিয়েটা বোধহয় ভেঙেই গেল।

ঝিনুকরাও কি এই বৃত্তের বাইরে ? ঝিনুক নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করল। উঁহু। তবু যেন ঝিনুকদের ছেলেবেলায় বাবা মার সঙ্গে একটা মসলিনের পর্দার ব্যবধান ছিল। সময় সেই পর্দাটাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা মার জগত এখন ছেলেমেয়েদের ছোট্ট দুনিয়ার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একাকার। বাবা মা নির্দ্বিধায় ছেলেমেয়ের সামনে সমস্ত রকম কথা আলোচনা করে, ছেলেমেয়েদের সামনেই অবাধ আধুনিক ফুর্তির আসর জমায়। ফোঁটা ফোঁটা বিষের মতো বড়দের নিষিদ্ধ পৃথিবী ঢুকে পড়ছে শিশুদের ধমনীতে। ছেলেমেয়েদের নিয়েই এখন বাবা মার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন।

মানস বাজার থেকে ফিরেছে। তার রোগাটে লম্বা শরীর, নাক মুখ চোখ ঘামে জবজব। গ্রীষ্মের ছুটি চলছে বলে তার এখন অবসর একটু বেশি। কোচিং টিউশনি কম। পরীক্ষার গার্ড না দিতে হলে কলেজে যেতে হয় না বড় একটা। এখন বাজারে গেলে সে কমপক্ষে দেড় দু-ঘণ্টা কাটিয়ে আসে।

সুজাতা বাজার নিয়ে রান্নাঘরে গেল। মানস পাঞ্জাবি খুলে ডাইনিং টেবিলে চশমা রেখেছে। পাখার নিচে বসে হাত-পা ছড়াল, ঝিনুক, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া তো।

জল খেয়ে মানস থিতু হল, ইলিশ মাছ আছে। দই সর্ষে দিয়ে ভাল করে রেঁধো তো।

ঝিনুক বলল, —কত করে নিল ?

—একশ কুড়ি। ভাল সাইজ। সওয়া কেজি আছে।

সুজাতার কান সর্বদা ফ্ল্যাটে ঘোরাফেরা করে। রান্নাঘর থেকে বলে উঠল, এত দাম দিয়ে আনতে গেলে কেন ?

—বচ্ছরকার মাছ, ছোটনটাও ভালবাসে, একদিন নয় বেশি দাম দিয়েই কিনলাম।

সুজাতা বলল, ইলিশ মাছ ছোটনের থেকে বাবুয়া বেশি ভালবাসে। ছুটির পর ওর হোস্টেল খুললে ওকেও একদিন ভাল করে খাওয়াতে হবে।

ঝিনুক সুজাতাকে দেখছিল। মা এরকমই। কখনও নিষ্ঠুর স্বার্থপর, কখনও এত স্নেহশীল!

মানস ভয়ে ভয়ে সুজাতার দিকে তাকাল, এক কাপ চা হলে...

—এই গরম থেকে এসেই চা খেতে হবে না। পরোটা ভাজা হয়ে গেছে, আগে জলখাবার খেয়ে নাও।

মানস ঝিনুকের দিকে ফিরল, আজ কাগজ দেখেছিস?

—দেখব কি করে? দশটার আগে ছোটনের কাগজ গেলা শেষ হয়?

—ফার্স্ট পেজটা দ্যাখ।

ঝিনুক ছোটনের হাত থেকে কাগজ টেনে হেডিং-এ পাখির দৃষ্টি বোলালো। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত আরও একজন গ্রেফতার। হর্ষদ মেহেতা কেসে যুগ্ম সংসদীয় কমিটির আর এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ শেষ। কলকাতাকে আরও মোহময়ী করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান। মসজিদ চত্বরে মন্দির বানিয়ে রামরাজ্য গড়ার উদাত্ত ঘোষণা। বসনিয়ার বন্দীশিবিরে একশ তিরাশি জন মহিলা ধর্ষিতা।

ঝিনুক জিজ্ঞাসা করল, বসনিয়ার খবরটা বলছ?

—আরে না, যুদ্ধর সময়ে ওসব হয়েই থাকে। নিচে বাঁদিকে দ্যাখ। নন্দীপুর থানার লকআপে.....

ঝিনুক খবরটা পড়ল। ছোট্ট করে ছাপা হয়েছে। জনৈকা নারী বন্দিনীকে লক আপেই ধর্ষণ করেছে পুলিশ।

মানস সিগারেট ধরাল, এই পুলিশের ভরসায় তুই কেস লড়তে চাইছিস! রক্ষকই যেখানে ভক্ষক!

ঝিনুক বলল, খবরটা নো ডাউট সাঙ্ঘাতিক। তবে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে গোটা পুলিশ সিস্টেমটাকে তো তুমি জাজ করতে পারো না বাবা।

—জাজ করা যায় না, আবার যায়ও। এটুকু হলফ করে বলা যায় সাধারণ সিটিজেন কোন বিপদে পড়লে এই পুলিশ বুড়ো আঙুল দেখাবে। তোকে কোর্টে যাওয়া নিয়ে বোঝাতে গেলাম, তুই মুখ ভার করে বসে রইলি। এটা একবার ফিল করলি না ছেলেগুলো তোকে দেখে এক্সাইটেড হতে পারে। এই তো দিনকালের অবস্থা! কোথা

থেকে কী হয়ে যায় ! হয়তো রাস্তায় অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ই ছুঁড়ে মারল !

সুজাতা বলল, তোমার না আবার বেশি বেশি। যত সব অলুক্ষুণে কথাবার্তা !

—আমি ঠিকই বলছি। এটাই হার্ড রিয়ালিটি। আমি চাই আমার মেয়ে সেটা বুঝুক। আমাদের ফিলজফির সুরেনবাবু বলছিলেন ওদের পাড়ার একটা মেয়ে রাস্তার একটা বখাটে ছোঁড়ার এগেন্‌স্টে পুলিশে কমপ্লেন করেছিল। মেয়েটাকে সেই ছেলে অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ মেরেছে। মেয়েটির কপাল ভাল, মুখে না লেগে হাতে লেগেছিল, তাতেই পুড়ে ঝুড়ে নাকি টেরিবল অবস্থা। এই তো গত হপ্তায়।

ঝিনুক অবাক, কই কাগজে তো বেরোয়নি ?

—সব খবর কি কাগজে বেরোয় ? মেয়ের বাবার খুব হোল্ড। চেপে দিয়েছে খবরটা।

—মেয়ের বাবা চেপে দিয়েছে ? কেন ?

—এটাও কি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে ? মানসের ভুরু জড়ো, মেয়ের নামে কেলেঙ্কারি রটার ভয়ে।

—কেলেঙ্কারি ?

সুজাতা বলল, বিশ্বসংসারের সব কিছু জেনে দিগ্‌গজ হয়েছ, মেয়েদের গায়ে কেন কালি লাগে সেটা বোঝ না ?

—স্ট্রেঞ্জ ! এতো খুনের চেষ্টা ! বাড়ির লোক স্টেপ নেবে না ! মেয়েটা তো মরেও যেতে পারত !

—মেয়েমানুষ মরল তো বেঁচেই গেল। সুজাতা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, দাগী হয়ে বেঁচে থাকা মরে যাওয়ার থেকে বেশি যন্ত্রণার।

কোন পুরুষবাহিত অনভিপ্রেত ঘটনায় কেন শুধু মেয়েদের গায়েই কালি লাগে ? মেয়েরা কী ? মনবিহীন মস্তিষ্কবিহীন শুধুই একটা শরীর ? একটা জঠর ? গর্ভাশয় ?

ঝিনুক বলল, ওসব দিন আর নেই মা। ছেলেরা বজ্জাতি করলে মেয়েরা প্রোটেস্ট করবেই।

—সে তো তুমি করেছই। অনেক হয়েছে। এবার থামো। মেয়ে বড় হয়ে গেলে বাবা-মার তাকে নিয়ে কী যে চিন্তা, তা তুমি কি বুঝবে ?

মানস বলল, তোর সেদিন কোর্টে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমাদের বলতে পারতিস ? কেউ একটা সঙ্গে যেত।

ছোটন উঠে গিয়ে সোফায় বসেছিল। তার চোখের সামনে উৎকট বিদেশি নাচ চলছে। এম টিভি। প্রায় নগ্ন নারী দেহ কম্পিউটারের

জাদুতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে রঙিন পর্দায়। সেখান থেকে তড়াক করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটন, আমায় বলতে পারতিস। জাস্ট ইম্যাজিন আর্নল্ড শোয়্যারজেনিগার তোকে পাহারা দিয়ে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে। কারুর বুকের পাটা হবে তোর দিকে তাকানোর ?

—থাক। ওই তো বাইশ ইঞ্চি বুকের খাঁচা ! তাই নিয়ে উনি আমাকে প্রোটেক্ট করবেন !

শর্টস পরা টিঙটিঙে ছোটনের দিকে তাকাল সুজাতা। ছেলের হাতে পায়ে বুকে বেশ ঘন লোম বেরিয়েছে। পুত্রগর্বে আলোকিত সুজাতার মুখ, ঠাট্টা করছিস কেন ? বুকের খাঁচা যাই হোক, পুরুষ মানুষ তো বটে।

—তাতে আর সন্দেহ কি ! টি শার্টে আবার বড় বড় করে লেখা আছে, আই অ্যাম এ ম্যান। ভাগ্যিস লেখা রয়েছে। নাহলে তো মানুষ বলেই চেনা যেত না !

ছোটন শব্দ করে হেসে উঠল, কী মনে হত রে তাহলে ? সুপারম্যান ?

—বনমানুষ। তোর গলাতে ওটা কী ঝুলিয়েছিস রে ? কদিন ধরেই লক্ষ করছি ?

—দেখতেই তো পাচ্ছিস। লকেট।

—দাঁড়া। দাঁড়া। হঠাৎ লকেট কেন ?

—এমনিই। ছোটন এড়াতে চাইছে।

সুজাতা বলল, পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, তাই এক বন্ধু পরতে দিয়েছে ওকে।

—লকেট খুললেই নিশ্চয়ই কোন বাবার ছবি বেরোবে ?

—ওভাবে বলছিস কেন ? মানস বলল, ও যদি ওটা পরে একটু মেন্টাল কনফিডেন্স পায়, দোষের কী আছে ?

—না, দোষের কী আছে ? একটা বাবাতে সন্তুষ্ট না হয়ে কেউ যদি কুড়িটা বাবা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমার কি !

ছোটন সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল, জানিস এই ফুয়াবাবার কী পাওয়ার ! এ স্পিরিচুয়্যাল ম্যান। মনে রাখিস এই বিশাল গ্যালাক্সি চালানোর পেছনে একটা স্পিরিট আছে। সেই স্পিরিটে অনেকেই বিশ্বাস করতেন। আইনস্টাইনও।

—ওই নামটা মুখে নাহয় নাই আনলি। তোর ফুয়াবাবার শক্তি বোঝাতে তাঁকে কেন অপমান করছিস ? স্বীকার কর, তুই নিজের

ভরসায় পৃথিবীতে চলতে পারিস না। স্পিরিট আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়, তুই নিজে একজন রক্ষাকর্তা ছাড়া হেল্পলেস ফিল করিস। আমাকে তুই রক্ষা করতে যাবি কি করে ?

—রক্ষা করা সত্যিই খুব কঠিন রে। মানসের মুখচোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট, বিশেষ করে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের। আমরা যারা রাজনীতি করি না, যাদের খুব বেশি টাকাপয়সা নেই, কানেকশন নেই, তারাই আজ সব থেকে বেশি অসহায়। তুই যাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়েছিস, তাদের পাওয়ারের কথা ভাব। টাকার জোর বাদই দে। ধর যে গভর্নমেন্টের চাঁইটা রয়েছে তার কি পুলিশের ওপর মহলে যোগাযোগ নেই ? আর প্রোমোটাররা তো পলিটিক্যাল লিডারদের কাঁধ জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। তুই-তোকারির সম্পর্ক। কদিন আগে বিরাটিতে যে গণধর্ষণ হয়ে গেল, কেউ কেশাগ্রও ছুঁতে পারল প্রকৃত দোষীদের ? নাম কা ওয়াস্তে যাদের ধরেছে, তাদের কলা হবে। পার্টির মহিলা সমিতি পর্যন্ত অবলীলায় বলে দিল ওই মেয়েগুলোরই নাকি চরিত্র খারাপ !

ঝিনুক স্থির চোখে মানসকে দেখছিল। কথাগুলো যে তার বাবার কথা নয়, অন্য কারুর আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। স্থির দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করল, আমাকে একটা উত্তর দেবে বাবা ? তুমি যে এত কথা বলছ, ধরো ছেলেগুলো যদি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বাড়ির না হত, যদি আমাদের মতো কোন ফ্যামিলি বা তার থেকেও কোন গরিব বাড়ির হত, তাহলে কি তুমি আমার কোর্টে যাওয়া সমর্থন করতে ?

সাধারণত মানস খুব একটা বেশি কথা বলে না, কিন্তু একবার কথা শুরু করলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কমে থামার অভ্যাস নেই তার। একটু অসহিষ্ণু মুখেই বলল, এসব তো কাল্পনিক প্রশ্ন। কি হলে কি হত, সে কি আগে থেকে বলা যায় ?

ঝিনুক মনে মনে হাসল। তখনও বাবা মা নিশ্চয়ই এভাবেই বাধা দিত। সম্মান ! মেয়েদের সম্মান এরকমই ঠুনকো। রাস্তায় অতি সাধারণ ছেলেও অশালীন অঙ্গভঙ্গি করলে মেয়েদেরই বলা হয়, সামলে চলো। আশ্চর্য ! যুক্তি দিয়ে বাবা কোন কিছুই বিচার করবে না ! করবে না, না করতে চায় না ? হয় টেনশানে ভোগে নয়ত নিরুপায়ের মত পারিপার্শ্বিকের কাছে নীরবে আত্মসমর্পণ করে।

ঝিনুক বাবার উদ্বেগ কমাতে চাইল, আমার কোর্টে যাওয়া নিয়ে বেশি ভেবো না বাবা। শরৎবাবু বলছিলেন, ওরা যদি আমাকে

পথেঘাটে সামান্যতম ভয় দেখানোরও চেষ্টা করে, ওরা আবার অ্যারেস্ট হবে। তখন কোন ক্ষমতাই ওদের জামিনে ছাড়াতে পারবে না।

সুজাতা মানসকে খাবার দিয়ে গেছে। মানস পরোটা ছিঁড়ছিল, —কে শরৎ ?

—শরৎ ঘোষাল। তুমি বোধহয় ওঁকে দেখেছ। ঠাম্মাদের ওল্ডহোমে।

মানস চট করে মনে করতে পারল না।

ঝিনুক আবার বলল, শান্তি পারাবারের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। কালোমতন। বেঁটেখাটো। কাঁচাপাকা গোঁফ।

ছোটন নতুন করে টিভির সামনে গিয়ে বসেছিল, সেখান থেকেই নাক গলিয়েছে, সে কোর্টে কী করছিল ? রুগী মেরে ধরা পড়েছে ?

—না। উনি আলিপুর কোর্টের গভর্নমেন্ট ল'ইয়ার।

—হোমিওপ্যাথ ল'ইয়ার ? ছোটন যেন একটু আগের বিদ্রূপ ফিরিয়ে দিচ্ছে।

—টিজ করছিস কেন ? কোর্টকাছারি করে কি হোমিওপ্যাথি করা যায় না ?

—সরকারি উকিল হলে লক্ষ বার করা যায়। আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে উপরি চাই। খবর নিয়ে দ্যাখ নির্ঘাৎ প্র্যাক্টিস ভাল ছিল না, লাইন করে গভর্নমেন্টের প্যানেলে ঢুকেছে। ওল্ডহোমের লাইনেও টু পাইস ঝাড়ছে।

সুজাতা ব্যালকনিতে টবের পরিচর্যা করছিল। সেখান থেকে চোখ বড় করেছে, ওল্ডহোম থেকে আবার কী রোজগার রে ?

ছোটন হাতের মুদ্রায় অদৃশ্য মাছি তাড়াল, সব কি আর ওপর থেকে বোঝা যায়, মা ? শেষ বয়সের বুড়িদের সেবা শুশ্রূষা করে....ওখানে অনেক বুড়িরই তো মালকড়ি আছে...

ছোটনের ইঙ্গিতে ঝিনুক খেপে গেল, ওখানে যাঁরা থাকেন, তাঁদের হাল জানিস ? তুই তো সাত জন্মে ঠাম্মার কাছে যাস না। দেখেছিস, কী অসহায় অবস্থায় সব পড়ে আছেন ?

—আরে যা, ঠাম্মার নিজের কম মালকড়ি আছে ? দাদুর লাখ খানেক টাকার ফিক্সড ডিপোজিট, উইডো পেনশান....ঠাম্মার কিছু জুয়েলারিও আছে, তাই না মা ? লোকটা হয়ত মালদার বুড়িদের কাছ থেকে টুকটাক হাতায়। আশায় আছে ঠাম্মারা হয়ত উইলে কেউ কিছু লিখে দিয়ে যাবে।

মৃণালিনীর ঘরে চারু ঠাম্মার তোশকের নিচে সার সার কয়েন দেখেছিল ঝিনুক। নাতির জন্য সাজানো। ওই নাতিই নাকি একমাত্র দেখতে আসে ঠাকুমাকে। তোশকের নিচে রাখা কয়েনগুলোর লোভে। ঠাকুমা অন্যমনস্ক হলেই ঝটপট চুরি করে কয়েন সব পকেটে পোরে। চারু ঠাম্মা দেখেও না দেখার ভান করেন। নাতি আসার আগে নিজেই সাজিয়ে রাখেন আধুলি সিকি টাকা। নাতির আসা বজায় রাখতে।

সেই অশিক্ষিত নাতির লোভী মনটার সঙ্গে ছোটনের তফাত কোথায়? ঝিনুকের মনটা তেতো হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে আবারও চিঠিগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল ঝিনুক। চিঠিগুলোকে স্পর্শ করলেই মনের সব মালিন্য উধাও হয়ে যায় ঝিনুকের। এক-একটা কাগজের টুকরো আর কয়েক লাইন লেখা কেমন যেন পাকে পাকে বেঁধে ফেলে তাকে। এই বন্ধনে কোন অধিকারের দাবি নেই, কোন আইনের শৃঙ্খল নেই। এ বন্ধন যেন ঠিক বন্ধনও নয়। এ এক সীমাহীন মুক্তির আকাশ। যে আকাশে শঙ্খচিলের মত সোনালি ডানা মেলে উড়ে যায় ঝিনুক। উঁচুতে। অনেক উঁচুতে।

শরৎ ডাক্তার বলেছিল ঝিনুকের কি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য থাকবে? শরৎ ডাক্তার বোকা। সে জানে না ঝিনুকের থেমে যাওয়ার ক্ষমতা আর ঝিনুকের হাতে নেই।

পরদিন দুপুরে ঝিনুক বিছানায় শুয়েছিল, ছোটন আড্ডা মারতে বেরিয়েছে, হঠাৎ নীলাঞ্জনা এসে উপস্থিত। ঘরে ঢুকেই প্রশ্নবাণ, কি করছিস রে আজ দুপুরে?

ঝিনুক আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল, ঠিক নেই। স্কুলের মাধুরীদির সঙ্গে সন্ধেবেলা নাটক দেখতে যেতে পারি। অ্যাকাডেমিতে।

—আমি খুব বিপদে পড়েছি রে। অরুণাংশুর সঙ্গে আজ দেখা করতে হবে। ভীষণ নার্ভাস লাগছে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

ঝিনুকের বুঝতে সামান্য সময় লাগল। অরুণাংশু মানে সেই বোস্টন? তিনি তাহলে কলকাতায় ল্যান্ড করেছেন? ঝিনুক গিয়ে কী করবে?

নীলাঞ্জনার মুখে খুশিমাখা লজ্জার ছটা, চল না প্লিজ। চিনি না, জানি না...ভাল করে গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না ...তুই থাকলে বস্ একটু ভরসা পাই।

—তার মানে তোদের দু বাড়ির কথাবার্তা প্রায় পাকা ? এখন শুধু লাস্ট হার্ডল ?

—হার্ডল ফার্ডল নেই। ডেট ফিক্সড। শ্রাবণে। নীলাঞ্জনা চোখ টিপল, বিয়ের আগে অরুণাংশু একটু ফরমাল কোর্টশিপ করতে চায়। প্রথমদিন বলেই তোকে বলছিলাম।

ঝিনুক মজা পেল। বাহ্, আধুনিকতার হাওয়ার সঙ্গে রক্ষণশীলতার মিশেল ! চোখ ঘুরিয়ে বলল, আমি কেন কাবাব মে হাড্ডি হব রে ?

নীলাঞ্জনার স্বরে তবু অনুনয়, চল না, অরুণাংশু দারুণ উইটি। ব্রাইট। তোর ওকে একদম খারাপ লাগবে না।

নীলাঞ্জনার মুখে বার বার অরুণাংশু ডাক শুনতে অস্বস্তি লাগছিল ঝিনুকের। লেখাপড়ায় এত ভাল হয়েও এই কাঙালপনা কি নীলাঞ্জনাকে শোভা পায় ?

ঝিনুক হাই তুলল, নারে, আমাকে ছাড়। মাধুরীদির সঙ্গে প্রোগ্রাম হয়ে আছে। আমার জন্য ওয়েট করবে। তা ছাড়া....

ঝিনুকের কথার মাঝে সুজাতা শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। দুই বান্ধবীর সঙ্গোপনে কথা বলা দেখে সেও কৌতূহলী— কি ব্যাপার রে ?

ঝিনুক চোখ নাচাল, বিয়ে। শ্রাবণে। বিয়ের পর শোঁওওও। দুজনেই স্টেটস।

সুজাতা ফস করে বলে উঠল, সে তো তূণীরও যাবে সামনের বছর।

—তুমি না মা। ঝিনুক মাথা ঝাঁকাল, —কোথায় অফিসে কথা হয়েছে কি হয়নি, তুমিও ধরে নিলে ও যাচ্ছে।

সুজাতা বিরস মুখে বলল, তোমার তো সবেতেই ঠোঁট ওল্টানো স্বভাব। হ্যাঁ রে নীলাঞ্জনা, তোরা একটু ঝিনুককে ধমকাতে পারিস না ? এত ডেঁপো হয়ে উঠছে দিন দিন !

নীলাঞ্জনা অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সুজাতা বলল—সেদিন কী করেছে জানিস ? ওই গুণ্ডাদের দেখতে উনি কোর্টে চলে গেছিলেন। একাই। কাউকে কিছু না বলে।

ঝিনুক দপ করে জ্বলে উঠল, জনে জনে এত বলার কী আছে ? মামার বাড়িতে গিয়ে বলছ ! কাকামণিকে বলে এসেছ ! চুরি ডাকাতি করেছি নাকি ?

—তুই বল নীলাঞ্জনা, বাহাদুরি দেখানো হয়ে গেছে, কাগজে নাম বেরিয়েছে, সবাই ধন্যি ধন্যি করেছে, ব্যস। মেয়েদের কি এর বেশি যাওয়াটা ঠিক ?

—ও কী বলবে ? ওর নিজের কোন মত আছে নাকি ?

নীলাঞ্জনা গা বাঁচাতে চাইল, বাবা মা যখন চাইছেন না...গুণ্ডা বদমাইশও বাড়ছে দিন দিন....

ঝিনুক বান্ধবীর দিকে কটমট করে তাকাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, নীলু, এটা তোর সাবজেক্ট না। যা বাড়ি গিয়ে এক মনে বোস্টনের ধ্যান কর। আখেরে লাভ হবে।

নীলাঞ্জনাকে এগিয়ে দিয়ে হনহন করে ঝিনুক মানসের ঘরে ঢুকেছে। পিছন পিছন সুজাতাও।

—বাবা, পরিষ্কার করে বলো তো তোমরা কী চাও ?

মানসের সামনে রাশিকৃত পরীক্ষার খাতা। সে এখন তার কর্মঘোরে। আদরের মেয়ের দিকে চশমা খুলে তাকাল, কি চাই আমরা ?

—তোমরা কি সত্যিই চাও না আমি একটা কজের জন্য লড়ি ?

মানস অন্যমনস্কভাবে বলল, —নিশ্চয়ই চাই।

—তাহলে আমাকে সবাই মিলে আটকাতে চাইছ কেন ?

মানস খাতার গোছা পাশে সরিয়ে রাখল, রেগে যাচ্ছিস কেন ? আমরা মা বাবা, আমাদের তো দুশ্চিন্তা হবেই। তোর বিপদ আপদের কথা ভাবব না ?

—আমার জায়গায় ছোটন হলে ছোটনকেও বাধা দিতে ?

—দিতাম। মানস গম্ভীর, তবে ছোটনের জন্য ভয়টা একরকম। তোমার জন্য ভয় আর এক রকম। আফটার অল তুমি মেয়ে।

—ছোটবেলা থেকে তো এ কথা বলোনি ? বলেছ ছেলেও যা, মেয়েও তাই। আজ অন্য কথা উঠছে কেন ?

মানসের আগে এবার সুজাতা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেওয়া হয়েছে, তাতেই কি তুমি পুরুষমানুষের সমান হয়ে গেলে নাকি ?

ঝিনুকের গলার কাছে একটা কান্না দলা পাকাচ্ছিল। কে বলেছে সে পুরুষমানুষের সমান হতে চায় ? কখখনো না। সে একটা মানুষ হতে চায়।

পুরো মানুষ।

নয়

মাত্র কুড়ি দিনের জন্য এবার দেশে এসেছে প্রমিতা। সিঙ্গাপুর ব্যাংককে মিহিরের কয়েকটা কাজ আছে, কাজ সেরে সেও কলকাতায় দু-চার দিনের জন্য আসবে। তারপর বউ-বাচ্চা নিয়ে অগাস্টের প্রথমে আবার মন্ট্রিল। মিহিরদের নিজস্ব বাড়ি মানিকতলায়। বড় বাড়ি। বড় সংসার। কদিনের জন্য দেশে এসে শ্বশুরবাড়িতে প্রমিতা কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বারাসতে বাবা মা-র কাছেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। মানিকতলায় গিয়ে থেকে আসে এক-আধ দিন। এবারে জোর করে রমিতাকেও বারাসতে ধরে এনেছে। দীর্ঘ আট মাস পর দুই মেয়েকে একসঙ্গে পেয়ে দীপ্তি তপন ভুলে গেছে উদ্বেগের দিনগুলো। দুজনেই খুশিতে আত্মহারা। তপন অফিস ছুটি নিয়ে বসে আছে। একদিন সকলে মিলে নবদ্বীপ মায়াপুর ঘুরে এল, পরদিনই ছুটেছে ইছামতীর দিকে। প্রমিতা বাপের বাড়ি এলে চঞ্চলা কিশোরী হয়ে যায়। রমিতার মনেও পলকের জন্য মেঘ জমার অবকাশ নেই এ বাড়িতে। দুদিন ধরে বর্ষার আকাশটাও এমন হাসিখুশি ছিল যেন সেও এ বাড়ির আনন্দের অংশীদার।

যশোহর রোডের দিকে, একটু ছিমছাম পরিবেশে তপনের ছোট্ট একতলা বাড়ি। ব্যাঙ্ক অফিসার হওয়ার সুবাদে অফিস থেকে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে তৈরি করা। বাড়িটা ঘিরে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দীপ্তি-তপনকে বাগান করার নেশায় পেয়েছে। নানারকম সবজি আর ফুলে ফুলে মনোরম হয়ে উঠেছে জায়গাটা। পূবে পাঁচিলের ধারে বড় একটা কাঁঠালগাছ। বাড়িতে ঘর বেশি নেই, গোটা দক্ষিণ দিক জুড়ে বিশাল এক গোলবারান্দা। তাদের শ্যামবাজারের দমচাপা ভাড়াবাড়ির তুলনায় এ বাড়িতে আলো-বাতাস অনেক অনেক বেশি।

রমিতা বারান্দায় একলা বসে তার প্রিয় কুকুরের গা থেকে পোকা বাছছিল। তিন বছরের ছোট্ট জার্মান স্পিৎজ। ধবধবে সাদা। রমিতাই আদর করে নাম রেখেছিল ভক্তপ্রসাদ। তার বিয়ের পর ভক্তপ্রসাদ বেশ রোগা হয়ে গেছে। নোংরাও। ঘন লোমের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কালো পোকা সহজে বার করা যায় না। দু আঙুলের নখে টিপে টেনে বার করতে হয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই পোকারা পালিয়ে যায় শ্বেত অরণ্যে।

প্রমিতা হুমহুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার কাঁধ অব্দি

কোঁকড়ানো চুল ফুলে ফেঁপে আলুথালু। নাইটির ওপরের দুটো বোতাম খোলা। পিঠ বেয়ে ঝুলছে তার মেয়ে টুকি। সে আদিবাসী রমণীর মত সারাক্ষণ পিঠে মেয়ে নিয়ে ঘোরে। ওইটুকুনি এক বছরের মেয়ের ওজন এত বেশি যে তাকে কোলে নিয়ে ঘোরার জন্য রীতিমত শক্তির দরকার।

রমিতার সামনে এসে ধপ করে মাটিতে বসল প্রমিতা,—আজকেই কেন যাচ্ছিস রে ? আর দু-একদিন থাক না।

রমিতা মুখ তুলে দিদির দিকে তাকাল। সে এখন প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তার চোখের কোণে আর কালি নেই, কথায় কথায় বুকে আর বাজ পড়ে না। পুরনো রূপের দীপ্তি ছাপিয়ে সে এখন আরও বেশি আকর্ষণীয়। লেসের কাজ-করা হাল্কা নীল নাইটিতে সে উর্বশীকেও হার মানায়। ভক্তপ্রসাদকে আদর করে মুখে ছদ্ম করুণ ভাব ফোটাল রমিতা,—যেতেই হবে রে। জরুরি কাজ আছে।

—মারব এক থাপ্পড়। দুদিন পলাশকে না দেখেই প্রাণ আইঢাই করছে, না ? আমি বলে দিচ্ছি রুমু, বর নিয়ে বেশি আদিখ্যেতা করিস না, ওরা তার যোগ্য নয়। এক নম্বরের বেইমান সব।

—কেন রে, মিহিরদা তোকে লুকিয়ে ডেটিং-ফেটিং করছে নাকি ?

—ধুর। পাল পাল বিকিনি-পরা মেয়ে দেখতে হবে বলে ভয়ে সি-সাইডেই যেতে চায় না। যত হুজ্জুতি বউ-এর ওপর। বাড়িতে থাকলে সিগারেটের ছাইটা পর্যন্ত নিজে উঠে ফেলে না, শুধু হাঁকাহাকি, মিতু অ্যাশট্রেটা নিয়ে এসো তো। বলতে বলতে প্রমিতা আচমকা জড়িয়ে ধরল বোনকে,—সুণ্টুমুণ্টু, তুই আজ যাস না প্লিজ।

রমিতার বুকে একটা চাপা উত্তেজনা গুড়গুড় করছিল। আজই রিপোর্টটা নিয়ে আসবে পলাশ। হে ভগবান, সন্দেহটা যেন মিথ্যে হয়। রমিতা একবার ভাবল কথাটা বলে ফেলে দিদিকে, পরক্ষণে মন বদলেছে,—নারে দিদি, আজ যেতেই হবে। সত্যিই কাজ আছে।

টুকি হাত বাড়িয়ে ভক্তপ্রসাদের লোম ধরে টানছে। থপথপ দু পা এগিয়ে একেবারে মুখে হাত ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্তে দুই বোন সেদিকে মনোযোগী। রমিতা টুকিকে কোলে টেনে নিতেই গরগর করে উঠেছে ভক্তপ্রসাদ।

প্রমিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল,—ওমা, কী হিংসুটে রে !

রমিতা টুকির গালে চুমু খেল,—মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষের মতই অভ্যেস হচ্ছে আর কি।

প্রমিতার মাথায় সব সময়েই কোনও না কোনও পরিকল্পনা

চলছে। এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় যেতে তার সময় লাগল না,—তুই তো বিকেলে চলে যাবি, চল না এখনই পার্লার থেকে ঘুরে আসি। সুপার মার্কেটে নতুন একটা বিউটি পার্লার খুলেছে শুনলাম? ফেসিয়াল করে আসি চল। আমার চুলটাও একটু ট্রিম করাতে হবে।

—বারাসতে! ইসস, তোর কী টেস্ট হয়েছে রে দিদি! আমি এখানে মরে গেলেও করব না।

—উম্‌ম্‌, আট মাসে অনেক বদল হয়েছে দেখছি। ছিলি তো স্যামবাজারের সসীকলা। বালিগঞ্জে গিয়েই ওমনি বালিগঞ্জের বিবি!

—বালিগঞ্জ নয়, টালিগঞ্জ। আর আমি বিউটি পার্লারে যাই ভবানীপুরে। শাশুড়ির বান্ধবীর পার্লারে। দারুণ থার্মোহার্ব করে। বলিস তো তোকেও এক দিন নিয়ে যেতে পারি। আমার শাশুড়ি জা-রাও সব ওখানে যায়।

—অদ্দূর! আচ্ছা ওদিকে কি একটা বড় মার্কেট হয়েছে না! ডিফারেন্ট স্টেটের দোকানপাট আছে! ভাল শাড়ি পাওয়া যায়...! তৃষ্ণা লাস্ট বার এসে ওখান থেকে দুর্দান্ত দুটো বোমকাই আর নারায়ণপেট কিনে নিয়ে গেছে।

কোলে টুকিকে নিয়ে রমিতা ঝকঝকে সবুজ মোজাইকের মেঝেতে পা ছড়িয়ে দিল। সকালে লুচি খেয়ে এখনও কেমন গা-টা গুলোচ্ছে। একটা ছোট্ট ঢেকুর তুলে রমিতা বলল,—তুই কি দক্ষিণাপণের কথা বলছিস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইরকমই কি একটা নাম। ওটা ভবানীপুরে না?

দিদির অজ্ঞতায় মজা পেল রমিতা। তার দিদিটা মিহিরদার সঙ্গে তিনটে মহাদেশের অনেকটাই ঘুরে ফেলেছে। কিন্তু কলকাতাটা মোটেই ভাল করে চেনে না। হাসতে হাসতে বলল,—ভবানীপুরে নয়। ঢাকুরিয়ায়।

প্রমিতা সঙ্গে সঙ্গে ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে,—ওখান থেকে তোর শাশুড়ির বিউটি পার্লার কত দূর?

—তেমন দূর নয়।

—তা হলে চল খেয়ে উঠে বেরিয়ে পড়ি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আগে তোর দক্ষিণা বনে যাই চল। কয়েকটা ভাল শাড়ি কিনতে হবে।

রমিতা সংশোধন করে দিল,—বন নয়, পণ। দক্ষিণ আপণ, দক্ষিণাপণ।

—ওই হল। প্রমিতা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল,—চল। আজ নাহয়

মানিকতলাতে থেকে যাব।

রমিতা আমতা আমতা করল,—কিন্তু আমার যে বাবার সঙ্গে যাওয়ার কথা ?

—বাবা আর গিয়ে কী করবে ? বিউটি পার্লারের বাইরে বসে থাকবে ? কোনও দরকার নেই। তুই ভবানীপুর থেকে একা শ্বশুরবাড়ি ফিরতে পারবি না ?

প্রমিতা জেটপ্লেনের গতিতে পরিকল্পনা ভাঁজতে পারে, রকেটের গতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আলোর গতিতে একাই হিল্লিদিল্লি করে বেড়াতে পারে। বারাসত থেকে ঢাকুরিয়া, ঢাকুরিয়া থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে মানিকতলা। কিন্তু রমিতা তো প্রমিতা নয়। দু মাস আগে হলেও না হয় কথা ছিল, এখন প্রশ্নই আসে না। পলাশের সঙ্গে সম্পর্ক আবার বেশ সহজ হয়ে এসেছে, সে হয়তো কিছু মনে করবে না, কিন্তু পলাশের বাবা মা ? রমিতার বুক ধুকপুক করে উঠল। সন্দেহটা আবার খচখচ করে উঠেছে। হে ভগবান যেন মিথ্যে হয়। যেন মিথ্যে হয়।

প্রমিতা প্রখর বুদ্ধিমতী। বোনের মুখ দেখেই সে দ্বিধাটা অনুমান করে নিয়েছে। মমতামাখা গলায় বলল,—ভাবিস না, আমি তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

বেলা বাড়ছে ক্রমশ। কাঁঠালপাতার ফাঁক দিয়ে শ্রাবণের লাজুক সূর্য আলোর সংকেত পাঠাচ্ছে। তপন হুইলছিপ নিয়ে কাকভোরে বেরিয়ে গেছে, এখনও তার দেখা নেই। কাল রাত্রে দুই মেয়ের সঙ্গে বাজি হয়েছে, মেয়েদের নিজের হাতে ধরা মাছ খাওয়াতে না পারলে সে বুঝি এ বেলা আর ফিরবেই না। টুকি রমিতাকে ছেড়ে টলমল পায়ে কখন ভিতরে চলে গিয়েছিল, দীপ্তি নাতনির হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে। তার চিন্তিত চোখ ঘুরেফিরে গেটের দিকে।

প্রমিতা মাকে বলল,—আমি দুপুরে রুমুর সঙ্গে বেরোব ভাবছি। কিছু মার্কেটিং সেরে রুমুকে ওর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আজ মানিকতলায় থেকে যাব। তুমি এক রাত্তির টুকিকে সামলাতে পারবে না ?

টুকির তেমন বিশেষ বায়নাক্কা নেই। দাদু দিদার সঙ্গে ভাল ভাব হয়ে গেছে, মাকে ছেড়ে দিব্যি থাকতে পারবে। তাকে নিয়ে ভাবছিল না দীপ্তি। অন্য ভাবনায় তার কপালে ভাঁজ পড়েছে,—তোর রুমুকে পৌঁছতে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

—তোমরা কী মা ! সব সময় এমন ভাব করে আছ যেন রুমি চুরি

করতে গিয়ে ধরা পড়েছে !

দীপ্তি ভয়ে ভয়ে বড় মেয়ের দিকে তাকাল। তার গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, গড়ন ছোটখাটো, রোগাটে। বড় বড় টানা চোখে তার সর্বদাই ত্রাস লেগে থাকে।

প্রমিতা উত্তেজিত মুখে বলল,—হয়েছেটা কি শুনি ? কী এমন হয়েছে ? কয়েকটা হুলিগান রাস্তায় রুমুর সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল, তাই তো ? নোংরামি তো তারা করেছে। ধরাও পড়েছে। অ্যান্ড দে উইল বি পানিশড্। ওভার। এতে এত ভেঙে পড়ার কী আছে ?

দীপ্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল,—এতো আর তোমার কানাডা আমেরিকা নয়, এ হল ভারতবর্ষ। এ দেশে মেয়েদের যে কত যন্ত্রণা !

—রাবিশ। ও দেশেও মেয়েরা এমন কিছু সুখে নেই। রেপ মলেস্টেশান তো ওখানে মুড়ি-মুড়কি। যে দেশ যত অ্যাডভানসড, মেয়েদের অবস্থা সেখানে তত বেশি খারাপ। জানো, ইউ এস এ-তে ঘটা করে রেপ ক্লক লাগানো হয়েছে ? কি, না সারা দেশে যত রেপ হবে ঘড়ি তার হিসেব দিতে থাকবে। কী ঘেন্না !

—তা হোক, ও দেশে কেউ এ সব নিয়ে তেমন মাথাও ঘামায় না, কাদাও ছেটায় না।

—সব দেশই এক মা। রেপড্ মেয়েদের ওখানেও কিছু দেবী জ্ঞান করে না। তফাত এটুকুই, ও দেশের মেয়েদের সাহস একটু বেশি, তাই একটু বেশি প্রোটেস্ট করে, এই যা। এখানেও দরকার হলে রুমু কোর্টে গিয়ে ছেলেগুলোর মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে আসবে। কিরে রুমু, পারবি না ?

রমিতার রক্তপ্রবাহ দ্রুত হল। চোখের সামনে শ্রবণা সরকার উন্মত্তের মত একটা ভারী ব্যাগ ঘুরিয়ে চলেছে। আঘাত হানছে।

দীপ্তির মুখে ছায়া ঘনাল,—ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেতে দিলে তো। যা ওদের টনটনে বংশগরিমা !

—ওরা পিকচারে আসছে কোত্থেকে ! এটা এনটায়ারলি রুমুর প্রবলেম। বড়জোর বলা যায় রুমু আর পলাশের প্রবলেম। তেমন ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে পলাশ ও বাড়ি ছেড়ে দিক। ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, ভাল রোজগার করে, দিব্যি থাকবে দুজনে।

রমিতার এতক্ষণে হাসি পেল। পলাশ বাবা মা-র মুখের ওপর কথা বলবে ! নিজেকেই কি শাসন করার ক্ষমতা আছে পলাশের ?

টুকি গ্রিলের ধারে গিয়ে তা-তা-তা-তা করে চিৎকার করছে। তপনকে দেখেই তার এই উল্লাস। তপনের এক হাতে দড়িতে

ঝোলানো বড় রুইমাছ, অন্য হাতে হুইল ছিপ। বিকট হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে আসছে সে, —তুমি মোর পাও নাই পাও নাই পরিচয়...

প্রমিতা দৌড়ে গিয়ে বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল মাছটা। মাছটার গায়ে হাত বুলিয়েই চিৎকার করে উঠল,—তুমি হেরে গেছ। তুমি হেরে গেছ। এটা বরফের মাছ।

তপন বেশ লম্বা-চওড়া। নাক চোখ মুখ গ্রিক ভাস্কর্যের মতো কাটা কাটা। এক সময়ে সে ময়দান কাঁপিয়ে ফুটবল খেলেছে, স্টেট ট্রায়ালেও ডাক পেয়েছিল, ব্যাঙ্কের চাকরিটাও তার খেলার দৌলতেই। শক্তসমর্থ পেটানো শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল তপন,—ধরে ফেললি! এখনও ঠাণ্ডা ভাবটা যায়নি, নারে? দুলালকে কত করে বললাম মাছটা আরেকটু জলে ভিজিয়ে রাখ!

—তুমি এতক্ষণ বসে থেকেও মাছ ধরতে পারলে না? রমিতা জলতরঙ্গের মতো হাসছে,—নিশ্চয়ই পুকুরপাড়ে বসে গান গাইছিলে, এসো এসো আমার চারে এসো...

—মাছেরাও চালু হয়ে গেছে রে। আজকাল আর স্ট্যান্ডার্ড চার খেতে চায় না। এবার থেকে চাউমিন আর রোলের কুচি দিতে হবে। হা হা।

দীপ্তি মাছ নিয়ে ভিতরে চলে গেল। তপন নাতনিকে শূন্যে ছুঁড়ে দু হাতে লুফে নিচ্ছে। টুকি বেজায় খুশি। এ ধরনের খেলাই তার বেশি প্রিয়। সে অনবরত বলে চলেছে, তা-তা-তা-তা...

বারকয়েক লোফালুফি করার পর তপন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল,—দাঁড়ারে বিটি, একটু জিরিয়ে নিই। কী খাওয়াস রে মিতু টুকটুকিকে? যা সলিড হয়েছে...!

প্রমিতা বলল,—ও দেশে সিরিয়াল খুব ভাল। খাবারে ওরা ভেজাল দেয় না।

—সে জন্যই তো মিহিরকে বলি, এ দেশে ফেরার আর নাম কোরো না।

—না বাবা, তুমি একদম ওকে উসকিও না। আমি বলে দেশে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

রমিতা বাবার পাশে চুপটি করে বসেছিল। এখনও বাবার পাশে বসে থাকলে এমন একটা প্রশান্তি আসে! সে ঠোঁট ওল্টালো,—বিদেশে থাকলে ওরকম সবারই একটু দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে। একবার ওখানে থাকা অভ্যেস হয়ে গেলে এখানে এসে

টিকতে পারবি ? যা হরিবল্ অবস্থা এখানকার !

—যে অবস্থাই হোক, মেয়ের বয়স দশ বছর হলে আমি আর ও দেশে নেই। চোখের সামনে দুধের মেয়ে নাচতে নাচতে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ডেটিং করতে বেরিয়ে যাবে, আর আমি সেই মেয়েকে পিল গিলিয়ে যাব ! অসম্ভব।

রমিতা ভুরু নাচাল,—মিহিরদা যদি না আসতে চায় ?

—ওর ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমাকে ছেড়ে থাকবে ?

মিহিরদাটা কী ভাল ! রমিতার বুক চিনচিন করে উঠল। পলাশ আরও বেশি হেরে যাচ্ছে মিহিরদার কাছে।

তপনের ভাবনাও রমিতার মত ঘন ঘন বদলায়। সে বলল,—সেই ভাল। বিদেশ-বিভুঁয়ে কেন পড়ে থাকবি ? এবারেই আমি মিহিরকে খোঁচাতে শুরু করছি।

জোলো হাওয়া শুরু হল। দু দিন অবসরের পর বর্ষার সৈনিকরা উর্দি পরে সার সার জড়ো হচ্ছে আকাশে। প্রমিতা ঝামর চুল পাকিয়ে বড়িখোঁপা করে ফেলল। বড্ড উড়ছে। বোনকে বলল,—যা না, বাবার জন্য একটু কফি করে আন না। আমার জন্যও আনিস।

রমিতা উঠে যেতে প্রমিতা তার বাবার কাছ ঘেঁষে বসল। তপনকে সবিস্তারে শোনাচ্ছে আজকের কর্মসূচি।

তপন চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবল একটু, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়েছে, —তুই রুমুকে নিয়ে যাবি বলছিস ? যা। বলিস তো আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

—আচ্ছা বাবা, ব্যাপারটা কী বলো তো ? মা বলছিল, পলাশ নাকি চায় না রুমু কোর্টে সাক্ষী দিতে যাক ?

তপন হতাশভাবে হাত ওল্টালো।

—কোর্ট সমন পাঠালে না গিয়ে পার পাবে ?

—কোর্টের হুকুমে ঘোড়া ঝরনার ধার অব্দি যেতে পারে, কিন্তু জল খাবে কি না সেটা তো ঘোড়ার ব্যাপার। জোরে কথা বলা তপনের মজ্জাগত অভ্যাস। ভিতরের দিকটা একবার দেখে নিয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টায় গলা নামাল, —পলাশকে নাকি কারা ভয় দেখিয়েছে। কোর্টে গিয়ে রুমু যেন বলে কাউকে চিনতে পারছে না। কে জানে বাবা সত্যি না মিথ্যে। আমার ধারণা পলাশ ডজ্ করছে। ভয় দেখানোটা ফলস। নিজেই আর এগোতে চায় না। প্রেস্টিজ !

—এ কিরকম কথা ! প্রমিতা ভীষণ বিরক্ত হল,—রুমু জানে ?

—বোধহয় না। আমাকে তো কিছু বলেনি রুমু।

—বাহ্, রুমুর মানসম্মান পলাশের মানসম্মান নয়? রুমু কি আমাদের ফ্যালনা? তেমন হলে চলে আসুক, ওখানে থাকতে হবে না। দেখি বাছাধন তারপর কি করে!

তপনের গলা ভারী হল,—তুই এসেছিস বলে তাও দু দিন মেয়েটার একটু হাসিমুখ দেখতে পেলাম। অত জলি মেয়ে সব সময় সাজত গুজত...বেড়াত ঘুরত...এটা কিনছে সেটা কিনছে...এক দিনে সেই মেয়ে...

—এটা আবার রুমুর বেশি বাড়াবাড়ি। তোর কি রে? তুই তো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবি! তোমরাও ওকে বড় ফুলটুসি করে মানুষ করেছ বাবা। শ্রবণা সরকারকেই দ্যাখো না। সেও তো আমাদের মতো ঘরেরই মেয়ে!

—আমার যদি রক্তের জোর থাকত, আমিই ওই ছেলেগুলোকে দেখে নিতাম। তপন গলা চড়াতে গিয়েও সামলে নিল,—এখানে তোর মার কাছে এসেও অনেকে আহা উহু করে গেছে, আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। ভেবেছিলাম একবার ওই শ্রবণা মেয়েটার বাড়ি যাব, রুমুর কথা মনে করেই নিজেকে আটকালাম। ওর শ্বশুরবাড়ি যখন চায় না...! যদি ওর কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!

—রুমুও শ্রবণার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি?

রমিতা দু হাতে কফিমগ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। তার চোখ বিস্ফারিত। লালচে মুখে একবিন্দু রক্ত নেই। হা ভগবান, এখানেও তাকে নিয়ে ফিসফাস!

পার্লার থেকে বেরিয়ে এবারও আফসোস হল রমিতার। কিছুতেই মুখ ফুটে গাছপালার নির্যাসে তৈরি তার 'মুখটাকে' চাইতে পারল না। মুখ? না মুখোশ? যাই হোক, তারই তো মুখের ছাপ। কী চমৎকার কায়দা করে মুখে লেপে দেয় লেইটা। শুকিয়ে গেলে নিপুণ কৌশলে চড়চড় করে উঠে আসে শুকনো ভেষজ মুখোশ। ওই মুখোশে লেগে থাকে রোমকূপের প্রতিটি ময়লার কণা। মুখ হয়ে ওঠে আরও চকচকে। মসৃণ। একটা ছোট্ট নিশ্বাস জমাট বাঁধল রমিতার বুকে। জীবনটাও যদি এরকম হত! লেপে দেওয়া কলঙ্ক শুকিয়ে যাওয়ার পর চড়চড় করে টেনে তুলে নিত কোনও নিপুণ যাদুকর! জীবন ফিরে আসত আরও গাঢ় উজ্জ্বলতায়!

প্রমিতা বোনের শাশুড়ির বান্ধবীর সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে কথা

বলছে। তিনিও কানাডা প্রবাসী খদ্দের পেয়ে আহ্লাদে ডগমগ। তার পরিচর্যা করা প্রৌঢ়া মুখে খেলে বেড়াচ্ছে লাস্য। নিখুঁত প্লাক করা ভুরুতে, আইলাইনার-রঞ্জিত চোখে ব্রীড়ার আভাস। ববকাট চুলে হিল্লোল তুলে সে বলল,—আবার এসো কিন্তু।

মহিলার কচি কচি হাবভাব দেখে দুই বোন বাইরে এসে হেসে কুটিপাটি। রাস্তার লোকজন তাদের ঘুরে ঘুরে দেখছে, প্রমিতার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আজ মন ভরে বাজার করেছে। বেশ কিছু শাড়ি আর ড্রেস মেটিরিয়াল। টুকিটাকি বাহারী ঘর সাজানোর জিনিস। দিলদরিয়া মেজাজে বোনের জন্য একটা দামী পছমপল্লী শাড়ি। মা আর শাশুড়ির জন্য তাঁত সিল্ক। গাদাখানেক প্লাস্টিক ব্যাগের ভারে সে একবার ডানদিকে হেলে পড়ছে, একবার বাঁদিকে। অনেকটা চিলড্রেনস পার্কের ঢেঁকুচকুচের মত।

দুপুর থেকে বেশ কয়েক দফা ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও বারিকণা পরাগরেণু হয়ে উড়ছে বাতাসে। ভিজে পিচের ওপর হিরের কুচির মতো রাস্তার আলোর বিচ্ছুরণ। সন্ধ্যা ঘন।

এত ঘোরাঘুরি করেও প্রমিতার ক্লান্তি নেই, হাজরার মোড়ে এসে সে বলল,—এই, মেট্রোতে যাবি? কলকাতার মেট্রো রেল এত সুন্দর...

রমিতা সজোরে মাথা ঝাঁকাল দুদিকে,—না না না না। ট্যাক্সিতে চল। ট্যাক্সিওয়ালা প্রমিতার সঙ্গে সুবিধা করতে পারল না। সে উত্তরেও যাবে, দক্ষিণেও যাবে।

ট্যাক্সিতে বসে পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মতো অবিরল কলকল করে চলেছে প্রমিতা। তার স্বামী কত উদাসীন। বউ-এর জন্য একটা পারফিউম পর্যন্ত কিনে আনে না। শ্বশুর শাশুড়ি আবার কানাডা যাওয়ার বায়না ধরেছে। প্রমিতার ইচ্ছে, এবার নিজের মা বাবাকে নিয়ে যাওয়ার। কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে জা ননদরা কিভাবে কসমেটিকসগুলো হাতিয়ে নিল। দেশে আসার আগে তারা আলাস্কা বেড়াতে গিয়েছিল। কী ঠাণ্ডা! কী ঠাণ্ডা! বরফের মরুভূমি! মিহিরের খুব ইচ্ছে টুকিকে এখনই সাঁতার শেখাবে। প্রমিতা রাজি নয়। ইত্যাদি। ইত্যাদি। অজস্র শব্দমালা জলপ্রপাতের উচ্ছ্বাস নিয়ে রমিতার কানে আছড়ে পড়েই ছেতরে যাচ্ছিল। দু-চারটে হুঁ হাঁ ছাড়া রমিতা শব্দহীন। দিদিটা কী সুখী! দিদিটা কী সুখী!

রাসবিহারী মোড়ে ট্যাক্সি আটকে রয়েছে অনেকক্ষণ। ট্রাফিক জ্যাম। প্রমিতার ছটফটে চোখ ট্যাক্সির বাইরে,—ওফ কলকাতায় কী

মানুষ বেড়ে গেছে রে !

রমিতা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। ডানদিকের ফুটপাথ ধরে ওটা কে হাঁটছে ! শ্রবণা সরকার না ! ঘন নীলের ওপর সাদা টিপ টিপ কামিজ ! সাদা সালোয়ার ! সাদা ওড়না ! হ্যাঁ শ্রবণাই তো। সঙ্গে একটা লম্বা ছেলে। দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে রমিতাদের ট্যাক্সির দিকেই। রাস্তা পার হওয়ার সময় চোখ দুটো কি রমিতাকে ছুঁয়ে গেল ! রমিতার চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করল, শ্রবণাদি, আমি রমিতা। শ্রবণাদি, আমি এদিকে। শ্রবণাদিইই...। কণ্ঠে কোনও স্বরই ফুটবল না। গলা শুকিয়ে কাঠ। নাড়ির গতি অস্বাভাবিক চঞ্চল। শ্রবণা হারিয়ে গেল জনারণ্যে। রমিতা ট্যাক্সির সিটে মাথা রাখল। হাঁপাচ্ছে অকারণে। প্রমিতা খেয়ালই করল না বোনকে। ট্যাক্সি স্টার্ট নিতে সেও হেলান দিয়েছে সিটে,—বাব্বাহ, বাঁচলাম।

গলফ্ ক্লাব অ্যাভিনিউ এগিয়ে আসছে। প্রমিতা বলল,—অনেক রাত হয়ে গেছে রে। আটটা বাজে। আমি কিন্তু নামছি না।

রমিতা শিথিল চোখে দিদির দিকে তাকাল। সেও ঠিক চাইছিল না প্রমিতা নামুক। দিদির সঙ্গে এত রাতে ফেরাটা কি মনে নেবে সবাই কে জানে ! মুখে তবু বলল,—একবার অন্তত নাম। মুখ দেখিয়ে চলে যাবি।

প্রমিতা থমকাল,—আমি না নামলে তোর অসুবিধে হবে ?

—না না, তা কেন ! ওরা এমনিতে মোটেই তেমন খারাপ লোক না। রমিতা সামান্য অপ্রস্তুত হল,—তোকে দেখলে শাশুড়ি খুশিই হবে।

—আজ থাক। যাওয়ার আগে একদিন দেখা করে যাব। ডেফিনিট। তুই একটু বুঝিয়ে বলে দিস।

রমিতাকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাক করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। শাড়ির প্যাকেট হাতে রমিতা দোতলায় উঠল। সহসা হাঁটুতে যেন জোর পাচ্ছে না সে। কদিন ধরে জমে থাকা সংশয় চরকি খেতে শুরু করেছে আবার। আঙুলের প্রবালটা ছুঁয়ে আশ্বাস পেতে চাইল রমিতা, হে ভগবান, সন্দেহটা যেন মিথ্যে হয়।

পলাশ মা-র সঙ্গে বসে টি ভি দেখছিল। বাড়িটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। মনে হয় লীনা-অশোক নেই।

রমিতার পায়ের শব্দে দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়েছে। রমিতা শাশুড়ির সামনে এসে দাঁড়াল,—দিদি নামিয়ে দিয়ে গেল। দেখুন, কী সুন্দর

একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে আমাকে !

বাক্স খুলে শাশুড়ি উল্টেপাল্টে দেখল শাড়িটা। নরম গোলাপি জমির ওপর চকোলেট রঙের নক্সা, —বাহ, কত নিল ?

—চোদ্দশ। ডিসকাউন্ট দিয়ে বারো শ টাকা।

—খুউব সুন্দর হয়েছে। তা দিদি উঠল না কেন ?

—মানিকতলায় ফিরবে তো। আসবে এর মধ্যে একদিন।

—তুমি আরও দু-একদিন ওখানে থেকে এলেই পারতে। কতদূর থেকে দিদি এসেছে। শাশুড়ি খুব মিষ্টি করে হাসল।

পলাশের চোখে চোখ পড়ে গেল রমিতার। দ্রুত সন্দেহটার উত্তর খুঁজল পলাশের মুখে। বুঝতে পারল না।

স্টার টি ভি-তে বিদেশী চিত্রতারকাদের বিচিত্র জীবনযাপনের দৃশ্য দেখাচ্ছে। শাশুড়ির চোখ আবার সেই ঐশ্বর্যের অপরূপ প্রদর্শনীতে মগ্ন। দু-এক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে রমিতা নিজের ঘরে এল।

পলাশও পিছন পিছন এসেছে। রমিতা কোনও প্রশ্ন করার আগেই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল শূন্যে। বনবন করে দু পাক ঘুরে যুগ্ম শরীর গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। রমিতা কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করল, —কি করছটা কি ! দরজা খোলা রয়েছে না ! মা বসে আছেন... !

পলাশ তাড়াতাড়ি উঠে দরজা ভেজিয়ে আবার বিছানায় এসে বসল,—উফ, যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে ! কতক্ষণ থেকে তোমার জন্য বসে আছি। আজ তুমি না ফিরলে...সারা রাত আমি বারান্দায় বসে থাকতাম।

রমিতা পাশ ফিরে আধশোওয়া হল। দ্রিম্‌দ্রিম্ দ্রিম্‌দ্রিম্ !

—রিপোর্ট এনেছ ?

—কি মনে হয় ? রমিতার আফোটা রজনীগন্ধার মত আঙুল নিয়ে খেলা করছে পলাশ,—এনেছি গো, এনেছি।

দ্রিম্‌দ্রিম্ দ্রিম্‌দ্রিম্ দ্রিম্‌দ্রিম্ দ্রিম্‌দ্রিম্, —কি বলছে রিপোর্টে !

পলাশ রমিতার চোখে গাঢ় দৃষ্টি রাখল,—এখনও উত্তর পাওনি ?

রমিতার শরীরটা শিথিল হয়ে গেল।

পলাশ আদরে আদরে অস্থির করছে তাকে,—কী হবে গো ? ছেলে ? না মেয়ে ?

সন্দেহটাই সত্যি হল ! হা ভগবান।

—এনি বডি ইজ ওয়েলকাম। পলাশ তরলভাবে বলে চলেছে,—তবে মেয়ে হলে আমার বেশি ভাল লাগবে।

রমিতা চোখ বুজে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে ভবিতব্যটাকে। পলাশ ভাবছে তার আদর উপভোগ করছে রমিতা।

—কি গো, কথা বলছ না যে ? তোমার কী চাই ?

মেয়ে হলে কি আবার রমিতা ? নাকি শ্রবণা সরকার ? রমিতার ঠোঁট অল্প ফাঁক হল,—ছেলে হওয়াই তো ভাল।

—এহ, তোমার ছেলে ভাল লাগে ?

—মন্দ কি। বেশ ডানপিটে হবে। হাতে পায়ে দস্যি। গুণ্ডা গুণ্ডা।

—তুমি খুব গুণ্ডা ভালবাস, না ? পলাশ ফিকফিক হাসছে।

রমিতা মুহূর্তের জন্য নিথর। পলাশ ঘুঝল কথাটা বলা ঠিক হয়নি। বউকে সহজ করার জন্য ঠোঁটে পলকা চুমু খেল, —ঠাট্টাও বোঝ না ? আজকাল ছেলে-মেয়ে সবই সমান। চাও তো টেস্ট করিয়েও নিতে পারো। আগে থেকেই জেনে যাবে ছেলে হবে, না মেয়ে হবে।

রমিতার চোখ পলাশকে ভেদ করে জানলার দিকে চলে যাচ্ছে। হিসাবটা আরেকবার মেলাতে চাইছে রমিতা। নড়বড়ে স্বর প্রশ্ন করল, —এক্সপেক্টেড ডেট কিছু দিয়েছে ডাক্তার ?

পলাশ রমিতাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল,—বলল তো এইটথ উইক চলছে।

রমিতা মনে মনে বলল, জানি। জানি।

—এক্সপেক্টেড ডেটও তো দিল একটা। কত তারিখ যেন ? পার্স থেকে একগোছা কাগজ বার করে প্রেসক্রিপশান খুঁজছে পলাশ।

সময়ের উল্টো স্রোতে চলতে শুরু করল রমিতার মন। তার হিসাবটাই ঠিক। এইটথ উইক ! তার মানে টালিগঞ্জের ঘটনার সাত-দশ দিন পরে !

পলাশ কাগজটা দেখে নিয়ে টেবিলে রাখল,—এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি। সাতাশ।

রমিতা শুনতে পেল না। ওই সময় একদিন ! একদিনই তো শুধু... ! অপমানের রাতটা ঝাঁকাচ্ছে নতুন করে। রমিতার চোখ জানলা পেরিয়ে বহু দূরে ভেসে গেল। এই সব নিমগ্ন ক্ষণে রমিতার সৌন্দর্য কেমন অপার্থিব হয়ে যায়। সে তখন আর মানবী থাকে না, হয়ে ওঠে এক অচিন পাখি। তার দিকে তখন শুধু নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকা যায়, ছোঁয়া যায় না, যেন স্পর্শ করলেই মিলিয়ে যাবে স্বপ্নের মত। পলাশ আর তার হদিশ পাবে না কোনও দিন।

পলাশ সম্মোহিতের মত এগিয়ে এসে ঝুঁকেছে,—কী ভাবছ? অ্যাই? অ্যাই... ? যে আসছে তার কথা? আমাদের ভালবাসার সন্তানের কথা?

রমিতার হৃদয়ে সরোদের তার ছিঁড়ে গেল। সে রাত্রে কি ভালবাসার অস্তিত্ব ছিল কোথাও? সন্তান আসছে নেহাতই জৈবিক নিয়মে। রমিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাললাগার তোয়াক্কা না করে। কী নিষ্করুণ সৃষ্টির এই নিয়ম!

দশ

হেড মিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিনুক। ভিতরে এক গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক বসে আছে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। মাথার চুল কুচি কুচি করে কাটা।

সুনীতা ডাকল,—আয়। চিনিস এঁকে? তোর ক্লাসের যুধাজিতের বাবা। এঁর একটা কমপ্লেন আছে।

খিদেয় পেট চিনচিন করছে ঝিনুকের। সকালবেলা বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এত দেরি হয়ে গেল, কিছু খেয়ে বেরোনো হয়নি। তিন দিন ধরে রোজ রাত বারোটা নাগাদ একটা ভুতুড়ে ফোন আসছে। দু দিন বাবা ধরেছে, এক দিন মা। ধরার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে যায় ফোনটা। ঝিনুক পাত্তা দিতে চায়নি, বাবা-মা'র দুশ্চিন্তা দেখে শুধু একবার বলেছিল, চাও তো থানায় গিয়ে জানিয়ে আসতে পারি, বাবা-মা'র উত্তেজনা তাতে বেড়ে দ্বিগুণ।

সুনীতা জিজ্ঞাসা করল,—কাল তোর ক্লাসে কী হয়েছিল?

কী হয়েছিল? ঝিনুক চট করে মনে করতে পারল না। তীব্র খিদের সঙ্গে হালকা ঘামের মতো লেপে আছে উদ্বেগ। মাথাটা তার ঠিক কাজ করছে না।

—তুই নাকি কাল লাস্ট পিরিয়ডে বাচ্চাদের খুব মারধর করেছিস? এঁর ছেলেকে নাকি... !

—ও কথা তো আমি বলিনি ম্যাডাম। হাঁড়িমুখো লোকটা নড়ে বসল, —আমি বলছিলাম, কাল উনি কী বলেছেন তাতে আমার ছেলে ভীষণ টেরর হয়ে গেছে। কিছুতেই স্কুলে অ্যাটেন্ডেন্স করতে চাইছে না।

ইংরিজির ভুলভাল প্রয়োগ শুনে হাসি চাপতে গিয়ে ঝিনুকের মনে পড়ে গেল কালকের ব্যাপারটা। শেষ পিরিয়ডে দুটো ছেলে স্কেল

নিয়ে মারপিট করছিল, স্কেল কেড়ে যেই না ঝিনুক অন্য বাচ্চাদের লেসনে চোখ বোলাতে শুরু করেছে, অমনি ছেলে দুটো বাঘ আর বুনো শুয়োর। খালি হাতেই লড়াই। আঁচড় কামড়। শেষ পিরিয়ডে এমনিতেই ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, কড়া শাসনে না রাখলে কিছুতেই তাদের তখন বাগে রাখা যায় না। ঝিনুক জোরে কান মুলে দিয়েছিল ছেলে দুটোর। তার জন্য একজনের বাবা স্কুলে ছুটে এসেছে! আর সেই গার্জেনের সামনেই কৈফিয়ৎ চাইছে সুনীতা আন্টি!

ঝিনুক ক্ষুব্ধ স্বরে বলল,—বাচ্চারা দুরন্তপনা করলে একটু শাসন করতে হয়। সেই অছিলায় স্কুলে আসবে না এ তো ঠিক কথা নয়!

ভদ্রলোক ঝিনুকের দিকে তাকাল না। সুনীতাকে বলল,—আমার ছেলে বলছিল উনি নাকি বলেছেন, তুমি ভীষণ গুণ্ডা হয়ে গেছ। তোমার মত গুণ্ডাদের আমি শায়েস্তা করতে জানি।

ভদ্রলোকের বাচনভঙ্গিও যথেষ্ট অমার্জিত। ঝিনুকের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল,—বলেছি। কি হয়েছে তাতে?

এবারও ভদ্রলোক সুনীতাকে উত্তর দিল,—আরও অনেক আন্টি তো বকাঝকা করেন, আমাকে কখনও ইন্টারফিয়ারেন্স করতে দেখেছেন? এমনিতেই এখন বাচ্চারা ওনাকে একটু বেশি ভয় পায়। বিশেষ করে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের ইন্সিডেন্সটার পর।

রাগবে না হাসবে ভেবে পেল না ঝিনুক।

সুনীতা ভদ্রলোককে বলল,—ঠিক আছে, আপনার কথা তো শুনলাম। কাল থেকে ছেলেকে পাঠিয়ে দিন। আমার মনে হয় না আর কোনও প্রবলেম হবে।

—না হলেই মঙ্গল। আমি উঠি। পার্কে ছেলেরা গিনিপিগ খরগোশের গার্ডেন করেছে। ওপেনিং করতে হবে। ভদ্রলোক চেয়ার ছাড়ল,—ছেলের আমার বড্ড প্রেস্টিজে লেগে গেছে। ভয় দেখানো ও একদম টলারেন্স করতে পারে না।

ঝিনুকের মুখচোখ লাল। সুনীতা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে,—শুনলি গার্জেনের কমপ্লেন?

—আপনি...আপনি...আপনি ওই সিলি কমপ্লেনটা এনটারটেন করলেন! একটা অশিক্ষিত অভদ্র লোক...!

—মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ শ্রবণা। আমাদের কাছে গার্জেনস আর গার্জেনস। ভদ্র অভদ্র বলে কিছু নেই। ভদ্রলোক কে জানিস? করপোরেশনের কাউন্সিলার। দরকার অদরকারে আমাদের কাজে

লাগে। সুনীতা ডেস্ক ক্যালেন্ডারে চোখ রাখল, —কমপ্লেনটা আমি ধরছি না। বাট আই মাস্ট সে, তোর কথাবার্তা অ্যাটিচিউড রিসেন্টলি কেমন বদলে গেছে। তুই তো আগে এত রুক্ষ ছিলি না! এত অ্যাগ্রেসিভ!

—আমি অ্যাগ্রেসিভ!

—অ্যাগ্রেসিভ মানে কমনীয়তার অভাব। বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য কেন মেয়েদের প্রেফার করা হয় জানিস? বাচ্চারা যাতে একটা কোমল স্নেহের সান্নিধ্যে বড় হয়ে উঠতে পারে। টিচারদের মধ্যে তারা মাকে দেখতে চায়। আই মিন মায়ের মত একজনকে। টেন্ডার। অ্যাফেকশনেট।

ঝিনুক তো একই ঝিনুক আছে! হঠাৎ এ কথা কেন!

সুনীতা মাথা দোলালো,—মিস্টার সেনগুপ্ত বলছিলেন বাচ্চাদের হ্যান্ডল করা খুব ডেলিকেট কাজ।

রাক্ষুসে খিদে হাতুড়ি মারছে মাথায়। ঝিনুক নিজেকে যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রাখতে চাইল,—কমপ্লেনটা নিয়ে মিস্টার সেনগুপ্তর সঙ্গে আপনার কথা হয়ে গেছে!

সূক্ষ্ম বিদ্রূপ গায়ে মাখল না সুনীতা,—না এটা নিয়ে কথা হয়নি। উনি জেনারেল ভাবেই বলছিলেন। প্রেজেন্ট-জেনারেশন বাচ্চাদের সামলাতে গেলে অনেক কৌশলী হয়ে উঠতে হবে। ফিফটিনথ অগাস্ট তোকে ওভেশান দেওয়া হচ্ছে, সেদিনই উনি এ ব্যাপারে টিচারদের একটা গাইডলাইন দেবেন।

স্টাফরুমে ফিরেও ঝিনুকের ব্রহ্মতালু জ্বলছিল। সঙ্গে খিদের অসহ্য মোচড়। টিফিনবাক্স খুলে ঝিনুক কচকচ করে পাঁউরুটি চিবোতে শুরু করল। সেদ্ধ ডিমের খোলা টেবিলে ঠুকে ঠুকে ভাঙল। ছাড়ানো ডিমে কামড় দিয়েই কটমট করে তাকাল ডিমের দিকে। পোলট্রি। ফ্যাটফেটে সাদা কুসুম। গোবিন্দর মা জানে ঝিনুক পোলট্রির ডিম খায় না তবুও...। মুখের ডিম পিছনের জানলা দিয়ে থু থু করে ফেলে এসে আবার কামড় দিয়েছে নেতানো মাখন-পাঁউরুটিতে।

ঘরের অপর প্রান্তে উচ্চকিত জটলা চলছে। মাধুরী ছুটিতে রয়েছে কদিন। গীতালি ঝিনুককে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল,—তোর মুখটা এরকম লাগছে কেন রে? ওই লোকটা কী বলতে এসেছিল?

—কাউন্সিলারটা! ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, গীতালি চোখ পাকিয়ে থামিয়েছে তাকে,—আস্তে। এ ঘরের টেবিল বেঞ্চেরও কান

আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। সুনীতার অনেক গোপন গোয়েন্দা এ ঘরে কান খাড়া করে থাকে। গ্লাস-ভর্তি জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল ঝিনুক।

গীতালি ঝিনুকের কানের কাছে মুখ আনল,—এখন কাউন্সিলার হয়েছে। আগে তো মস্তানি করত। এই বাজারে ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে নেতা হয়েছেন। খটাশ থেকে ব্যানার্জিদা। ওর লোক তো এখনও মার্কেটে মার্কেটে তোলা তুলে বেড়ায়।

সুনীতা আন্টির ডেকে পাঠানোর কারণ পরিষ্কার হচ্ছে এতক্ষণে। কাজ না হাতি! ভয়। স্রেফ ভয়। স্কুলটাকে তো চালাতে হবে।

ঝিনুকের মুখে সব শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গীতালি,—যাক, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। তবে তোকেও একটা কথা বলি শ্রবণা, তুইও বড্ড ডোন্ট কেয়ার টাইপের হয়ে গেছিস। চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি বেড়েছে তোর।

ঝিনুক ঝট করে একটা বাবলগাম ছিঁড়ল,—কেন আন্টি? আমি কী করেছি?

—কদিন আগেও একটা গার্জেনের সঙ্গে তুই মিসবিহেভ করেছিস। সুনীতাদি জানে না। আমি জানতে দিইনি।

ঝিনুক পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘষল,—আমি মিসবিহেভ করিনি। বাচ্চাটার পকেটে একটা একশ টাকার নোট পাওয়া গিয়েছিল, আমি তার মাকে ডেকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম।

—আমি জানি।

—সবটা আপনি জানেন না আন্টি। ওই ভদ্রমহিলা উল্টে আমাকে কথা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, আমার ছেলের পকেটে পাঁচ টাকা থাকবে কি পাঁচশ টাকা সেটা দেখাও কি আপনাদের বিজনেস? আমি শেষে বাধ্য হয়ে বলেছিলাম এটা স্কুল, আপনার টাকা দেখানোর জায়গা নয়। অনুগ্রহ করে পকেটে টাকা গুঁজে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবেন না। এটাই আমাদের স্কুলের ডেকোরাম। আমি কি অন্যায় করেছি, আন্টি?

—অন্যায় তো বলিনি। গীতালি অসহিষ্ণু হল,—ভদ্রমহিলাও আমার কাছে অনেক দুঃখ করে গেছেন। তোর কথা বলার টোনটা ভাল ছিল না। তোকে তো ছোট থেকে দেখছি, এখনও লক্ষ করছি। তোর মধ্যে এখন যেন সব ব্যাপারেই বেশি যুক্তি যুক্তি ভাব। একটু বেশি তর্ক করার প্রবণতা। আমি তোকে ঠিক বোঝাতে

পারছি না শ্রবণা। কেমন যেন রাফ...পুরুষালি পুরুষালি হয়ে গেছিস।

চকিত আক্রমণে ঝিনুক হতবাক। আঘাতটা যে ঠিক কোথায়! অসংখ্য কাচের গুড়ো রক্তের সঙ্গে মিশে বনবন চক্কর খেয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ড ফুসফুস সব বিষিয়ে এল।

সকাল থেকে আকাশ আজ আস্তাকুঁড়ের মতো ময়লা। ট্রামডিপো থেকে মন্থর পায়ে হাঁটছিল ঝিনুক। ডানদিকে স্টুডিওর গেটে বড়সড় এক জটলা। কেউ একজন মারা গেছে। লরিতে তাঁর শবদেহ। এক তরুণী চিত্রাভিনেত্রী গগলসে চোখ ঢেকে মালা দিচ্ছে মৃতদেহে। নায়িকাকে দেখার জন্য বাইরে রীতিমত ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। যিনি মারা গেছেন তাঁকে নিয়ে কণামাত্র কৌতূহল নেই জনতার।

অন্য দিন সিঁড়িতে ওঠার আগে একতলার ল্যান্ডিং-এ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় ঝিনুক। নিজেদের লেটারবক্স নিয়মমাফিক খুলে দেখে একবার। আজ এতটুকু আগ্রহ বোধ করল না। ফ্ল্যাটে ফিরেও নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সারল। তারপর শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

মেয়ের গুমোট মুখ চোখে পড়েছে সুজাতার,—কি হয়েছে রে তোর?

—এমনিই। ভাল লাগছে না।

—নীলাঞ্জনা এসেছিল সকালে। তোকে নেমন্তন্ন করে গেছে। সুজাতা টেবিলে রাখা হলুদ-ছোঁওয়ানো কার্ড ঝিনুকের হাতে দিল।

ঝিনুক ভাঁজ খুলে পড়ল কার্ডটা। আঠাশে শ্রাবণ। তেরোই অগাস্ট। মানে সামনের শুক্রবারের পরের শুক্রবার। খামের ভিতরে আলাদা চিরকুটে তূণীরকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে নীলাঞ্জনা।

—তুই কি শেষ পর্যন্ত থানাতেই গিয়েছিলি?

পালকির ছাঁদে কাটা বাহারী কার্ডটাকে উল্টেপাল্টে দেখছিল ঝিনুক। মায়ের প্রশ্ন পুরোপুরি তার মগজে যায়নি। অন্যমনস্ক মুখে বলল,—থানায় কেন?

—সকালে বলছিলি না থানায় যেতে পারিস! ফোনের কথাটা জানাতে!

—একবার বলেছিলাম বলেই দৌড়ব? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? কি না কি একটা কল আসছে, রঙ নাম্বার না টেলিফোনের গণ্ডগোল তার ঠিক নেই। অত ভয় থাকলে রাত্তিরে শোওয়ার সময় রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুমিয়ো।

সুজাতা আশ্বস্ত হল কিনা বোঝা গেল না, গজগজ করে উঠল,

—তাও ভাল। সুমতি হয়েছে। থানায় ছোটনি। যা হেক্কড় হয়েছ এখন! ব্যাটাছেলের বাপ। ইচ্ছে হল দুদ্দাড় থানায় চলে গেলে। ইচ্ছে হল কোর্টে গিয়ে গুণ্ডাবদমাশদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে। মেয়েলিত্ব কিছু আর আছে তোমার!...

সুজাতার কথার মালগাড়ি চলছে তো চলছেই। বন্ধ ঘরে পাখার হাওয়া গরম ক্রমশ। ঝিনুক দাঁতে দাঁত চাপল। মা'র কথার প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি হচ্ছে না তার। কিন্তু কথাগুলো তাকে দংশন করে চলেছেই। শ্রবণা, তুমি বড় পুরুষালি হয়ে যাচ্ছ! শ্রবণা তুমি রুক্ষ! শ্রবণা তুমি অ্যাগ্রেসিভ! ব্যাটাছেলের বাপ! এতটুকু মেয়েলিত্ব নেই তোমার!

ঝিনুকের বুকে ধস নামল।

পাথরচাপা বুকে দিন কাটছে ঝিনুকের। এক দিন। দু দিন। তিন দিন। স্কুলে যায়। আসে। বাকি সময় ঠায় বাড়িতে। লক্ষ বার ড্রেসিংটেবিলের সামনে, বাথরুমের আয়নায়, স্কুলের টয়লেটের ছোপ ছোপ দর্পণে নিজেকে দেখেছে ঝিনুক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আঁতিপাতি করে। সত্যিই কি সে বদলে গেছে? মন তো আগে ছাপ ফেলে মুখে। কই তার শারীরিক লাবণ্য তো বিন্দুমাত্র টসকায়নি! তবে কি এই পরিবর্তন আরও নিগূঢ় কিছু! পুরুষালি বলতে কী বোঝে মানুষজন? মেয়েলিত্বই বা বলে কাকে? আত্মবিশ্বাসহীনতাকে? প্রশ্নহীন আনুগত্যকে? নাকি ঝিনুক একই আছে, একটা ব্যতিক্রমী কাজ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নিজের গণ্ডী থেকে?

তূণীরটারও কদিন ধরে দেখা নেই। ঝিনুক অফিসে ফোন করেছিল, তূণীর খুনখারাপি রকমের ব্যস্ত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কোম্পানির চেয়ারম্যান মিস্টার জোনস্ এসেছেন। তূণীর এখন যম এলেও ফিরিয়ে দেবে। ইঁদুর দৌড়! এই মরিয়া সময়ে সেকেন্ডের জন্য পায়ের পেশী কেঁপে গেলে ট্র্যাক থেকে ছিটকে যেতে হবে তূণীরকে।

উইক এন্ডে ছোটন বাড়িতে আসার পর ঝিনুক কিছুটা ধাতে ফিরল। ছোটন অনর্গল খুনসুটি করে যাচ্ছে, সুযোগ পেলেই টাকার জন্য হাত লম্বা করে দিচ্ছে দিদির কাছে। সদ্য সিগারেটে দীক্ষা হয়েছে তার। নেশার পয়সা জোগাতে দিদিই তার প্রধান বলভরসা। ঝিনুক কাঁইমাই করে, রেগে যায়, আবার দেয়ও। খুশি মনেই দেয়।

রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল ঝিনুক। নীলাঞ্জনার বিয়ের উপহার কিনতে হবে; একবার বিশাখার বাড়ি

যাওয়া দরকার। কলেজ থেকেই এসব কেনাকাটার দায়িত্ব বিশাখার ওপর ছেড়ে রেখেছে বন্ধুরা। বিশাখাকে চাঁদাটা দিয়ে দিতে পারলে ঝিনুক ঝাড়া হাত-পা।

দিনটা আজ বেশ সুন্দর। ফিনফিনে মেঘের চাদর জড়িয়ে সূর্য বিশ্রাম নিচ্ছে। হুশহাশ হাওয়া। গরম নেই।

বিশাখার ছোট্ট ঘর জুড়ে গাদা গাদা কাগজ ছড়ানো। কাগজের স্তূপে উপুড় হয়ে চলন্ত টেপরেকর্ডারে ডুবে আছে বিশাখা। গভীর মনোযোগে কি এক বিটকেল ক্যাসেট শুনছে। ঝিনুক কথা শুরুর উপক্রম করতেই বিশাখা তাকে চোখের ইশারায় চুপ করে বসতে বলল।

ঝিনুক কয়েক সেকেন্ড মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করল ক্যাসেটটা। চিংড়িমাছ, পরিবেশ দূষণ, আবহাওয়া নিয়ে ইংরিজিতে কাঠখোট্টা আলোচনা চলছে। ঝিনুক টেপ অফ করে দিল।

—ইসস, গুলিয়ে দিলি তো! আবার গোড়া থেকে শুনতে হবে।

ঝিনুক ঠোঁট ফোলালো,—তুই কি আমাকে বোর করার প্ল্যান করেছিস?

ঢাউস কাফতান পরা বিশাখা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে,—ট্র্যান্সক্রিপশনের কাজ। উফ, যা বোরিং।

—কি বকবক করছিল রে লোকগুলো?

—চিল্কায় চিংড়ি চাষ নিয়ে গ্রুপ ডিসকাশান।

—চিংড়িতে তোর কবে থেকে ইন্টারেস্ট হল?

—চিংড়ি নয়, আমার ইন্টারেস্ট রোকড়ায়। মানি। সুইট মানি। পার্টটাইম জব। যা উপরি আসে। লাস্ট উইকে ট্রাক ট্রায়ারের ওপর কাজ করলাম। বল তো দেখি টায়ারের গুটি কাকে বলে?

ঝিনুক একটুও উৎসাহ পেল না।

বিশাখা বলল,—নারে, মালকড়ি ভাল দেয়। পার টপিক আড়াইশো টাকা। কাজ শুধু ডেটা কমপাইল করা। মৈনাকও করছে।

—মৈনাকটার চাকরির কিছু হল?

—কই আর! এসব করেই খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে কাগজের পাতায় একটা ফিচার লিখল। আবার বোধহয় একটা উইকলিতে অ্যাসাইনমেন্ট পাচ্ছে।

—তোরা এবার একটা কিছু সেটল কর। মাসিমা খুব টেনশানে

থাকেন।

—দাঁড়া। আগে পায়ের তলায় ও একটু মাটি পাক।

—তুই তো চাকরি করছিস ? তাতে দুজনের সংসার চলবে না ?

—তা হয়ত টেনেটুনে চলবে। বিশাখা শ্যাম্পু করা চুল আলগা ঘাঁটল,—কিন্তু মৈনাকের ইগোটা সামলাব কি করে ? মুখে যতই প্রগতির ঝাণ্ডা ওড়াক, বউ-এর পয়সায় খেতে হবে এটা ও মানতে পারবে ?

বিশাখা ছড়ানো কাগজ গুছিয়ে এক জায়গায় করল। টেপরেকর্ডার থেকে ক্যাসেট বার করে বিছানার কোণে রেখেছে।

ঝিনুক ব্যাগ থেকে টাকা বার করল,—নীলাঞ্জনার জন্য কী কিনবি ঠিক করলি ?

—মিউজিকাল ক্লক। বাজলেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদের কথা মনে পড়বে নীলুর। বিশাখা টাকাটা চাপা দিয়ে রাখল,—এই, তুই নীলুকে কি বলেছিস রে ? তোকে তেড়ে গালাগাল দিয়ে গেল।

—বরাবরই তো দেয়। নতুন কি-করলাম ?

—বোস্টনের কাছে তোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তুই নাকি রিফিউজ করেছিস ? ট্রু ?

—ট্রু। কিন্তু সে তো বহুৎ দিন আগের কথা ! এখনও নীলু মনে রেখেছে ?

—নীলাঞ্জনা ঘোষ কোনও কথা ভোলে না। ও নাকি বোস্টনকে বলে রেখেছিল, এমন এক বন্ধুকে শো করবে যে নীলুর মত ললিতলবঙ্গলতা নয়। দরকার হলে সে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়ে যায়। ডাকাবুকো। মারকুট্টা। কাগজে ছবি বেরোয়।

—তো ?

—মারকুট্টা বন্ধুকে দেখাতে পারেনি বলে নীলুর প্রেস্টিজে গ্যামাকসিন।

—অ্যাই, তুই বার বার আমাকে মারকুট্টা মারকুট্টা বলছিস কেন রে ?

—বারে, তুই মারপিট করিসনি ?

—লাফাঙ্গাদের বজ্জাতিতে বাধা দেওয়া আর মারপিট করে বেড়ানো দুটো কি এক ?

—ওয়াও। কী লজিক বস্। বিশাখা হেসে লুটিয়ে পড়ল। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে কপট ত্রাসে হাতের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে,—শ্রবণা, প্লিজ ওভাবে তাকাস না। আমার বুক কাঁপছে।

ঝিনুক হাসল না। নিষ্পলক দেখছে বিশাখাকে। বন্ধু!

—তুমি জানো না বস্, তোমার মধ্যে বেশ একটা ম্যাচো ব্যাপার ডেভেলাপ করেছে। জোরে জোরে বাতাস শুঁকল বিশাখা,—হুঁউউ, একটা মেল অ্যারোগেন্স-এর গন্ধ পাচ্ছি যেন? সোঁদা সোঁদা? ঝাল ঝাল?

হাওয়ায় কে যেন বেহালার ছড় টেনে দিয়ে চলে গেছে। মোড়ায় পড়ে থাকা একটা মেয়েদের ম্যাগাজিন তুলে দু-চার পাতা ওল্টালো ঝিনুক। বাইরের মেঘলা আকাশ নতুন করে মনে ঢুকে পড়ছে। ঘরের ভিতর ছড়িয়ে গেল শ্রাবণ মাস।

বিশাখা লক্ষই করল না ঝিনুককে,—আর একটা টপিক আসছে আমার হাতে। আসবি? একসঙ্গে কাজ করা যাবে? তোরও ভাল লাগবে টপিকটা।

ম্যাগাজিনের একটা ছবিতে ঝিনুকের চোখ গেঁথে আছে। ছবি নয়, সোয়েটারের নকশা। ছেলেদের। নেভি ব্লু মেরুন আর সর্ষে-হলুদের কম্বিনেশান। তূণীরের ছিপছিপে ফিগারে ডিজাইনটা দারুণ মানাবে। ছবি থেকে সোয়েটারপরা তূণীরের ঘ্রাণ ভেসে এল যেন। তূণীর কী করছে এখন? ঠিক এই সঘন মুহূর্তে? ছবিতে চোখ রেখেই মেঘমগ্ন ঝিনুক প্রশ্ন করল,—কি টপিক?

—হ্যারাসমেন্ট অফ ওয়ার্কিং উইমেন ইন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। ভাল না টপিকটা?

—ভালই তো। মন্দ কি। ঝিনুক ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে রাখল।

—আসছিস তা হলে?

—না।

বাবলগাম টাগরায় আটকে নিল ঝিনুক।

—এসেই উঠছিস যে? তূণীরের সঙ্গে প্রোগ্রাম?

ঝিনুক গলার কাছে জমাট নিশ্বাসটাকে গিলে নিল। তূণীর এখন সিঁড়ি খুঁজছে। খুঁজুক। ক্রমশ নির্বান্ধব হয়ে উঠছে এই পৃথিবী। নিঃসঙ্গ। নির্জন। কোথায় যে এখন যায় ঝিনুক!

এগারো

শান্তি পারাবারের কাছে এসে মনটা থিতিয়ে এল ঝিনুকের।

পুরনো আমলের পাঁচিলঘেরা দোতলা বৃদ্ধাশ্রম। গেটের পাশে এক ফালি জমি। পাঁচিলের গায়ে এক বিশাল আমগাছ। নিষ্ফলা।

ঝাঁকড়া। এত ঝাঁকড়া যে দোতলার বারান্দা থেকে পশ্চিমের ছুটন্ত পৃথিবী প্রায় অদৃশ্য। সামনের বড় রাস্তা বেয়ে বিরামহীন গাড়িঘোড়ার আনাগোনা। সকাল থেকে রাত, দৃশ্য নেই, শুধু শব্দ আর শব্দ। ওই শব্দই যা ভিতরের নিশ্চল পৃথিবীর সঙ্গে বাইরের টগবগে দুনিয়ার একমাত্র যোগসূত্র।

মৃণালিনী দোতলার বারান্দায় বসেছিলেন। রোজ বিকেলেই যেমন থাকেন। ঝিনুককে হঠাৎ দেখে তাঁর মুখে শঙ্কা টলমল,—তুই আজ যে বড় ? বাড়ির খবর ভাল তো ? রুমকি ? পিসিরা ?

—বাবারে বাবা, সব্বাই ভাল। ঝিনুক হাত তুলে বরাভয় দিল, —তোমার মেয়ে আলিপুরদুয়ারের ফ্লাডে কদিন একটু সাঁতার কাটছিল, এখন ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান। বাবুয়া সরেজমিন করে পরশু ফিরেছে। আজ আমাদের বাড়ি আসবে। হোলনাইট ছোটনের সঙ্গে ওর আজ ভিডিও দেখার প্রোগ্রাম। অনন্ত নাচগান। আর ইলিশমাছ।

সময়ের আঁকিবুকি-কাটা মৃণালিনীর শুভ্র মুখে হাসি ফুটল। ফুটেই আছে শুধু। এই হাসিটুকু ঠিক যেন অন্তরের নয়। খুশি দেখাতে হাসি ধরে রাখতে হয়, তাই বুঝি ঠোঁটদুটো অল্প ছড়ানো। তাঁর ছেলে, ছেলের বউরা যাও বা নিয়মমাফিক দর্শন দেয় কখনও সখনও, ছোটন বাবুয়া তো একেবারেই না। আষাঢ় মাসে তাও একবার ছোটনকে চোখের দেখা দেখেছিলেন। বাবুয়াটাকে যে কত দিন দেখেননি ! যেভাবে চোখের জ্যোতি কমে আসছে দিন দিন, এরপর হয়ত দেখেও আর চিনতে পারবেন না !

আরও জনা কয়েক বৃদ্ধা পশ্চিমের বারান্দায় বসে আছেন। নিঝুম। তাঁদের পায়ের কাছে জোব্বাজড়ানো সূর্যের ম্লান রশ্মিমালা।

ঝিনুক একটা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে হাসল, —হাঁটুর ব্যথাটা কমেছে ?

চেয়ারে প্রাণসঞ্চার হল,—নারে ভাই, নাটুর ছেলে এ হপ্তাতেও এল না।

—দূর থেকে কমিউনিকেশান হবে না ম্যাডাম। প্রভা-মা'র কান একেবারেই গেছে। ডায়ালটোন নেই। রিসিভার ডেড্।

পুরুষকণ্ঠ শুনে ঝিনুক চমকে তাকাল। শরৎ। মেঘ ছিঁড়ে এল নাকি ! নাকি উদোবুধোর মত মাটি ফুঁড়ে !

—আপনি রোব্বারে ? আপনারতো আজ ডেট নয় ?

শরৎ ঘোষাল যেন আরও বেশি অবাক,—আপনি রোব্বারে ?

আপনার তো আজ ডেট নয় ?

দুজনে একসঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠেছে। শব্দের স্পন্দনে সব কটা চেয়ার যেন নড়েচড়ে উঠল। তারপর আবার নিথর।

মৃণালিনী ঝিনুককে বারান্দায় বসিয়ে কি একটা কাজ সারতে নিজের ঘরে গেছেন, ঝিনুক শরতের সঙ্গে গল্প করছিল। গত দেড়-দু মাসে শরৎ ঘোষালের সঙ্গে তার আলাপ বেশ জমে উঠেছে। শরৎ আইনকানুনের নানান প্যাঁচপয়জার শিখিয়েছে ঝিনুককে। শরৎ সম্পর্কে ঝিনুক জেনেছে অনেক কিছু। কোর্টের চাকরিতে আসার আগে স্কুলমাস্টারি করত লোকটা। উস্থির কাছে রামরামপুরে একাই থাকে। বই পড়ে পড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। কোর্টের চাকরিতে তেমন আঠা নেই। তবে পছন্দসই কেস পেলে জান লড়িয়ে দেয়।

ঝিনুক জিজ্ঞাসা করল,—আপনার আশ্রম খোলার কদ্দুর ?

শরৎ বলল,—সর্বনাশ ! ফাঁস হয়ে গেছে প্ল্যানটা ?

—ঠাম্মাদের কাছে এসে এসে আপনারও দেখছি ঠাম্মাদের দশা। সঙ্গদোষে স্মৃতিলোপ। ঝিনুক ভ্রূকুটি হানল,—আপনি নিজেই আমাকে বলেছেন। ঠিক ওই চেয়ারে বসে। আজ থেকে ধরুন গিয়ে দিন বারো আগে।

—বলেছিলাম বুঝি ? তা হলে আপনার নামও যোগ হল।

—কিসে ?

—ডোনেশান লিস্টে। মৃণাল-মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যাদের যাদের প্ল্যানটার কথা বলব তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ডোনেশান নিতে হবে।

ঝিনুক ভুরু কুঁচকে তাকাল।

শরৎ হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে চলেছে,—ল্যান্ড একটু আছে ঠিকই, কিন্তু শুধু জমিতে তো আর আশ্রম হয় না। নিদেনপক্ষে চালাঘর চাই। গ্রামে পাকাবাড়ি না হলেও চলবে। যারা ওখানে থাকবে, তাদের পাকা ঘরে ঘুমই আসবে না।

—ঠাম্মা কত দিচ্ছে ?

শরৎ যেন ঝিনুকের সুর ধরে ফেলল, —আপনি টাকা ডোনেশানের কথা ভাবলেন নাকি ? টাকা লোকে দেবে কোন ভরসায় ? আমিই বা কোন স্পর্ধায় নেব ? আপনারা খালি একটু শ্রম ডোনেট করবেন ব্যস। ঘরখেদানো মেয়েদের পাশে একটু দাঁড়ানো, দু-চারটে অনাথ বাচ্চার জন্য একটু দরদ, অল্পসল্প লেখাপড়া শেখানো...। কেতাবী নয়, পৃথিবীকে চিনতে শেখে এমন

গড়াশুনো। পারলে মেয়েদের সেলাই ফোঁড়াই। বিশ্বসংসারে কেউ যে ওদের পাশে নেই সেটা যেন ওরা ভুলতে পারে, এই আর কি।

মৃণালিনী চেয়ারে এসে বসলেন। স্বগতোক্তির মত বিনবিন করে চলেছেন,—যা সামান্য টাকা জমিয়েছিল, সব এখন এভাবে ওড়াবে।

—মোটেই মৃণাল-মা'র কথায় কান দেবেন না। উনি নিজে গিয়ে ওখানে থাকবেন বলেছেন। মেয়েদের হাতের কাজ শেখাবেন।

—শান্তিপারাবার ছেড়ে ঠাম্মা চলে যাবে! যাহ্!

মৃণালিনী নিরাসক্ত স্বরে বললেন,—এ ঘাটে তো অনেক দিন হল রে। বড় ভিড় বাড়ছে এখানে। দেখিস না, নিচের নোটিস বোর্ডে আজকাল ওয়েটিং লিস্টে নাম ঝোলে? যারা এখানে আছে তারাই সব ওয়েটিং লিস্টের প্যাসেঞ্জার, আবার এখানে আসার জন্যও ওয়েটিংলিস্ট! মজাটা ভাব।

ঝিনুক বলল,—আমার মজা লাগছে না। তুমি কেন চলে যাবে?

—দুর পাগলি। যাচ্ছি কোথায়? শেষ কদিন নয় আরেক ঘাটে নৌকো ভেড়ালাম।

ঝিনুকের মুখ আমসি। কোন এক অজগাঁয়ে চালচুলোহীন এক আধবুড়োর পাগলামিতে এই বয়সে মেতে উঠবে ঠাম্মা! তবে ঠাম্মা যদি মনঃস্থির করে থাকে তো যাবেই। ঝিনুক জানে।

শরৎ বলল,—এত ঘাবড়ে গেলেন কেন? এখন শুধু গোঁফে তেল মাখানোই চলছে। এঁচোড়ের দেখা নেই তো পাকা কাঁঠাল! তার চেয়ে বরং আপনার কেসের কথা ভাবুন। দিন তো ঘনিয়ে এল। শুনলাম, ওরা আরও বড় উকিল লাগাচ্ছে।

—জামিনের দিনও তো নামী উকিল ছিল!

—তিনি তো থাকছেনই। নতুন যিনি আসছেন, তাঁর কাছে ইনি চুনোপুঁটি। হোমরাচোমরা বাড়ির মামলা বলে কথা। রবীনদা বলছিল ডাক্তারটার নাম নাকি বছর তিনেক আগে শেরিফ হওয়ার জন্য উঠেছিল।

—হবে। অত খবর রাখি না।

—না রাখলে চলবে কেন? প্রতিপক্ষের শক্তির আন্দাজ না পেলে কোমর বাঁধবেন কি করে?

—আমি ঠিক আছি। শুধু রমিতা চৌধুরী যদি গুবলেট না করে, সুপ্রিম কোর্টের পয়লা নম্বর ল'ইয়ারও ওদের শ্রীঘরবাস আটকাতে পারবে না।

শিশুর মুখে বাঘ মারার গপ্পো শুনে বড়রা যেভাবে হেসে ওঠে,

শরৎ অবিকল সেভাবে হেসে উঠল। পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গিতে বলল,—ভাল। কনফিডেন্স্ উইনস্ হাফ দা ওয়ার। আমার হিসেব মতো রমিতা চৌধুরী পাল্টি খেলেও শুধু আপনার সাক্ষ্যের জোরে শাস্তি হতে পারে। তেমন কড়া না হলেও কিছুটা তো বটেই। তবে আরেকটা কথাও আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে। আত্মবিশ্বাস অর্ধেক যুদ্ধ হারিয়েও দেয়। জঙ্গল শান্ত থাকলে ভাববেন না জঙ্গল ফাঁকা। বাঘ ঘুমিয়েও থাকতে পারে। অথবা শিকারের প্ল্যান ভাঁজছে। ভুলবেন না ওদের নখ দাঁত অনেক বেশি হিংস্র। শান দেওয়া। একটা খবর জানেন? আপনার সেই ওসিটি বদলি হয়ে গেছে। ইন্ দা ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সার্ভিস।

—সে কি! উনি তো সবে মার্চে এসেছেন শুনেছিলাম!

—আরে বাবা, নবাবজাদাদের ধরে ফেলল, কোর্টে কড়া রিপোর্ট পাঠিয়ে দিল, পনেরো দিন হাজতে পুরে রাখল, তার খেসারত দিতে হবে না? অবশ্য রুটিন ট্রান্সফারও হতে পারে। পুলিশে এ রকম হয় মাঝে মাঝে।

ঝিনুকের পলকে মনে হল ভূতুড়ে কলটার কথা বলে শরৎকে। থাক্, শরৎ ঘোষাল শুনলে ভাববে ঝিনুক ভয় পেয়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে প্রশ্ন করল,—আচ্ছা আপনার সেই বউটার কী হল?...ওই দুটো বাচ্চাওয়ালা? খোরপোষ চাইতে গিয়েছিল? স্বামী পিটিয়েছে? কেসটার রায় বেরনোর কথা ছিল না?

—আর বলবেন না, সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। পরশু জাজমেন্ট বেরিয়েছে। এক বছর জেল হয়েছে লোকটার।

—বাহ্, এতো সুখবর।

—শুনে প্রথমটায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। শরৎ হাসছে মিটিমিটি,—ম্যাজিস্ট্রেটের ঘর থেকে বেরোতেই বউটার কী গালাগাল আমাকে। খোরপোষ দেয় না, বাচ্চাদের দেখে না, ওই তো বর! সেই বরকে নাকি আমিই জেল খাটাচ্ছি। পেটে অন্ন নেই, সিঁদুরের দোহাই পেড়ে কান্না!

একতলা থেকে একটা চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছিল। অনেকক্ষণ ধরেই। হঠাৎই আওয়াজ আরও উচ্চগ্রামে। শরৎ উঠে রেলিং-এর ধারে গেল।

মৃণালিনী বললেন,—অনুর গলা। এমন চেল্লায়! কে মাথায় ঢুকিয়েছে ওর ছেলেমেয়ের চিঠি নাকি নিচের অফিস মেরে দিচ্ছে। এমনিই দিন-মাসের বোধ ছিল না, এখন সময়ের বোধটাও গেছে।

আজ যে পোস্ট অফিস বন্ধ...

শরৎ ঘুরে তাকাল,—সত্যিই কি এ বাড়িতে রবি সোম মঙ্গল, সকাল সন্ধে, এ সবের কোন অর্থ আছে মৃণাল-মা ?

—আছে বইকি। মৃণালিনী হেসে ফেললেন,—এই দ্যাখ না, রোববার বিকেল শেষ হতে না হতেই গোটা দোতলা খালি। সব অফিসঘরে টিভির সামনে গিয়ে বসেছে। বিজ্ঞাপনও গিলবে।

শরতের কালো চোখ ঝিকমিক করে উঠল,—যাই বলুন মৃণাল-মা, টিভির বিজ্ঞাপন দেখলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আপনার মনে হয় না, পুরনো দিনগুলো আবার ফিসে আসছে ? অ্যাট লিস্ট ফেরার স্মেল্ আনছে ? বলেই দৌড় লাগিয়েছে শরৎ,—আজ চলি। সুশীলা-মা'র ঘরে একটা টুঁ মেরে স্ট্রেট বাড়ি।

বিকেল মরে গেছে। ঝিনুকের দৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে আমগাছে স্থির। নিষ্ফলা গাছের ডালে ডালে পাখিদের গৃহে ফেরার উল্লাস। শব্দটা কান পেতে শুনছে ঝিনুক। শুনতে শুনতে আচমকা মৃণালিনীর হাত চেপেছে,—তোমার কখনও একা লাগে না ঠাম্মা ?

মৃণালিনী ঝিনুকের হাত ধরেই উঠে দাঁড়ালেন, —ঘরে চল।

তিনটে খাট। তিনটে ছোট ছোট কাঠের টুল। প্রতিটি খাটের পাশে একটা বেঁটে আলমারি। আলমারির গা বেয়ে উঁচু করে সাজানো তোরঙ্গ। দেওয়ালের খাঁজে কাঠের র‍্যাকে আয়না। কাপড় ঝোলানোর আলাদা আলাদা দড়ি। ঠাকুরের আসন। সদ্য কলি-ফেরানো দেওয়ালে পেরেক গজালের জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঝুলছে তিন বাসিন্দার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি। স্বামীরাও। মালপত্রে ঠাসা ঘরে হাঁটাচলার জায়গা নেই।

মৃণালিনী ধূপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলে মিনিট পাঁচেক ধ্যানে বসা তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যাস। ঝিনুক জানে ঠাম্মার ঠাকুরদেবতায় তেমন আস্থা নেই, তবু ওই ধ্যানে বসা কেন ? হয়তো নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার জন্যই ! মূর্তিটা হয়ত উপলক্ষ !

ঝিনুক দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছিল। বেশিরভাগই রঙজ্বলা। ঝাপসা ঝাপসা। মৃণালিনীর ভাগের দেওয়ালে একটা বড় গ্রুপ ফটো। এই ছবিটা শুধু ঠাম্মার কাছেই আছে। ঠাম্মা দাদু মা বাবা কাকামণি কাকিমা আর ছোট্ট পাঁচ বছরের গালফোলা ঝিনুক। কাকার বিয়ের ঠিক পর-পরই তোলা। চারু-মার্কেটের বাড়ির বারান্দায়। সেই স্বপ্নে দেখা বারান্দা ! ওই ছবির সব চেহারা এখন বদলে গেছে।

মা অনেক ভারিক্কি, কাকিমা শীর্ণ। কাকামণির প্রাণবন্ত মুখটা একদম বুড়োটে। বাবার চেহারা প্রায় একই আছে তবু যেন ছবির মানুষটা বাবা নয়। সময়ের একই ব্যবধান একই ছবির মানুষদের কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বদলে দিয়েছে! সময়ের গতি যদি উল্টোদিকে বইয়ে দেওয়া যায়, তবে কি ছবির চেহারায় আর ফিরতে পারবে সকলে? ঝিনুকের গা শিরশির করে উঠল।

মৃণালিনীর ধ্যান ভেঙেছে,—অ্যাই, তুই চা খাবি?

—না। ঝিনুকের গলা কেন যে ধরে এল!—তুমি একটু আমার পাশে বোসো তো।

—খা না। তাহলে আমারও একটু নেশা করা হয়।

মৃণালিনী ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ঝিনুক বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পিছনের ঘর থেকে আলো পড়ে শুনশান বারান্দার একটা অংশ উজ্জ্বল। বাকিটা আবছায়ায় রহস্যময়।

মৃণালিনী দু কাপ চা নিয়ে ফিরলেন। এ বাড়ির প্রত্যেক সক্ষম বৃদ্ধাই নিজের কাজ নিজে করেন। রান্নাবান্না ঘরদোরের কাজেও যৌথভাবে হাত লাগান সকলে। রুগীর সেবাতেও। এ নিয়ম মৃণালিনীরই তৈরি করা।

বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসেছে দুজনে। ঝিনুক মৃণালিনীর কাঁধে মাথা রাখল। আহ্‌হ্‌। আবার সেই সুবাস। তূণীর ঝিনুকের এই ঠাম্মাকে দেখেনি। বেচারা!

ঝিনুক বলল,—তূণীর এর মধ্যে একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

—হুঁহ্‌। সে আর এসেছে! তুই নিশ্চয়ই তাকে ভয় দেখিয়েছিস! নিশ্চয়ই বলেছিস বুড়িটা খুব রাগী। দজ্জাল।

—তুমি আর রাগী দজ্জাল কোথায়। ঝিনুকের স্বরে প্রচ্ছন্ন বিষাদ,—ওই সব বিশেষণ তো লোকে আমাকেই দিচ্ছে আজকাল।

মৃণালিনী ঝিনুকের মাথায় হাত রাখলেন,—বালাই ষাট। আমার এত সুন্দর নাতনিকে কে এ কথা বলে, হ্যাঁ?

—সবাই বলছে। স্কুলে বলছে। বন্ধুরা বলছে। শুধু তাই নয়, বলছে আমার ভেতর নাকি ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলে ভাব এসেছে।

—তোর নিজের কি মনে হয়?

—জানি না। আমি কি বদলে গেছি ঠাম্মা? নাকি সবাই ভুল বলছে?

—ভুল কেন বলবে ? মৃণালিনীর হাসি নিবে এল,—যতটা দেখতে পায় তাই দিয়েই বিচার করে। জলের মাছ যেমন জলের বাইরে মুখ তুললেও চতুর্দিক সম্পূর্ণ দেখতে পায় না, আমরাও সে রকম। আঁশের মতো সংস্কার লেগে আছে গায়ে। আর সংসার হল সেই জল, যেখানে আমরা মাছেদের মতো খেলে বেড়াই। রোজ যা দেখছি তার বাইরে কিছু দেখলে আমরা সেটাকে মানতেই পারি না। গণ্ডারের মত তেড়ে যাই। নিজেদের সংস্কার দিয়ে দেগে দিয়ে বলি, এটাকে বলে পুরুষালি, এটাকে বলে মেয়েলি। জোয়ান অফ আর্কের গল্প পড়িসনি ? যাদের জন্য লড়াই করল, তারাই তাকে পুড়িয়ে মারল !

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। চিনচিনে জমাট কষ্টটা কমছে আস্তে আস্তে। ঝিনুক বলল,—আমি তো জোয়ান অফ আর্ক নই ঠাম্মা। আমি একটা অতি সাধারণ মেয়ে। আমার মা বলে আমি ব্যাটাছেলের বাপ, বাবা তো চায়ই না আমি নিজের ইচ্ছেমতো এগিয়ে যাই।

—বাবা মা কি ছেলেমেয়ের জীবন ঠিক করে দেওয়ার মালিক ? তারা একটা দূরত্ব অবধি বড় জোর রাস্তা দেখাতে পারে। প্রত্যেকের নিজের জীবন বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। মৃণালিনীর গলা কর্কশ শোনাল,—আমার ছেলেরা তাদের মতো হয়েছে তাদের নিজেদের ইচ্ছেয়। আর তুই মেয়ে বলেই যেটা তুই ঠিক ভাবিস, সেটা করার তোর জোর থাকবে না ? মনে রাখবি তুই যা, তুই ঠিক তাই। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকাটাই সব।

—তুমি ঠাম্মা নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে পেরেছ চিরদিন ?

—উহুঁ, পারলে কি আর আমার সন্তানরা একই গণ্ডীতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত ? আমার ভেতরেও নিশ্চয়ই প্রচুর ফাঁক ছিল।

ঝিনুক চুপ করে রইল। জীবজগতের সব্বাই নিজের তৈরি গর্তেই সেঁধিয়ে থাকতে চায়। কজন আর বেরোতে পারে !

মৃণালিনী নাতনিকে কাছে টানলেন,—তোর তূণীর কী বলে ? সে কী চায় ?

দমকা বাতাসে আমগাছের পাতাগুলো কেঁপে উঠল। আলো পড়ে সিক্ত পাতারা চিকচিক করছে এখান সেখানে।

ঝিনুক দু দিকে মাথা নাড়ল,—জানি না ঠাম্মা।

বারো

ভরদুপুরে দিনটা হঠাৎ হারিয়ে গেল তূণীরের। বেলা বারোটা নাগাদ ফ্যাক্স মেসেজ। ডিরেক্টর বোর্ডের এক মেম্বার কাল রাতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। ব্যাঙ্গালোরে। খবরটা আসার পর থেকেই অফিস জুড়ে চাপা ছুটির মেজাজ। ছোট্ট একটা কনডোলেন্স মিটিং সেরে যে যার ব্যাগ-ঝোলা গোছাতে শুরু করেছে। কিন্তু হায়! তূণীর এখন এই আলটপকা আসমান থেকে ঝরে পড়া হিসাবের বাইরের দিনটাকে নিয়ে কি যে করে! টেবিলে বেশ কিছু অ্যাকাউন্টসের কাজ জমে আছে। কাগজপত্র নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসলে হুশ করে পার হয়ে যেত দিনটা। তবে আজকের পক্ষে সেটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

নীলম টয়লেট থেকে কাচঘেরা কিউবিক্‌ল্‌-এ ফিরল। যে কোনও ছুটি পেলেই সে খুশিতে রঙিন হয়ে ওঠে। কাঁধের দোপাট্টা গোছাতে গোছাতে টেবিলের কিছু ফাইল-কাগজ ড্রয়ারে চালান করল নীলম। তারপর তূণীরের দিকে ঘুরেছে,—হাই তূণীর। আর কি? চলো কাটি।

নীলমের চকচকে বাদামি চোখে চোখ রাখল তূণীর,—কাটতে তো হবেই। কিন্তু যাই কোথায় বলো তো?

—যেখানে খুশি যাও। জাহান্নমে যাও। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ থেকে ঝাঁপ কাটো। ব্রিগেডে গড়াগড়ি খাও। ভিক্টোরিয়ায়... ভিক্টোরিয়ায়...। নীলম তুরন্ত বাংলা বললেও মাঝে মাঝে সঠিক শব্দ খুঁজে পায় না, তখন হাতের মুদ্রাই তার মনের ভাব। তার দু হাত নাড়া দেখে তূণীর বুঝতে পারল তাকে ভিক্টোরিয়ার মাথায় হামা টেনে উঠে যেতে বলছে নীলম।

তূণীর হেসে ফেলল,—দেন? চূড়োয় ওঠার পর?

—হ্যাভ ফান উইথ দ্যাট কালো পরী। কালো পরীই বা কেন! তোমার তো একটা পরী আছেই। ব্রেভ অ্যান্ড বিউটিফুল। রিঙ হার আপ।

তূণীরের মনেও সেরকমই একটা ইচ্ছা খেলছিল। নীলমের সামনে অবশ্য নিজেকে নিস্পৃহই রাখল,—সে নয় আমার একটা বন্দোবস্ত হতে পারে। তুমি কি করছ?

—সোজা জয়ের অফিসে গিয়ে টেনে বার করব ওকে। দেন মুভি টুভি এনিথিং। নন্দনে কী চলছে?

—নো আইডিয়া। কিন্তু ম্যাডাম, তোমার বর যদি না বেরোয় ?

—ঘাড় ধরে টেনে বার করব। না বললে টেংরি তোড় দুংগী উসকা। যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে ? তোমার গার্লফ্রেন্ডকেও ডাকো। গঙ্গার ধারে স্কুপে জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

—না থাক। টু ইজ কম্পানি ফোর ইজ র‍্যালি।

—বাত মত বনাও। শাদির এক বছর বাদ টু ইজ কম্পানি আর থাকে না ইয়ার। সচ বলো তোমারই গার্লফ্রেন্ডকে অকেলা পাওয়ার জন্য দিল হুম হুম করছে।

তূণীর কাঁধ ঝাঁকাল যার উত্তর হ্যাঁও হয়, নাও হয়।

—বাআই। নীলম টুকুস করে চোখ টিপে উড়ে যাচ্ছে। তূণীর প্যাট প্যাট করে নীলমের দোদুল্যমান নিতম্বের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড।

পাশের কিউবিক্‌ল্‌-এ সান্যাল হুটপাট করে টেবিল গোছাচ্ছে। বিয়ের পর থেকে অফিসে এক মিনিট বাড়তি সময় থাকতে রাজি নয় ছেলেটা। আগে তূণীর বললেই আটটা-নটা অবধি কাজ করত। এখন সারাক্ষণ বাহানা। গুলগাপ্পি।

নিজের মনে হাসল তূণীর। হাসি হাসি মুখেই ঝিনুকদের নম্বর ডায়াল করেছে। নরম গদিমোড়া চেয়ারে ছেড়ে দিয়েছে শরীরটাকে।

ও প্রান্তে ঝিনুকের মা।

—কে, তূণীর ? এ মা, ঝিনুক এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

—কোথায় গেছে জানেন ?

—সে কি আর আজকাল কাউকে বলে বেরোয় ! তার এখন লম্বা লম্বা পা ! শুধু বলে গেল বিকেলে ফিরবে। তোমার নাকি আজ সন্ধেবেলা আসার কথা ?

—হ্যাঁ, সেরকমই একটা কথা হয়েছিল।

—শুনেছ তো, ওর বন্ধু নীলাঞ্জনা পরশু বোস্টন চলে যাচ্ছে ? কী তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট ভিসা করে ফেলল ! বর নিয়ে কাল দেখা করতে এসেছিল। তা ঝিনুক নেই, আমার সঙ্গেই বসে বকবক করে গেল। বরটা যেন কেমন ! ক্যাবলা ক্যাবলা। কি করে যে ওদেশে গেল ! তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

সুজাতা টেলিফোনে কথা বলার সময় উত্তরের প্রত্যাশায় থাকে না। যত কথা আছে সব একসঙ্গে বলে ফেলবেই। পিকপিক করে এক্সচেঞ্জ থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে গেলেও। সে বলেই চলেছে,—এই

জানো তো, তোমার এনে দেওয়া অ্যাডেনিয়ামটায় কী সুন্দর লাল ফুল এসেছে। ঠিক লাল নয়, গোলাপি গোলাপি। তবে যাই বলো, গাছের তুলনায় ফুলগুলো বড্ড বড়। বেমানান লাগে। আর ওই এক মানুষ আছে ঝিনুকের বাবা, কিছু জানে না, বোঝে না, কোথায় কার কাছে শুনেছে অ্যাডেনিয়ামের ফুল নাকি টকটকে লাল হয়।

তূণীরের অসহ্য লাগছিল। চার পাঁচদিন দেখা না হলেই এত বেশি কথা জমে যায় ভদ্রমহিলার! সে প্রায় অভদ্রভাবে সুজাতাকে থামাতে চাইল,—ঠিক আছে গিয়ে শুনব। এখন রাখি।

—আরে আরে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড। তুমি আজ রাসেল স্ট্রিট থেকে একটা বার্ড অফ প্যারাডাইস এনে দেবে? ঝিনুক বলছে ওটা নাকি টবে হয় না, আমি করে দেখিয়ে দেব। আনবে?

—দেখি যদি পাই। তূণীর টুক করে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। ওফ্, কী বকবক! কী বকবক! সকাল থেকে দিনটা আজ যা যাচ্ছে! বাড়ি থেকে বেরোনর আগে দিদির সঙ্গে এক চোট হয়ে গেল। বিয়ে দিয়ে পার করা হয়েছে তোকে, থাক তুই বর বাচ্চা নিয়ে তোর সংসারে, তা নয় যখন তখন বাপের বাড়ি এসে হামলা! খবরদারি! মৌলালি থেকে রোজ একবার ছুটে আসছে ঢাকুরিয়ায়। মা, ওই হলুদ পর্দা আবার টাঙিয়েছ কেন? ঘরের রঙের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না। বাবা, তুমি মোগলাই খাচ্ছ যে? তোমার না কাল অম্বল হয়েছিল! ডিসগাস্টিং। তূণীরকে তো মোটে পাত্তাই দিতে চায় না তনিমা। মাত্র পাঁচ বছরের বড়, তাতেই যা কর্তারি! সকালে আজ কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এসে হম্বিতম্বি, বাবাকে নিয়ে বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাবি। ধর্মতলা স্ট্রিটে। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়ন্টমেন্ট করা আছে। ঠিক চারটেয়। নিজে উনি যাবেন জামাইবাবুর কোন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে, তূণীরকে ওঁর হুকুম তামিল করতে হবে! তূণীর যত বোঝায় বাবার তেমন কিস্যু হয়নি, চাকরি ফুরোবার আগে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক হলে সকলেই ও রকম একটু ভেঙে পড়ে। বাবার অসুখ শরীরে নয়, মনে। সাইকোসোম্যাটিক কেস। বিনা কারণে বুক ধড়ফড়। পান থেকে চুন খসলে নাগাড়ে ট্যাকট্যাক, ঝুপুৎ করে বুড়োটে মেরে যাওয়া, সবই সিমটম। আরে বাবা, পুরুষমানুষের কাছে চাকরি হল লাইফফোর্স। মেয়েরা তার বুঝবেটা কি! কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে মানুষটাকে। মেয়েদের মতো তো ঘরমোছা বাসনমাজা রান্নাবান্না নিয়ে সারাদিন পড়ে থাকতে পারবে না! মার মতো সরকারী চাকরিও করা নয়!

উলবোনা আর পরনিন্দা পরচর্চার চাকরি ! মেয়েদের সার্ভিস লাইফ আর ছেলেদের সার্ভিস লাইফে আকাশপাতাল তফাত। নীলম যে নীলম সেও তো ফাঁক পেলে মার্কেটিং-এর লিস্ট তৈরি করছে ! তূণীরের এ সব যুক্তি মানবে তার দিদি ! তা হলেই হয়েছে। সোজা বলে দিল,—কথার প্যাঁচ ছাড়। সংসারের কোনও দায়িত্ব নিতে চাস না সেটাই বল।

তারপরেই জোর ঝগড়া।

তূণীর বলল,—আমার সময় নেই। আমি তোমার মত ন মাস ছুটির চাকরি করি না। আমার অফিসে ডিসিপ্লিন আছে। হুট বললেই বেরিয়ে পড়া যায় না।

—হুঁহ, করিস তো যোগবিয়োগ আর খাতা লেখার কাজ। তার এত ফুটুনি কিসের রে ?

—তোর কলেজে পড়ানোর চাকরির থেকে অনেক বেশি রেসপন্সেবল কাজ। গোটা হেড অফিসের অ্যাকাউন্টস সামলায় এই শর্মা। বুঝলি ? আর আমি অফিসে কি করি না করি তাই নিয়ে তুই কথা বলার কে ? আমার টাইম নেই, আমি যেতে পারব না ব্যাস। তুই আমাকে জিজ্ঞেস করে অ্যাপয়ন্টমেন্ট করেছিস ? অন্যের বাড়ি এসে ফোঁপরদালালি করতে তোর লজ্জা করে না ?

—অন্যের বাড়ি মানে ? এটা আমারও বাড়ি।

—ভাগ। যদ্দিন বিয়ে হয়নি তদ্দিন তোর বাড়ি ছিল। এখন যা, বরের ঘর সামলাগে যা। বুবাই-এর পড়াশুনো দ্যাখ, বিজনদার শরীরস্বাস্থ্যের খবর রাখ, ভালমন্দ রান্নাবান্না কর আর মাঝে মাঝে কলেজ গিয়ে মাইনেটা তুলে নিয়ে আয়। তোদের প্রিন্সিপালের তো আবার মেয়ে দেখলেই নাল পড়ে। ক্লাস তো তোদের না নিলেও চলে। ফের যদি তুই এখানে এসে দালালি মারিস...

—কি করবি তুই অ্যাঁ ? অসভ্য কোথাকার। ঝিনুকের মত একটা সেন্সেটিভ মেয়ে কি করে যে তোকে স্ট্যান্ড করে !

পিত্তি জ্বালানো কথা ! মা মাঝখানে এসে না পড়লে হয়তো ছেলেবেলার মতো চুলোচুলিই হয়ে যেত আজ ! দিদিটা ভাবে কি ! ঝিনুক যে একটা সাহসী কাজ করে ফেলেছে তা কি তূণীর জানে না ! নাকি তূণীর কম আনন্দ পেয়েছে তাতে ! তূণীর মোটেই মধ্যযুগীয় বর্বর পুরুষ নয়। একটা মেয়ের কৃতিত্বকে সে মন খুলে হাততালি দিতে জানে। এ অফিসের সবাইকে সে গর্ব করে বলে বেড়ায়নি ওই শ্রবণা সরকার তারই নিজস্ব নারী ! শুধু তারই। ঝিনুকেরও

বলিহারি। তোর কি দরকার ছিল নাচতে নাচতে আমাদের বাড়িতে এসে স্কুলের মেডেল দেখানো! এমনিতেই তো গুণ্ডা দমন করে তোর দর হেভি হাই। আগে কানই পাতা যেত না, মাঝে কথাটা থিতিয়ে এসেছিল, আবার শুরু হয়ে গেল। প্রাইজ পেয়েছে; পেয়েছে। তাই নিয়ে তূণীরকে উঠতে বসতে খোঁচা মারা কেন? হুঁহু বাবা, যতই তূণীরকে খোঁচাও আর যতই ঝিনুককে গ্যাস দিয়ে বাচেন্দ্রী পাল করে তোলো, একটা কথা তো ভুললে চলবে না, বিছানাতে ঝিনুক তূণীরের নিচেই থাকবে।

তূণীর টানটান হল। বাড়ি থেকে বেরোতেই আরেক কিস্যা। আরেক দফা মাথা গরম। ভদ্রলোকের মতো লাইন দিয়ে শেয়ার ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়ে আছে, চোখের সামনে একটা ধুতিপরা মাঝবয়সী ভিজে বেড়াল বেলাইনে স্স্যাট করে উঠে বসলো ট্যাক্সিতে! তূণীরের জায়গাই বেদখল। তূণীরও ছাড়বে না, লোকটাও গ্যাঁট। একবার তূণীর টান মেরে দরজা খোলে, লোকটা ঘ্যাচাং করে বন্ধ করে দেয়। ব্যাটা ভিজে বেড়ালকে তূণীর টেনে নামাতই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা ভট করে বলে বসল,—দোর মসাই, ট্যাসকির গেট নিয়ে মাস্তানি মারছেন কেন? যান যান। পরের গাড়িতে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে হুক্কাহুয়া,—আরে ছাড়ুন না মোশাই। যেতে দিন। ফালতু ঝামেলা পাকিয়ে সবার লেট করাচ্ছেন কেন? পেছনে তো আরেকটা এসে গেছে, উঠে পড়ুন না। তূণীরকে ঘাড় নিচু করে পরের ট্যাক্সিতেই উঠতে হল। শালা। নেলসন অ্যান্ড বেরির অ্যাকাউন্টস এগজিকিইউটিভ, সাতাশ বছরের টগবগে সি এ তূণীর মজুমদার, বিলকুল হিন্দি ফিল্মের বোকা ভিলেন বনে গেল। অফিসেও সাত মিনিটের ওপর লেট। এত কিস্যা চটকে যে অফিসে আসা, সে অফিসও আজকের মত চৌপাট। শ্রীমতী বাচেন্দ্রী পালও বাড়ি থেকে ভ্যানিশ। কাঁহাতক ভাল লাগে!

তূণীর টেবিলের কম্পিউটারটার দিকে তাকাল। সব্জে পর্দায় আবছা ভেসে রয়েছে তার মুখ। মুখের পিছনে সার সার কিউবিক্‌ল্‌-এর ছায়া। খসখস টাঙানো কাচের জানলা। জানলার কোলে এয়ারকুলার। তূণীর যন্ত্রগণকের চোখ দিয়ে দেখছে চতুর্দিক। অফিস প্রায় ধু-ধু। মোলায়েম হিমেল সুখ অলসভাবে গড়াচ্ছে কাচের খোপে ভরা প্রকাণ্ড হলঘরে। এই পরিবেশে কাজ ছাড়া বসে থাকলে আপনাআপনি চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

...মিহি তন্দ্রায় গন্ধটা নাকে আসছিল তূণীরের। শালফুলের গন্ধ।

মিষ্টি। কিন্তু ঝাঁঝালো। ধোঁয়া ধোঁয়া বাতাসের আড়াল সরিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে পিচঢালা রাস্তা। কোটি কোটি সাদা শালফুলে আদিগন্ত বয়ে যাওয়া রাস্তার কালো রঙ নিশ্চিহ্নপ্রায়। রাস্তা ধরে চঞ্চল বালিকা হয়ে ছুটছে ঝিনুক। ছুটছে। ছুটছে আর শালফুল কুড়োচ্ছে। আঁচলভরা ঘ্রাণ নিয়ে তূণীরের সামনে এসে দাঁড়াল ঝিনুক। সুখের উত্তেজনায় তার নাকের পাটা কাঁপছে তিরতির। থুতনির খাঁজে, ছোট্ট চিবুকে, ঘন আঁখিপল্লবে বাষ্পবিন্দু। তূণীর ছুঁতে গেল ঝিনুককে। ঝিনুকের মুখমণ্ডলে এ কিসের কণা! স্বেদ! কামনা! নাকি শালফুলের রেণু! ঘন নীল আকাশ ছায়া ফেলেছে ঝিনুকের চোখের তারায়। ম্যাসানজোরের হ্রদ দুই মণিতে টিলটিল!

কে যেন শব্দ করে কেশে উঠল। ভেঙে দুমড়ে গোটা দৃশ্য খানখান। রাস্তা নেই। রাস্তার দু পাশের অনন্ত শালবন উবে গেছে। তূণীর চমকে চোখ খুলল। বুক ভরে জোর জোর নিশ্বাস টানল কয়েকবার। নাহ্, শালফুলের গন্ধও নেই। চারদিকে শুধু বিদেশি রুমস্প্রের রাসায়নিক সুবাস। আবার শ্বাস টানল। কলেজজীবনের দৃশ্যটা কেন আজ অফিসেও এসে হাঁটু গেড়ে বসল!

ছোট একটা আড়মোড়া ভেঙে টয়লেটে গেল তূণীর। মুখে ঘাড়ে জল দিল ভাল করে। এ বার! এ বার সে করেটা কী? তার খুব একটা নিজস্ব বন্ধুবান্ধব নেই। বড় জোর ডালহাউসি পাড়ার সৌম্য বা অনীশের অফিসে যাওয়া যেতে পারে। সে নিজে অফিসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে ভালবাসে না। গত সপ্তাহে সৌম্যর অনুরোধে দুপুরে রেস্তোঁরায় খেতে বেরোতে রাজি হয়নি। তার কি উচিত অন্যের অফিসে গিয়ে আসর জমানো?

অফিসের টয়লেটেও মনের চিন্তার প্রতিফলন মুখে পড়তে দেয় না তূণীর। তার সূক্ষ্ম ধারণা আছে হয়তো বা আয়নাটাও অদৃশ্য গোয়েন্দা হয়ে ম্যানেজমেন্টকে পৌঁছে দেবে তার প্রতি মুহূর্তের চিন্তার ডেটা। চার্লি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস-এর সেই টয়লেটের মতো। প্রসন্ন মুখভঙ্গি করে তূণীর আয়নার দিকে তাকাতে চাইল। ভঙ্গিটা ঠিক হল না যেন। ফর এ চেঞ্জ বাড়ি ফেরা মন্দ কি! দশ বিশ মিনিট গড়িয়ে বাবাকে ডাক্তারের কাছেই নয় নিয়ে গেল!

নিজের কিউবিকল-এ ফিরতে গিয়ে দাঁড়াতে হল তূণীরকে। বেয়ারা। ফিনান্স ম্যানেজার ডাক পাঠিয়েছে। আশ্চর্য! রজত রায় এখনও যায়নি!

তূণীরকে দেখে রজত হৈহৈ করে উঠল,—আরে মজুমদার এসো

এসো। কদিন ধরেই তোমায় একটু ফাঁকায় ধরব ভাবছিলম। আজ চান্স এসে গেল। বোসো।

তূণীর ভুরু তুলল,—এনি প্রবলেম স্যার? বালাসোরের অ্যাকাউন্টস-এর ঝামেলাটা তো মিটে গেছে।

—আই নো। রজত সিগারেট ধরিয়ে কিং সাইজ প্যাকেট এগিয়ে দিল তূণীরের দিকে,—ও সব কিছু না।

তূণীর বড় একটা সিগারেট খায় না, তবু ধরাল, —দেন?

—তাড়া কিসের? বোসো।

রজত তূণীরের চেয়ে বছর পনেরোর বড় হলেও তাদের সম্পর্ক বেশ খোলামেলা। এ অফিস পুরো আমেরিকান কায়দায় চলে। বয়স স্ট্যাটাস এ সব নিয়ে তেমন কোনও ছুঁৎমার্গ নেই।

রজত তরল গলায় বলল,—কফি চলবে?

তূণীর কাঁধ ঝাঁকাল।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে কফির অর্ডার দিল রজত। তারপর রিভলভিং চেয়ারে আয়েস করে বসেছে। দু হাতলে হাত বিছিয়ে। ঘরের বাতানুকূল যন্ত্র ঝিনঝিনে ঠাণ্ডা ছড়াচ্ছে। এমন উগ্র শীতল কক্ষেও রজতের জামার দু তিনটে বোতাম খোলা। একটু বেশি মদ্যপান করে বলে তার গরম বোধ বেশ চড়া।

ধীরে সুস্থে কথা শুরু করল রজত,—তোমার জন্য একটা খবর আছে। সিক্রেট। অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল।

তূণীরের শিরদাঁড়া সোজা হল।

রজত চোখ টিপল,—তোমার বেটার হাফ চলে গেছে? নীলম দি ইরোটিকা?

—অনেকক্ষণ। তূণীর হাসার চেষ্টা করল।

—তুমি লাকি আছ মজুমদার। ও রকম একটা ভলাপচুয়াস লেডির সঙ্গে ঘর শেয়ার করছ। অল মোস্ট টেন আওয়ারস আ ডে।

তূণীর রজতকে দেখছিল। রজত যথেষ্ট ঝানু লোক। তার ভারী মুখে সহজে কোন প্রতিক্রিয়া ফোটে না। হাসতে হাসতে বলছে,—জানো ও রকম একটা বেডপার্টনার পেয়েও ওর বরটা একটা অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরে?

এই কথা বলার জন্য ডেকেছে রজত? তূণীর অবাক হওয়ার ভান করল,—তাই নাকি! স্ট্রেঞ্জ!

রজতও দেখছে তূণীরকে। মাপছে। সে অবলীলায় মেয়েদের

নিয়ে অশ্লীল আলোচনা চালাতে পারে।

অন্য সময় হলে তূণীর মজা পায়। এক-আধটা রসিকতাও করে। আজ একটু অধৈর্য বোধ করছিল।

রজত হঠাৎই ভাবলেশহীন মুখে বলল,—সেই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা মনে আছে মজুমদার ?

তূণীরের হৃৎপিণ্ড দড়াম করে লাফিয়ে উঠেছে,—আছে।

—তোমার চান্সটা ব্রাইট হয়েছে। মিস্টার জোনস ওয়াজ অল প্রেইজ ফর ইউ। তোমাকে দেখে চোখে লেগে গেছে। কি হে, চান্স পেলে যাবে তো ?

অপ্রত্যাশিত আনন্দসংবাদে তূণীর বাক্যহারা। কলের পুতুলের মতো শুধু মাথা নেড়ে চলেছে।

—ক্যালিফোর্নিয়ায় তিন বছর ! হাউ ইজ দা আইডিয়া ম্যান ?

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল তূণীরের,—দ্যাটস মাই ড্রিম স্যার।

—প্রবলেম একটাই। রজত জামার আর একটা বোতাম খুলে দিল। তার নির্লোম বুকের অনেকটাই উদ্ভাসিত,—আচ্ছা মজুমদার, নীলম নাকি টয়লেটে বহুক্ষণ সময় কাটায় ? রিসেপশনের নীনা বলছিল ?

রজতের নারীদোষের কথাও এ অফিসের সবাই জানে। নীলম সম্পর্কে ইদানীং তার আগ্রহ খুব বেড়েছে। হয়তো পাত্তা পায় না বলেই।

তূণীর দায়সারা জবাব দিল,—আমি ঠিক নোটিস করিনি।

—দ্যাটস দা গুড থিং ইন ইউ। ওই জন্যই আমি তোমাকে বেশি পছন্দ করি। কুরুভিলার থেকেও। রজত কফিতে চুমুক দিল,—হ্যাঁ যা বলছিলাম। প্রবলেম হল, ডাইরেক্টার পারসোনেল কুরুভিলার কিরকম রিলেটিভ হয়। খুব ক্লোজ নয়, কিন্তু লতাপাতায় একটা ফ্যামিলি টাই আছে।

তূণীর নিবে গেল সামান্য। এ তথ্য তার জানা ছিল না।

রজত কলেপড়া ইঁদুর দেখে যেন মজা পেয়েছে,—আরে চিয়ার আপ। কুরুভিলা মেননকে খুব ধরেছে। বাট আই ডোন্ট থিংক হি ক্যান উইন। আমি আমার সমস্ত ওয়েট তোমার জন্য ফেলব। বিকজ কুরুভিলার থেকে তুমি অনেক বেশি সিনসিয়ার। যেতে হলে তুমিই যাবে।

—থ্যাংক ইউ স্যার। তূণীর নিজেকে যথাসম্ভব সামলে ধীরে

ধীরে কাপে চুমুক দিল। ভয়ে ভয়ে বলল,—আমি কি তবে বাড়িতে বলতে পারি, আই অ্যাম সিলেক্টেড ?

—বলবে বলবে গ্র্যাজুয়ালি ভাঙবে। রজত হেসে উঠল,—আমি যখন ফার্স্ট স্টেটসে যাই, ইন দা ইয়ার নাইনটিন সেভেনটি সিক্স, জানো, আমি আমার বউকে কী ভাবে সারপ্রাইজ দিয়েছিলাম ? তখন মাই বউ ওয়াজ মাই গার্লফ্রেন্ড। কি করেছিলাম জানো ? তিন বন্ধুকে সঙ্গে করে সোজা ওকে ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে হাজির করলাম। রুনা তো ঘাবড়ে একসা। বলে, বাবাকে বলে আসিনি, কি করে বিয়ে করব ! আমি স্ট্রেট চিঠিটা সামনে ফেলে দিলাম। যখন ওর ঘোর কাটল, তখন সই কমপ্লিট। রুনার অবশ্য পাসপোর্ট ভিসা পেতে একটু দেরি হয়েছিল। বাট দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েল হানিমুন। একটা নতুন দেশ... ডিসেম্বর মাস...ক্যালিফোর্নিয়ায় সারা দিন রাত স্নো ফল চলছে। বরফ পড়াটা যে কী রোমান্টিক ! শিমুল তুলোর মত...। ব্লু মুন...। বাই দা বাই, তুমি বিয়ে করছ কবে ? বলতে বলতে রজত আচম্বিতে উঠে দাঁড়িয়েছে,—এক মিনিট। আসছি। বলেই অ্যাটাচড্ টয়লেটে ঢুকে গেল।

তূণীরের চোখের সামনে ক্যালিফোর্নিয়া। কাচের ঘরে বসে তুষারপাত দেখছে তূণীর। গায়ের খুব খুব কাছে ঝিনুক। ঝিনুকের দুপুরাইটিস সেরে যাচ্ছে। শালফুলের গন্ধে ভরে গেল ক্যালিফোর্নিয়া।

প্যান্টের জিপার আটকাতে আটকাতে ফিরল রজত,—সুগারটা বোধহয় বেড়েছে মজুমদার। চেকআপ করাতে হবে।

তূণীর শুনতে পেল না।

রজত ঘুরনচেয়ারে বসে পাক খেয়ে নিল একটা,—তোমার গার্লফ্রেন্ডের কি যেন নাম ? আরে খুব ফেমাস নাম...নিউজ পেপারে বেরিয়েছিল...

তূণীর স্বপ্নের ঘোরেই উত্তর দিল,—শ্রবণা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রবণা। আচ্ছা শ্রবণা মানে কী মজুমদার ? এনিথিং রিলেটেড টু হিয়ারিং ?

তূণীর হেসে ফেলল,—না না। শ্রবণা একটা নক্ষত্রের নাম।

—তাই বুঝি ? ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম। সত্যিই শি ইজ এ স্টার। আমি বোধহয় তোমার সঙ্গে ওকে একদিন দেখেছি। নিউ এম্পায়ারের দোতলায়। ঠিক না ?

—আপনার মেমারি তো দারুণ স্যার ! কদ্দিন আগে দেখেছেন,

এখনও মনে আছে !

—কম্পিউটার মেমারি। ডিটেলড ডেসক্রিপশন দিতে পারি। ভেরি সুইট লেডি। চার্মিং। অ্যান্ড স্মার্ট অলসো। ডেয়ারিং। রজত হাসতে হাসতে আবার চোখ টিপল,—ফিগারটা ভাল। ইউ আর এ লাকি ডগ।

শেষ ইঙ্গিতটুকু ভাল লাগল না তূণীরের। তবু মুখে বলল, —থ্যাংক ইউ স্যার।

রজত ঝুঁকল তূণীরের দিকে। তার মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর,—লেটস কাম টু দা পয়েন্ট। ঝোপেঝাড়ে লাঠি চালিয়ে লাভ নেই। শোন, ফিনান্স ডিরেক্টারের একটা প্রোপোজাল আছে। রিকোয়েস্টও বলতে পারো। তুমি রাধেশ্যাম গুপ্তাকে চেনো ? আর জি ? দা রিনাউনড প্রোমোটার ?

কলিং বেল টিপতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল তূণীরের। মাত্র চারতলা উঠেই এত শ্রান্তি আজ !

ঝিনুক ড্রয়িং-স্পেসে একজন লোকের সঙ্গে বসে কথা বলছিল। তূণীরকে দেখেই ঝিনুকের চোখে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে। পরিচয় পালার অপেক্ষা না করেই লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে,—আপনি নিশ্চয়ই তূণীর ? আমি শরৎ ঘোষাল।

ক্লান্ত তূণীর সোফায় বসল। শুকনো হেসে বলল,—আপনার কথা ঝিনুকের মুখে অনেক শুনেছি।

সুজাতা তূণীরকে দেখে নিরাশ। তূণীরের হাতে কোনও স্বর্গের পাখি নেই।

শরৎ আর ঝিনুকের সামনে এক গোছা কাগজের কাটিং। ঝিনুক ফুটছে উল্লাসে। এত খুশি এত উচ্ছ্বাস ঝিনুকের মুখে বহুদিন দেখেনি তূণীর। সেই শালফুলের রেণুসিক্ত মুখ। সেই আঁচলভরা সুঘ্রাণ। তূণীরের দু চোখ ঘুরে ফিরে ঝিনুককেই দেখছে। চঞ্চল বালিকার মত এই নারী শুধু তার। তারই। এই মুহূর্তে ওই নারীকে ছুঁয়ে ছেনে দেখতে ভারি লোভ জাগছিল তূণীরের।

ঝিনুক কাগজের গোছা সরিয়ে তূণীরের দিকে তাকিয়েছে,—অ্যাই, আজ অফিসে তুই মারধর খেয়েছিস নাকি রে ? জানেন শরৎবাবু, ওদের ফিনান্স ম্যানেজার ওকে মাঝে মাঝেই কান ধরে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখে।

শরৎ হো হো করে হেসে উঠল,—সে তো আপনার ঠাকুমাও

আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। টেবিলে নয়, রাস্তায়। রোদ্দুরে। দু হাতে থান ইট দিয়ে।

তূণীর স্বাভাবিক হতে চাইছে। বলল,—আপনার অপরাধ ?

—আমার ওষুধে সাতদিনের বদলে এক হপ্তায় জ্বর ছাড়ে, সেটাই আমার অপরাধ।

গেঁয়ো রসিকতা। তূণীর মনে মনে নাক কুঁচকোল। উপেক্ষা করতে চাইল লোকটাকে। সরাসরি ঝিনুকের সঙ্গে কথা শুরু করল,—বুঝলি, আজ ডিসিশান মোটামুটি ফাইনাল হয়ে গেল। আমিই যাচ্ছি। হয়তো ডিসেম্বরেই।

—তাআই ! ঝিনুক বাচ্চা মেয়ের মত তূণীরের পাশে এসে বসে পড়ল,—এত বড় খবরটা এতক্ষণ চেপে আছিস ?

ঝিনুকের উল্লাসে সুজাতাও ছুটে এসেছে। সব শুনে স্বর্গের পাখির দুঃখ বেবাক হাপিশ। সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা,—আর তো তোমার ওজর আপত্তি চলবে না। কবে যাব তোমার বাবা মার কাছে ?

ঝিনুকের মুখে রক্তের আভা। আড়চোখে শরৎকে দেখে আলতো ধমক দিল মাকে,—এত হুটোপাটি করছ কেন ? তুমি না সত্যিই... !

তূণীর মৃদু হাসছে। শরৎ উঠে দাঁড়াল,—আমি আজ বরং উঠি। আপনারা গল্পসল্প করুন। গুড নিউজ দুটো কালই মৃণালমাকে পৌঁছে দেব।

চাষাড়ে লোকটার কথায় আগ্রহ নেই তূণীরের। সে চশমা খুলে রুমালে মুখ মুছছে।

ঝিনুক বলল,—সত্যিই আজ দিনটা দারুণ। তোর এমন একটা গ্র্যান্ড নিউজ, আমারও। জানিস গতকাল পুলিশ চার্জশিট ফাইল করেছে। শরৎবাবু নিয়ে এসেছেন খবরটা।

নিমেষে তূণীর ক্যালিফোর্নিয়ার বরফের স্তূপ। ঝিনুকের সেদিকে নজরই নেই। সে আজ কথার নেশায় মাতাল,—শরৎবাবু বলছিলেন এ সব কেসে ডেট বেশ তাড়াতাড়ি পড়ে। অন্তত ওই ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে। বাছাধনদের এ বার খাঁচাতে ঢুকতেই হবে।

শরৎ ! শরৎ ! শরৎ ! তূণীর হাঁটুতে মুঠো ঘষছে। এক্ষুনি লোকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া যায় না ?

শরৎ যাওয়ার আগে দরজায় দাঁড়াল একবার,—মনে হয় আপনার ডেট সেপ্টেম্বরেই পড়বে। আমি আপনাকে পরে জানিয়ে যাব।

নির্জন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে তূণীর। ঝিনুক পাশে এসে দাঁড়াল,—কি ভাবছিস ?

তূণীরের প্রায় বুকের কাছে তার প্রিয়তম নারী, তুষার তবু গলতেই চায় না। সহসা অস্ফুটে বলে উঠল,—ঝিনুক, তুমি আমাকে একটা কথা দেবে ?

সচকিত হরিণীর মত থমকেছে ঝিনুক,—তুই ! তুই... ! তুই হঠাৎ ! কি হয়েছে তোর ? হয়েছেটা কি !

তূণীরের গলা দুলে গেল,—আগে তুমি আমাকে কথা দাও।

নিচের কম্পাউন্ডে আলো জ্বলছে না। কাঁঠালিচাঁপা গাছ শুকনো হাত পা মেলে আঁধারে দাঁড়িয়ে।

তূণীর রেলিং-এ ভর দিল,—ও সব শরৎ ডাক্তার, ফরৎ ডাক্তার তুমি ছাড়ো। যত সব মাথা চিবোনোর লোক।

—মানে ?

—এ কেস থেকে তুমি নিজেকে অ্যালুফ করে নাও ঝিনুক। কথা দাও। নেবে তো ?

নিশ্বাস আটকে এল ঝিনুকের। গলা কাঁপছে,—হঠাৎ এ কথা কেন ?

তূণীর ঢোঁক গিলল,—কার না কার নোংরা একটা কেসে এত বেশি নিজেকে জড়িয়ে ফেলা তোমাকে মানায় না ঝিনুক।

পৃথিবী গতি হারাল। সন্ধ্যা নিথর।

তেরো

স্বামীর বিহনে নারী যাইবে কোথা।
স্বামী সহচর বন্ধু স্বামী সে দেবতা ॥
স্বামী ভিন্ন গতি অন্য নাহি নারীগণে।
ব্রত তীর্থ পূজা হোম স্বামীর চরণে ॥

নাকি সুরে দুলে দুলে সত্যনারায়ণের পাঁচালি পড়ছে বৃদ্ধ পুরোহিত। তাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে নানান বয়সী সুবেশা নারী। কেউ কেউ পাঁচালির ছন্দে দুলছে মৃদু মৃদু। অধিকাংশেরই পাঠে মন নেই, যে যার নিজস্ব সঙ্গী খুঁজে পার্শ্ব আলাপে রত। ড্রয়িংরুমের সোফাসেট দেওয়ালের গায়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীল কালো মোজাইকের মেঝে জুড়ে আজ নারায়ণ পুজোর আয়োজন।

রমিতার শাশুড়ি গরদের শাড়ি পরে গরমে হাঁসফাঁস করছিল। লাল টুকটুকে স্লিভলেস ব্লাউজের স্ট্র্যাপ আঙুলে চেপে ধরছে বার বার। ইশারায় সে বড় ছেলের বউকে ফ্যানদুটো চালিয়ে দিতে

বলল।

পাখা ঘুরে উঠতে রমিতাও স্বস্তি পেল। বহুক্ষণ ধরে তার গা গুলোচ্ছে, চার মাস হতে চলল, এখনও বমি বমি ভাবটা যায়নি। ধূপধুনো, গুগ্‌গুলের গন্ধে একটা চোরা শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল তার। পাঁচালি পাঠ ছেড়ে এ সময় উঠে যাওয়াও যায় না। শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হতে পারে। বিশেষত তার আর পলাশের জন্যই যখন আজ এই অনুষ্ঠান।

বেনারস থেকে পুরী যাওয়ার পথে গুরুদেব তিন দিনের জন্য এ বাড়িতে অধিষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর মতে প্রকীর্ণপাতকে দুষ্ট হয়েছে এই গৃহ। রমিতাকে তিনি স্বহস্তে নবগ্রহ কবচ পরিয়ে দিয়ে গেছেন। দোষ কাটানোর জন্য বিধানও দিয়ে গেছেন কিছু। প্রতিদিন স্নান সেরে শুদ্ধ শরীরে পাখিদের এক মুঠো করে আতপ চাল খাওয়াতে হবে রমিতাকে। স্টিল নয়, কাঁসা বা কাচ নয়, কদলীপত্রে আহার করতে হবে বাড়ির সকলকে। এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা। শনি মঙ্গলবার রমিতার স্বামীসহবাস নিষিদ্ধ। এ ছাড়া তিন মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে একদিন গোমাতাকে স্বহস্তে পূর্ণ ভোজন করাতে হবে। গোমাতাই। ষাঁড় বা বলদ চলবে না।

দময়ন্তী রমিতার কানে ফিসফিস করে বলল,— এত উশখুশ করছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

রমিতার তসরের শাড়ি খালি খালি গা থেকে নেমে যাচ্ছে। কোমরে আঁচল গুঁজে সে পিঠ সোজা করল,— না, ঠিক আছি। কটা বাজে গো?

দময়ন্তী পলাশের জাঠতুতো দিদি। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপিকা। রমিতার বিয়ের সময়ও তার এক ঢাল চুল ছিল, সম্প্রতি সে পুরোপুরি ববছাঁট। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ি জমানো তার প্রিয় নেশা। আজও তার পরনে জমকালো আঁচল বাসন্তী রাজকোট। মানানসই ব্লাউজের পিঠ অনেকখানি কাটা। এ বছরই সে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ব্রেসলেট প্যাটার্নের কোয়ার্টজ ঘড়ি দেখে নিয়ে সে বলল,— বারোটা দশ। তোর ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?

রমিতা দু দিকে মাথা নাড়ল। তার আজকাল একদমই ক্ষিদে পায় না। ডাক্তার একগাদা টনিক দিয়েছে, তাতেও না।

দময়ন্তী রমিতার দিকে আরও ঘেঁষে এল,— হ্যাঁরে, গুরুদেব নাকি পুলুর কুষ্ঠি দেখে বলে গেছেন তোর ছেলেই হবে!

—হুঁ।

রমিতা-দময়ন্তীর সংলাপ লীনা কান খাড়া করে শুনছিল। পিছন ঘুরে সে মন্তব্য করল,— সঙ্গে অবশ্য বলেছেন, যদি কোন গ্রহের গণ্ডগোল না হয় তবেই।

দু তিনটে বাচ্চা খেলা করতে করতে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে গেল। পাঁচালি পাঠ প্রায় শেষ। পুরোহিত গলা চড়িয়েছে, —বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।...হরি বল।...হরি বল।

কথা থামিয়ে সকলে একসঙ্গে মেঝেতে প্রণিপাত। ঘর জুড়ে চাপা গুঞ্জন,—হরি বলো। হরি বলো। সেই গুঞ্জনের মাঝে হঠাৎ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে এক জিনস্‌পরা কিশোরী,—ওহ্ নো! শেষ হয়ে গেল! মা যে প্রসাদ চড়ানোর জন্য সুইটস্ পাঠিয়ে দিল!

রমিতার মাসিশাশুড়ি বিরক্ত মুখে তাকাল,—এত দেরি করলি কেন? রিনিকে তো বলেছিলাম বারোটার মধ্যে পুজো শেষ হয়ে যাবে। বোস্। শান্তির জল নিয়ে যা।

কিশোরী কসরত করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। মিষ্টির বাক্স হাতে হাতে পৌঁছে গেছে শালগ্রামশিলার চরণে। শান্তির জল নিতে রমিতার শ্বশুরও দরজায়। পা বাঁচিয়ে শান্তির জল মাথায় নিচ্ছে সকলে।

পুরোহিত পুঁটলি বাঁধছিল, রমিতার শাশুড়ি বলল,—ঠাকুরমশাই, আপনি ছোট বৌমার সঙ্গে গিয়ে সব ঘরেই একটু করে শান্তির জল ছিটিয়ে আসুন। আমার ছেলেদের জন্যও ঘটে একটু রেখে দেবেন।

লীনা বলল,— তুলতুলিকেও একটু দেখে আসিস তো। ঘুম থেকে উঠে গেলে আমায় ডাকিস।

পুরোহিতকে নিয়ে গোটা বাড়ি ঘুরছে রমিতা। দোতলার সব ঘরে গঙ্গার জল ছিটিয়ে নিচে নামল। একতলার রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর শ্বশুরের বৈঠকখানা আর টানা বারান্দা পেরিয়ে সদর দরজায় এসেছে। দরজার পরে বাঁধানো উঠোন। পুরোহিত সেখানে জল ছিটিয়ে এসে রমিতাকে বলল,—দ্যাখো তো মা, কে যেন ডাকছে বাইরে!

মানুষসমান পাঁচিল তোলা বাড়ির বাহারি গেটে মাধবীলতার সংসার। ধুতিশার্ট পরা এক আধবুড়ো গেটের বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে।

রমিতা গেটের সামনে এল,—কাকে খুঁজছেন?

—এটাই তো তেইশের বি গল্‌ফ ক্লাব অ্যাভিনিউ?

—হ্যাঁ বলুন ?

—রমিতা চৌধুরী, পলাশ চৌধুরী এ বাড়িতে থাকেন ?

—আমি রমিতা। পলাশ চৌধুরী আমার স্বামী।

—আলিপুর কোর্ট থেকে সমন আছে।

খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি লোকটা চেনছেঁড়া ফোলিও ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বার করে ঘাঁটছে। রমিতার মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা ধারা বয়ে গেল। চকিত ত্রাসে শরীর অবশ। পলকের জন্য ভাবল শ্বশুরকে ডাকবে কিনা।

লোকটা দুটো কাগজ এগিয়ে দিল। সঙ্গে একটা বাঁধানো ময়লা খাতা।

—এখানে সাইন করুন। আপনার স্বামীরটাও আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।

রমিতা ক্ষীণ বাহানা জুড়বার চেষ্টা করল,— একটু দাঁড়ান, ভেতর থেকে পেন নিয়ে আসি।

—আমাদের কি দাঁড়ানোর টাইম আছে দিদি ? এখনও কতগুলো সমন সার্ভ করতে হবে জানেন ? বলতে বলতে লোকটা পকেট থেকে একটা ডটপেনের রিফিল বার করেছে। যত্ন করে তেল চটচটে মাথায় ঘষে নিল রিফিল, —সই করার নাম করে কত জন ভেতরে সেঁধিয়ে যায়, আর বেরোয়ই না, জানেন ?

রমিতার স্নায়ু অবশ, তবু লোকটার কথা গায়ে লেগে গেল তার,—আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি পালিয়ে যাব ?

—দেখে কি আর মানুষ চেনা যায় দিদি ? লোকটার ঘাঁটা মুখে নির্বিকল্প ভাব,— এই তো গত পরশু কুঁদঘাটে একটা সুন্দরপানা মেয়েছেলে 'আসছি' বলে অন্দরমহলে ঢুকে গেল। পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, মেয়েছেলেটা আর বেরোয় না ! শেষে মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়েছি বাড়িতে, ওমনি একটা বাছুরের মত কুকুর ঘাঁউ ঘাঁউ করে তেড়ে এল। উরি ব্বাস, সে কী সাইজ ! বাঘ বলে দূরে থাক্। প্রাণ হাতে করে বাঁচা। ...মাঝখান থেকে আমার নতুন ডট পেন চোট।

রমিতা ঝোঁকের মাথায় হাত বাড়িয়ে ফেলল, —দিন কোথায় সই করতে হবে।

লোকটা প্রায় রমিতার গায়ের ওপর ঝুঁকে সই করার জায়গা দেখাচ্ছে, —কিছু মনে করবেন না দিদি, পস্ট কথায় কষ্ট নেই। অনেকে আসবে, পাঁচ-দশ টাকা নিয়ে সমন না-ধরিয়ে চলে যাবে। আমি ওরকম ছিঁচকে বেলিফ্ নই। দরকার হলে দু পয়সা চেয়ে নেব,

কিন্তু বেআইনী কাজ যুধিষ্ঠির পাখিরা করে না।

লোকটা চলে যাওয়ার পর সম্বিৎ ফিরল রমিতার। লোকটা কি প্রকারান্তরে টাকা চাইছিল ? টাকা দিলে কি সমন নিতে হত না ? কিন্তু সে তো ঘুষ ? একটা অচেনা লোককে ঝপ করে ঘুষ দেওয়া যায় নাকি ? যাক গে, নেওয়া যখন হয়ে গেছে ভেবে আর কী লাভ !

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শ্বশুরের বৈঠকখানা ঘরে চোখ পড়ল রমিতার। শ্বশুরমশাই ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। ঘরটা পেরিয়ে গিয়েও দুরু দুরু পায়ে ফিরে এল রমিতা। কম্পিত গলায় ডেকেছে, —বাবা।

রমিতার শ্বশুর চোখ থেকে কাগজ নামাল।

—বাবা কোর্ট থেকে একটা লোক এসেছিল।

—কোথ্থেকে ?

—আলিপুর কোর্ট থেকে। গুটি গুটি পায়ে রমিতা আরেকটু এগিয়েছে। ঢোঁক গিলে বলল,— দুটো সমন দিয়ে গেল।

কাগজ দুটো ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করে রমিতার শ্বশুর বিড়বিড় করে উঠল,— তোমাদের সাক্ষীর সমন ! তেইশে সেপ্টেম্বর ডেট্। তুমি এটা নিতে গেলে কেন ? আমাকে ডাকতে পারতে।

—লোকটা এমন ভাবে সামনে পড়ে গেল···আমি ঠিক সাহস করে...আমি কি ভুল করেছি বাবা ?

—পুলু তোমাকে কিছু বলে রাখেনি ?

—কই...তেমন কিছু...না তো !

—এত ক্যালাস ছেলে ! আদিখ্যেতা ছাড়া কিচ্ছু মাথায় নেই। কত বার বলে দিলাম...ল'ইয়ারও এত করে বুঝিয়ে দিল...সেই সমনটা ধরা হয়ে গেল ! তুমিও একটু চিন্তাভাবনা করলে না !

রমিতা আঙুলে আঁচল পাকাচ্ছে। বিনীত স্বরে বলল,— কিন্তু বাবা, কোর্ট ডাকলে তো সাক্ষী দিতে যেতেই হবে।

—সমন না ধরলেই আর কোর্ট ডাকে না। রমিতার শ্বশুরের গম্ভীর মুখে চরম বিরক্তি,—তুমি দেখছি বেশি বুঝে গেছ।

রমিতার মাথা ঝুলে গেল।

—নিয়ে যখন ফেলেছই, কি আর করা যাবে। যাও, রেখে দাও।

রমিতা ফিরতে যাচ্ছিল, শ্বশুর আবার ডেকেছে,— তোমার শাশুড়ি জানে ?

—না।

—তিনি করছেনটা কী ? এখনও দঙ্গল নিয়ে হরি হরি চলছে ?

—আমি কি মাকে ডেকে দেব ?

—থাক। সব মেয়েছেলেরই বুদ্ধি সমান।

মলিন মুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল রমিতা। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ একটা সরু রঙিন কাচের জানলা। বন্ধ। কাচ বিদীর্ণ করে নীল হলুদ আলো সিঁড়ির অন্ধকারে গা মেলেছে। সেই আলোতে রমিতার ছায়া। একটা করে ধাপ ওঠে, ছায়াও দীর্ঘায়িত হয়। আরেক ধাপ উঠল, ছায়া আরও লম্বা। রমিতার গা ছমছম করে উঠল। বাড়ি ভর্তি এত লোক, তবুও। এ যেন ছায়া নয়, তার সদ্য ফেলে আসা অতীত। সে না চাইলেও থাকবে সঙ্গে সঙ্গে। প্রলম্বিত হবে ক্রমশ। দিনে দিনে।

শেষ কটা ধাপ রমিতা দৌড়ে উঠে গেল। মেয়েমহলের হাসিগল্প সেতারের ঝালার মত কানে বেজে উঠেছে। রমিতা পিছন ফিরে তাকাল একবার। ছায়াটা আর নেই।

রমিতার খাটে মামাতো মাসতুতো ননদ আর জায়েরা জোর আড্ডা জমিয়েছে। রমিতা ঘরে ঢুকতেই মাসতুতো জা হেসে উঠল খিলখিল করে, —এই, তোর বিছানা দখল।

রমিতা সামান্য চোয়াল ফাঁক করল।

মামাতো ননদ বলল,— দেখেছ, শুনেই কেমন মুখ শুকিয়ে গেছে ! নারে বাবা, দখল করতে হলে লীনাবৌদির খাট রয়েছে। ওটা পুরনো পাপী।

রমিতা নীরবে আলমারি খুলল। কাগজ দুটো যে কোথায় রাখে ! পলাশের জামাকাপড় ঝোলানোর ওয়ার্ড্রোবের তাকে ! উঁহু। পাল্লা আড়াল করে লকার খুলল রমিতা। ছোট্ট একটা জুয়েলারি বক্সে টুকটাক কয়েকটা গয়না আছে। এখানে সেখানে পরে যাওয়ার জন্য। কাগজদুটোকে কাঁপা কাঁপা হাতে চালান করল সেখানে। লকার বন্ধ করতে গিয়ে থমকাল একটু। আবার হাত বাড়িয়েছে ভিতরে। বেডসাইড বক্স থেকে খবরের কাগজের কাটিংটা লকারে তুলে রেখেছিল। লোকজনের চোখ এড়িয়ে শ্রবণা সরকারের ছবিতে হাত বোলালো কয়েক সেকেন্ড। ছবিটা ছুঁলেই তার স্নায়ু অনেক সতেজ হয়ে ওঠে। একটা মেয়ে অন্ধের মত এলোপাথাড়ি ব্যাগ চালাচ্ছে। ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে জানোয়াররা...।

—অ্যাই, কি করছিস রে আলমারিতে মুখ ডুবিয়ে ?

রমিতা লঘু হাতে লকার বন্ধ করে খাটে এসে বসল। সে এখন অনেকটা প্রফুল্ল। হাসিমুখে বলল, —ওমা জানো না, ওখানে যে

আমার প্রাণভোমরা লুকনো আছে !

—গয়নার বাক্সে ?

—কোন গয়নাটায় রে ? তোকে পলাশদা ফুলশয্যায় যে হিরের নাকছাবি দিয়েছিল, সেই বাক্সটায় ?

রমিতা মুখ টিপে হাসল ।

লীনা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, —নিচে বাবা খেতে বসে গেছেন । অ্যান্ডা বাচ্চাদেরও বসিয়ে দিয়েছি । ওপরের টেবিলে যে-কজন হয়, খেয়ে নিবি আয় ।

খেতে বসে পিসতুতো জা কথাটা তুলল,— তখন তুই গেটের ধারে কার সঙ্গে কথা বলছিলি রে রমিতা ?

রমিতা পরিবেশন করছিল । হাত ফস্‌কে শাশুড়ির পাতে অনেকটা ডাল পড়ে গেল,—কখন ?

—ওই যে দেখলাম তুই কি একটা সই করে নিলি ?

—নাগো মালাদি, ভুল দেখেছ । অম্লান বদনে মিথ্যে বলল রমিতা,—আমি তো শান্তির জল ছিটিয়ে রান্নাঘরে গেছিলাম ।

শ্যেনচক্ষু মালা হারবার পাত্রী নয় । আত্মীয়মহলে মুখরা হিসাবে তার প্রসিদ্ধি আছে । বলল,— আমি তো মাইমাদের জন্য শরবত আনতে রান্নাঘরে গেলাম, তোকে তো দেখলাম না !

রমিতার শাশুড়ি বুঝি বিপদের গন্ধ পেল । তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—নারে মালা, রমিতা ঠিকই বলছে । আমিই ওকে রান্নাঘরে পাঠিয়েছিলাম, ভাজাভুজি সব হয়েছে কিনা দেখতে ।

পরিবেশ টলমলে । দময়ন্তী হাল ধরল,—অনেক দিন পর বেশ হৈচৈ হচ্ছে । যাই বলো, ধূপ ধুনো মন্ত্র এসবে বাড়ির পরিবেশটাই কেমন বদলে যায় । মন্দির মন্দির ভাব আসে, তাই না কাকিমা ?

—এটা আমাদের ঠাকুরমশাইয়ের গুণ । এমন সুন্দর মন্ত্র উচ্চারণ করেন...

রমিতার শাশুড়ির প্রিয় বান্ধবী, বিউটিপার্লারের মালকিন বলে উঠল,—মন্ত্রের তো একটা এফেক্ট আছেই । আমি তো ভাবছি পার্লারে একটা মেডিটেশানের ক্লাস শুরু করব । স্যান্‌স্‌ক্রিট হিম্‌স্‌গুলো খুব লো টোনে স্টিরিওতে বাজতে থাকবে, তার সামনে বসে ধ্যান । আইডিয়াটা কেমন দময়ন্তী ?

—গ্রেট । মন্ত্রের যদি কোন এফেক্টই না থাকে তো মুনিঋষিরা কষ্ট করে লিখেছিলেন কেন ? অশুভ শক্তি মন্ত্রের কাছে ঘেঁষতেই পারে না ।

জিনস্‌পরা কিশোরী নখ দিয়ে আলুর দম চিরছে। বড়দের কথার মাঝে সে আর চুপ থাকতে পারল না,—পায়েল তেরি কসমে তাই তো দেখাল। গমগম করে তান্ত্রিক মন্ত্র রিসাইট করছে আর অশুভ আত্মারা অমৃতা সিংকে ছেড়ে চোঁ-চাঁ।

—আমার তো মনে হয় এসব পুরনো শাস্ত্র-টাস্ত্র নিয়ে আরও রিসার্চ হওয়া উচিত। দময়ন্তী নিজের প্রসঙ্গে ফিরল,—সে দিন নাগার্জুনের ওপরে একটা পেপার উল্টোচ্ছিলাম। ভাবতে পারবে না কী সব কাজ করে গেছে দু-আড়াই হাজার বছর আগে। চরক শুশ্রুৎ জীবক এঁরা তো সব আয়ুর্বেদের জিনিয়াস। গাছপালা থেকে এত অজস্র চিকিৎসার ফরমুলেশান করে গেছেন! আরে বাবা, গাছপালার যদি গুণ নাই থাকবে, তাহলে ভগবান এত গাছপালা সৃষ্টি করলেন কেন?

—আমার পার্লারে তো তাই শুধু হার্বাল। রমিতার চোখের কোণে অত কালি পড়েছিল, কোন চিহ্ন আছে? কেমিকাল কিছু লাগালে ওর অত সুন্দর স্কিনটা নষ্ট হয়ে যেত না? ওর দিদিরও তো সে দিন এক সিটিং-এ সব ব্ল্যাকহেডস্‌ তুলে দিলাম।

—সত্যিই, রমিতাটার ওপর দিয়ে যা ঝড় গেল! মালা কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার নিজের কথা খুঁজে পেয়েছে। নিরীহমুখে রমিতার শাশুড়িকে খোঁচাল,—মাইমা, ওই কেসটার কী হল?

—কে জানে। রমিতার শাশুড়ি দায়সারা উত্তর দিল,—পুলু আর পুলুর বাবা দেখছে। ওরাই জানে।

রমিতার মামাতো ননদের মুখ কাঁদ-কাঁদ,—ইশশ, পেটে বাচ্চা রয়েছে, ওরকম একটা মেয়ের সঙ্গে অসভ্যতা! কোন মানে হয়!

লীনা ছোট গামলায় রসগোল্লা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল,—না না, তখন পেটে বাচ্চা ছিল না। তার তিন-চার দিন আগেই তো ওর...।

রমিতার মাসিশাশুড়ি বলল,—তোমরা আজকালকার মেয়েরা একটা কথা মানতে চাও না। মেয়েদের নিজেদের সম্মান নিজেদের হাতে। কোর্ট কাছারিতে গিয়ে, একগাদা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অপমানের কথা ঘোষণা করলে এমন কিছু সম্মান বৃদ্ধি হয় না। নিজেদেরই সামলেসুমলে চলতে হয়। মহাভারতে দ্যাখোনি, দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে দুর্যোধনরা যে কাণ্ডটা করল, অত বড় বীরেরা সব সভায় বসে, কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পেরেছে? করবে কি করে? দ্রৌপদী কর্ণকে অপমান করেনি? দুর্যোধনকে টিজ

করেনি ? দ্রৌপদীরও অনেক দোষ ছিল।

—ঠিক বলেছ দিদা। কিশোরী সায় দিল,—রূপা গাঙ্গুলি স্বামীগুলোর সঙ্গেও কী খারাপ ব্যবহার করত !

দময়ন্তী ধমকে উঠল,—এই গেঁড়ি, তুই থাম্।

মালা বলল,—আমি বাবা দ্রৌপদীর দোষ দেখি না। একটা স্বামী সামলাতেই হাড়মাস কালি হয়ে যায় ! পাঁচ-পাঁচটাকে সামলানো মুখের কথা !

দময়ন্তী বলল,—তাও দ্রৌপদীর মধ্যে ভক্তিভাব ছিল ; শ্রীকৃষ্ণ তাকে রক্ষা করেছিলেন। সে জন্যই তো রমিতাকে বলছিলাম, এর পর গুরুদেব এলে দীক্ষাটা নিয়ে নে। মনে আর কোন গ্লানি থাকবে না।

লীনা দময়ন্তীর পাতে রসগোল্লা দিচ্ছিল। হিম গলায় সে বলল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, গুণ্ডা বদমাশরাও তো ঠাকুরদেবতার কম ভক্ত নয়, ওরা গন্ধ শুঁকেই বুঝে ফেলবে কোন মেয়েটার দীক্ষা নেওয়া আছে। আর ইষ্টমন্ত্রের জোরে তো মেয়েদের সব অপমানই ধুয়ে যায়, না দময়ন্তীদি ?

এক লহমায় গোটা ঘরের আবহাওয়া ভারী। রমিতার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ছোটবেলা থেকে সে যথেষ্ট ভক্তিমতী, বিয়ের আগে শিবরাত্রির উপোস করেছে, দুর্গা পুজো সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, স্কুলে বাইবেল পড়েছে মন দিয়ে, তাহলে ? তাহলে তার কেন এই বিড়ম্বনা ?

বাড়ি ফাঁকা হতে হতে বিকেল গড়িয়ে এল। পরশু ভাদ্র সংক্রান্তি। তবু আকাশ এখনও শ্রাবণকে ভুলতে পারেনি। দুপুরের চিড়বিড়ে রোদ্দুরের আর চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ এখন আবার মলিন স্লেট।

ক্লান্ত শাশুড়ি নিজের ঘরে গড়াতে গেছে। শ্বশুর বিশ্রাম নিচ্ছে নিচের বৈঠকখানায়। মেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছে লীনাও। নিস্তব্ধ বাড়িতে শুধু রমিতারই আঁখিপাতা সজাগ। একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার বুকে। কেন যে সে নিয়ে ফেলল সমনটা ? কিন্তু কোর্টের লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন তো সরবার ক্ষমতাও ছিল না রমিতার। ক্ষমতা ছিল না ? নাকি তারই মনের অতলে একটা সূক্ষ্ম ইচ্ছের জন্ম হয়েছিল সেই মুহূর্তে ? ওই নোংরা ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে। বিশ্বসংসারের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছে। সাবানের বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী, তবু তো

ইচ্ছে। হায় রে, ইচ্ছে যদি জাগেই, তবে কেন রমিতা তাকে হৃদয়ে অনির্বাণ রাখতে পারে না ? কেনই বা নির্বাপিত ইচ্ছেগুলো অহরহ জ্বলে জ্বলে উঠতে চায় ? যন্ত্রণা দেয় রমিতাকে ? কেন ?

রমিতা বিছানা ছেড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। ঝমঝম বৃষ্টি নেমেছে। অতিকায় কৃষ্ণচূড়ার কাণ্ড বেয়ে অঝোরে জল পড়ছে। গাছটার নিচে, মোটা গুঁড়ি ঘেঁষে জড়সড় দাঁড়িয়ে একটা কুকুর। কুকুরটা ক্ষণে ক্ষণে অসহায় চোখে তাকাচ্ছে ওপর দিকে। ঝরঝর ধারার উৎস খুঁজছে। গাছতলায় দাঁড়িয়েও কুকুরটা এক্কেবারে ভিজে জাব। মরিয়া হয়ে গাছতলা থেকে কয়েকবার বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। পারল না। মুষলধারার বল্লমখোঁচায় আবার পালিয়ে এসেছে গুঁড়ির কাছে। বেচারা। একবার যদি সাহস করে বেরিয়ে পড়তে পারে বৃষ্টিতে, হয়তো বা কোথাও বেশি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে। নইলে আর কি হবে ? ভিজবে। এমনিও তো ভিজছে কুঁকড়ে-মুকড়ে। ওইভাবে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ভেজার থেকে বিশাল আকাশের নিচে স্বাধীনভাবেই নাহয় ভিজল ! রমিতা গ্রিলের খাঁচায় মুখ চেপে ধরল। অস্ফুট চিৎকার করছে,—যাহ্ যাহ্। বেরো। বেরিয়ে যা। কুকুরটা আর একবার বেরনোর চেষ্টা করল। আবার লেজ গুটিয়ে ফিরে গেছে গাছের নিচে। রমিতার ডাক সে শুনতে পায়নি। গুঁড়ির অন্য প্রান্তে, রমিতার চোখের আড়াল হয়ে, এবার তৃপ্তমনে গাছের জলে ভিজছে সে।

সন্ধ্যা দ্রুত নামছিল। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রমিতা খেয়াল করেনি কখন পলাশ ফিরেছে অফিস থেকে। কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে।

ভিজে জামাকাপড়ে পলাশ জড়িয়ে ধরল রমিতাকে,—রাজকন্যা কি গবাক্ষে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির গান শুনছে ?

রমিতা বলল,—ছাড়ো। ভিজে যাচ্ছি।

—ভেজো। ভেজো। সিক্ত হও। এই বৃষ্টিতে গান গাইতে ইচ্ছে করছে না তোমার ?

রমিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল,—আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না বললে তো চলবে না সখী। আমার যে এখন ভীষণ ভীষণ ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে।

রমিতা চোখ বুজল। পলাশ আবার দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। লাজুক পলাশও বুঝে গেছে সেই স্থির করবে, কখন সে রোমান্টিক হবে, কখনই বা দস্যু। অথবা নিস্পৃহ যোগী। এখানে

রমিতার কোন ভূমিকা নেই। থাকলেও সেটা পলাশের ইচ্ছানির্ভর।

রমিতা উদাসীন গলায় প্রশ্ন করল,—কি গান গাইলে তোমার এখন ভাল লাগবে ?

—এ ভরা বাদর মাহ্ ভাদর শূন্য মন্দির মোর...

রমিতা চোখ না খুলেই বলল,—আজ সমন এসেছে।

পলাশের মনমেজাজ আজ খুব ভাল। প্রোমোশানের ফাইলটা ক্যাবিনেটে গেছে। সমন শব্দটা প্রথমটা সে গায়েই মাখল না। রামপ্রসাদী সুরে গুনগুন ভেঁজে উঠেছে,—তিলেক দাঁড়া রে সমন, নয়নভরে বউকে দেখি...সায়নকালে রুমু আমার হাসে কিনা হাসে দেখি...

রমিতার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল,—আমাদের দুজনেরই সমন এসেছে আলিপুট কোর্ট থেকে।

পলাশ চাবুক খেয়ে সিধে হল,—কখন এল ? কখন ? কে রিসিভ করেছে ?

রমিতা আলমারি খুলে শুকনো পাজামা পাঞ্জাবি বার করে দিল পলাশকে,—দুপুরে এসেছিল। আমি নিয়েছি।

—তুমি নিয়ে নিলে ?

—কোর্টের লোকটা ধরিয়ে দিল যে।

পলাশ অশান্ত পায়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করছে,—বেলিফকে ফিরিয়ে দিতে পারতে। বলতে পারতে এখানে রমিতা চৌধুরী পলাশ চৌধুরী বলে কেউ থাকে না। ঠিকানা ভুল আছে।

—মিথ্যে কথা বলব ?

—ও। তোমরা মেয়েরা তো আবার মিথ্যে বলতে পার না! মিথ্যে না বলতে পার কয়েকটা টাকা হাতে গুঁজে দিতে পারতে।

পলাশের রূঢ় স্বরে রমিতা কুঁকড়ে গেল। চলন্ত ট্রেনের আয়নায় যেভাবে ভেঙে ভেঙে যায় নিজের মুখ, সেভাবে সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে বলল,—আমি বাবাকে বলেছি, ভুল হয়ে গেছে।

—ব্যস্, তাহলেই সাত খুন মাপ। পলাশ চিবোচ্ছে কথাগুলোকে,—কোথায় সমন ? দেখি ?

রমিতার হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজ দুটো নিল পলাশ। পড়ছে। ভিজে কুকুরটা মরিয়া হয়ে আরেকবার গাছতলা থেকে বেরোতে চাইল,—কোর্টে যখন যেতেই হবে, ছেলেগুলোকে আমরা

ছাড়ব না। হতে পারে বড় বাড়ির ছেলে, আমার মানসম্মান নেই ?

পলাশ জ্বলন্ত চোখে রমিতার দিকে তাকাল,—তেইশ তারিখ ! মানে নেক্সট্ উইক ! বলেই ভেজা জামাকাপড়ে ছুটে চলে গেছে নিচে।

রমিতা সিঁড়ির মুখে এসে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করছিল নিচটা। একতলার কোন শব্দই ওপরে আসছে না। ড্রয়িংরুমের দেওয়াল-ঘড়ি বাজনা বাজিয়ে ছ'টা বাজাল। প্রতিটি ঘণ্টার শব্দ ঢং ঢং করে বাজছিল রমিতার মাথায়।

রমিতার শাশুড়ি ঘর থেকে বেরিয়েছে,—কি হল ! ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন ? পলাশ ফিরেছে বুঝি ?

রমিতা নিশ্বাস বন্ধ করে মাথা দোলাল।

—মনে করে শান্তির জলটা গায়ে ছিটিয়ে দিও। মনোর মা চা দিল না যে বড় ? লীনা কোথায় ?

—দিদি বোধহয় নিচে। রমিতা আনমনে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল।

—দ্যাখো না একটু গিয়ে। নেশার সময় চা না পেলে...এমনিই উপোস করে মাথা ধরে আছে...

রমিতা মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল। পলাশ উঠে আসছে।

চোদ্দ

ঝিনুক ধৈর্য হারাল,— কে আপনি ? কথা বলেন না কেন ? কেন বার বার টেলিফোন করেন এভাবে ?

ওপাশ থেকে যথারীতি সাড়াশব্দ নেই।

—কি মতলব বলুন তো আপনার ? ভিতুর মত থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন !...বুকের পাটা থাকলে উত্তর দিন।

এবার শুধু একটা নিশ্বাসের শব্দ। দীর্ঘ। গাঢ়।

ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠল,—ভেবেছেনটা কি ? এভাবে বার বার ফোন করলে আমি ভয়ে কেন্নোর মত গুটিয়ে যাব ? কান খুলে শুনে নিন। শ্রবণা সরকারকে এখনও আপনারা চেনেননি। যত হাজার বার খুশি উত্যক্ত করতে পারেন, শ্রবণা সরকার যা ঠিক করেছে, তা থেকে এক চুল নড়বে না। আমি আপনাদের কেয়ার করি না। আমি ভয় পাচ্ছি না।

ফোনে ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হল। লাইন কেটে গেছে।

ঝিনুক ক্রেড্‌লের ওপর আছড়ে রাখল রিসিভারটা। মাঝে

মাসখানেক বেশ বন্ধ ছিল, গত সাত দিন ধরে আবার শুরু হয়েছে ভূতুড়ে কল। আগে রাতের দিকেই আসত, এখন আর সময় অসময় নেই, সকাল দুপুর সন্ধে যখন তখন ঝনঝন। মানস সুজাতা তুললে সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়। ঝিনুক তুললে দু-এক মিনিট পর। যেন কেউ চুপিসাড়ে পরীক্ষা করছে ঝিনুকের ধৈর্য।

এগারোটা বাজে। আজ মানসের দেরিতে ক্লাস। এখন তার আয়েশ করে খাওয়ার সময়। আচমকা আতঙ্কে ভাতের থালা ফেলে উঠে এসেছে টেলিফোনের কাছে। সুজাতা আটকে গেছে ডাইনিং টেবিলের সামনে। দুজনেরই মুখ পাণ্ডুর।

—গলা পেলি কারুর ? কথা বলল ?

—না।

মানসের স্থৈর্য চূর্ণবিচূর্ণ। উদভ্রান্ত স্বরে বলল,— চল্, আজ থানাতেই যাই চল্। যা হওয়ার হবে।

—আমি থানায় যাব না।

সুজাতা হাউমাউ করে উঠল,—কেন যাবি না ! কেসের আগের দিন এভাবে ভয় দেখাচ্ছে...আগে তো তুইই থানায় যাওয়ার কথা বলতিস ?

—অ্যাট্ লিস্ট্ কালকের জন্যও তো একটা প্রোটেকশান চাওয়া দরকার।

ঝিনুক সোফায় বসল। থানা থেকে সে পরশুই ঘুরে এসেছে। স্কুল ছুটির পর। মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে। নতুন ও. সিটা অতিশয় অভদ্র। বসতে পর্যন্ত বলে না ! কী বিশ্রী টিটকিরি মারা কথাবার্তা ! কি বলে থ্রেট করছে আপনাকে ? ও, গলা শোনা যাচ্ছে না ! শুধু বাঁশি শুনেই... ! আপনি তাতেই ধরে নিলেন আপনাকেই শাসানো হচ্ছে ! সেই ভয়ে সিঁটিয়ে থানায় দৌড়ে এলেন ! ছেলেগুলো তো এমনিতেই যথেষ্ট ফেঁসে আছে ম্যাডাম, তিলকে তাল করে আরও বেশি ফাঁসাতে চাইছেন ? মেয়েদের নিয়ে এই হচ্ছে ঝামেলা। ছেলেদের সমান হবে বলে বাইরেও বেরোন চাই, আবার সব সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি কেউ গায়ে হাত দিয়ে দিল ! ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভাব ! ঘরে বসে থাকলেও নিজে নিজেই ভয় বানিয়ে... ! শুনুন ম্যাডাম, এ কমপ্লেনটা ঠিক পুলিশের আওতায় আসে না। আপনি বরং টেলিফোন অফিসে গিয়ে দেখতে পারেন। ওরা হয়তো বলতে পারবে গণ্ডগোলটা কোথায়। লাইনে, না রিসিভারে। হয়তো ব্যাটাচ্ছেলেরা অন্য কারুর লাইন আপনার সঙ্গে ভিড়িয়ে

রেখেছে। ...মাধুরীর সামনে সে কী বেইজ্জৎ অবস্থা !

ঝিনুক ঠোঁট কামড়ে ধরল। ওই লোকটার কাছে আবার যাবে ? কখখনো না। চিন্তার শেষ অংশ মুখ থেকে ছিটকে এল ঝিনুকের,—কখখনো না।

—কখখনো না মানে ? এত জেদ কিসের তোমার অ্যাঁ ? আমরা ভয় পাচ্ছি, আমরা পুলিশ প্রোটেকশান চাইব, তাতেও তোমার আপত্তি ?

—দ্যাখো মা, থানায় যেতে আমি ভয় পাই না। হাঁটু কেঁপেছিল তোমাদেরই। এখন তোমরাই...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। মানস মাঝে পড়ে শান্ত করতে চাইল দুজনকে,—ওকে তো কাল কোর্টে একা ছাড়ছি না। আমি যাব। ছোটনকেও বলা আছে, ও রাত্রে এসে যাবে। দু-দুজন সঙ্গে থাকলে...

—চলো, তুমি খাওয়া শেষ করবে চলো। সুজাতা মানসের হাত ধরে টানল,—আমি তূণীরকেও কাল সঙ্গে যেতে বলে দেব।

—তূণীর কেন ? দুটো পাহারাদারেও হবে না ? ব্যাটেলিয়ান লাগবে ?

—আমরা যদি মনে করি লাগবে, তো লাগবে। সুজাতা ঘুরে দাঁড়াল, তোকে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তূণীর যেভাবে বলবে, সেভাবে কোর্টে সাক্ষী দিবি। নিজে থেকে বেশি বকবক করবি না।

ঝিনুক কোর্টে কি বলবে না বলবে সেটা ঠিক করার মালিকও তূণীর ? ঝিনুক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল—তা কী বলতে বলেছেন তিনি ?

—খারাপ কথা কিছুই বলেনি। বলেছে না গিয়ে যখন উপায় নেই তখন যাক্। গিয়ে বউ আর ছেলেটা যা বলবে তাই বলুক। ওরাই যা সাক্ষী দেওয়ার দেবে। তুই শুধু ডিটো দিয়ে যাবি। এই হয়েছিল... ওই হয়েছিল...আগ বাড়িয়ে বেশি ওস্তাদি একদম না। তোর এত কিসের দায় রে ? তোর সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল ওরা ? বাঁচিয়েছিস মেয়েটাকে এই না ঢের !

সুজাতাকে চোখ দিয়ে ভস্ম করতে করতে ঝিনুক নিজের ঘরে এল। পৃথিবীতে কাউকে এক সেন্টিমিটার জমি ছাড়লে সে সঙ্গে সঙ্গে হাঁহাঁ করে পাঁচ-দশ ফুট ভিতরে ঢুকে আসবে ! বাবা মা ভাই বোন সব্বাই ! যেই ঝিনুক দাঁতে দাঁত চেপে বাবা আর ভাই-এর পাহারাদারি মেনে নিয়েছে, ওমনি নতুন চাপ ! তূণীরের কথা মত

সাক্ষ্য দিতে হবে। ইল্লি রে, তূণীর কি ঝিনুকের প্রভু ?

পিছনের গাছপালা গাঢ় সবুজ মেখে নিবিড়। নারকেল গাছের পা জড়িয়ে শুকনো আগাছারাও সতেজ জঙ্গল। ঝোপঝাড় থেকে মাথা তুলেছে দু-চারটে কাশফুল। নীল আকাশে আশ্বিনের ছোট ছোট মেঘেরা সামুদ্রিক ফেনার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট ডোবা সবুজ জলে থৈথৈ। ডোবার জলে পল্‌কা মেঘের ছায়া।

ঝিনুক কিছুতেই স্থিত হতে পারছিল না। ফালতু দুদিন ছুটি নিল। শুধু কালকের দিনটা নিলেই ভাল হত। জানালা থেকে সরে এল ঝিনুক। হাড় পাঁজরার গভীরে কোথাও একটা আহত সাপ সংগোপনে ফণা তুলছে। মা হঠাৎ তূণীরের কথা বলল কেন ! তূণীর কি মাকে কিছু বলেছে ! কোন গোপন শলাপরামর্শ হয়েছে দুজনের ! অথচ ঝিনুকের কাছে এই এক মাস ধরে কী আশ্চর্য রকমের নীরব তূণীর ! সেই যে একদিন কেসটা নিয়ে অদ্ভুত রহস্য করল, তারপর থেকে মুখে কুলুপ ! শরৎ ঘোষালের নাম করলে আকাশের দিকে তাকায়। ফুল পাখি দেখে। ঠাম্মার কাছে সেদিন যেতে বলল, তূণীর স্পিকটি নট্, বাদাম ভেঙেই চলেছে। উল্টে তুচ্ছ ছুতোনাতায় হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ। গত রোববার সিনেমাহলে ঝিনুক দশ মিনিট লেট ; তূণীর হলে দারুব্রহ্ম হয়ে বসে রইল। ঝিনুক কথা বলবে কি, হাতে হাতে ছোঁয়া লাগলেই সে কী বিরক্তি ! রাস্তায় হাঁটার সময় মাঝে মাঝে বেমালুম ভুলে যায় আর একটা দুপেয়ে প্রাণী পাশে আছে। আরে বাবা, হলটা কি তোর খোলসা করে বল্ ? অফিসে প্রবলেম ? বাড়িতে ? মেসোমশাই-এর শরীর খারাপ ? বিদেশ যাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল ? ঝিনুকের কেস্ নিয়ে তোর মাথায় যদি কোন গুবরে পোকা ঢুকে থাকে, ঝেড়ে বার কর্ সেটাকে। ঝিনুককে কিছু না বলে ঝিনুকের মার সঙ্গে গুজুর গুজুর কেন ? তবে কি ঝিনুকের লড়াইটাই নিশ্ছিদ্র ইস্পাতের দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝখানে ? ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি কি ভালবাসার মাঝখানে দেওয়াল তুলতে পারে ? হ্যাঁ, ঝিনুক একটু একগুঁয়ে, ঝিনুক জেদী, ঝিনুক বেপরোয়া, এসব কি তূণীর জানে না ? তূণীরও তো হিসাবী, কাজমাতাল, একটা সোশাল ক্লাইম্‌বার ! সব জেনেশুনেই তো গড়ে উঠেছে ভালবাসা। তাদের দুজনের কেউই অবুঝ নয়, তবে কেন গোপন যন্ত্রণা ঝিনুকের কাছে উজাড় করতে পারছে না তূণীর ? বিশ্বাস যদি নাই থাকে, ভালবাসা মাটি পাবে কি করে ?

দুপুরবেলা সুজাতাকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল ঝিনুক।

ট্রামডিপো অবধি হেঁটে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবার কখন হাঁটতে শুরু করেছে। আচমকা মেট্রোস্টেশন চত্বরে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজেই অবাক। কতক্ষণ ধরে এখানে ঘুরছে সে! এমন বোকার মত! তাল বেতাল! কাগজ ছিঁড়ে একটা বাবলগাম মুখে পুরল ঝিনুক। ওই তো সেই সিঁড়ি! যেখান থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসেছিল সে! ওই বাঁদিকের কোণে দাঁড়িয়েছিল রমিতা! সামনের জায়গায়টায় ঝিনুকের হাত মুচড়ে ধরেছিল কালো টি শার্ট! এখানটায় সারবন্দী ছিল মোটরসাইকেলগুলো! দুপুরের বাতাসে সেদিনের সন্ধ্যা যেন ত্রিমাত্রিক ছবি। ক্রিমিনালরা নাকি অপরাধের জায়গায় ফিরে ফিরে আসে? কিন্তু ঝিনুক তো ক্রিমিনাল নয়! তবে! তবে কি এটাও এক ধরনের অপরাধবোধ? অপরাধবোধ, না দায়বদ্ধতা?

ঝিনুক তীরবেগে বাসস্টপে ছুটল। এক্ষুনি কোর্টে যাবে। শরতের সঙ্গে একটু বসা দরকার। সরকারি উকিল রবীনবাবুর সঙ্গেও। কাল যেন কোনভাবেই বিপক্ষের দুঁদে উকিলরা ঘাড়ে থাবা বসাতে না পারে।

কোর্টে পৌঁছে ঝিনুক হতাশ হল। রবীন দত্ত দুজন সরকারি অফিসারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। শরৎ চেয়ারে নেই।

কথা বলতে বলতে রবীন দত্তর চোখ পড়েছে ঝিনুকের দিকে,—আপনি আজ হঠাৎ? শরৎ নেই। দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়েছে।

ঝিনুক ফিকে হাসি হাসল,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। রবীনের অন্যমনস্কতা কেটেছে,—আপনার কেসটা তো কাল উঠছে। সমন পেয়েছেন?

—পেয়েছি।

—একটু বসুন। এই কাঁটা-বাটখারার কেসটা একটু দেখে নিই।

ঝিনুক খুব সাবধানে নড়বড়ে চেয়ারটায় বসল। দুই কাঁটা-বাটখারা অফিসার একটা সবুজে রঙের বাঁধানো বই খুলে কিসব দেখাচ্ছে রবীনকে। রবীন বই-এ চোখ রেখেই হেঁকে উঠল,— এই সুশীল, চারটে চা দিয়ে যা। স্পেশাল।

আশপাশে কোন চা-ওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে না, তবু কয়েক মিনিটের মধ্যে এক খালি-গা বাচ্চা কাপ-কেটলি নিয়ে হাজির। ঝিনুক মুগ্ধ চোখে রবীনের দিকে তাকাল। গলায় ইন্টারকম ফিট করা নাকি!

বোম্বেটে চেহারার দুই বাটখারাবাবু বেরোনোর আগে ঝিনুককে টেরিয়ে দেখে নিল। ঝিনুক ওড়নাটাকে ভাল করে বিছিয়ে নিল কামিজের ওপর।

—আমি কালকের কেসটা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।

—আপনার সব ডিটেলে মনে আছে তো? ডেট? টাইম? সিচুয়েশান?

—তা আছে। কিন্তু প্রথম কোর্টে উঠছি...ওদের নামী উকিল...

রবীন আমল দিল না,—ছাড়ুন তো। আপনি স্টেডি থাকবেন, তাহলেই সব ঠিক আছে। আমি যা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক উত্তরটা দিয়ে যাবেন। ব্যস্ তাহলেই কেস দাঁড়িয়ে যাবে।

—না...একটু আন্‌ইজিনেস আর কি। ঝিনুক সহজ হওয়ার চেষ্টা করল— শরৎবাবু হঠাৎ ছুটি নিলেন কেন? অসুখবিসুখ করল নাকি?

—ওই পাগলের কাছে অসুখ-বিসুখ ঘেঁষে? রবীন মৌজ করে সিগারেট ধরাল,—ওর আশ্রমের গল্প শোনেননি? তাই নিয়ে এখন কাঁহা কাঁহা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—আশ্রম তাহলে শুরু হয়ে গেল?

—হয়নি। তবে ক্ষ্যাপা যখন প্ল্যান করেছে, চালু করে দেবেই। খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার। গল্প লিখতে জানলে, ওকে নিয়ে একটা নভেল লিখে ফেলতাম।

ঝিনুক স্মিত মুখে বলল,—জানি। স্কুলমাস্টারি করতেন। হোমিওপ্যাথি জানেন। সোশ্যাল সার্ভিসের নেশা আছে।

রবীন চোখ কোঁচকাল,—আর কিছু বলেনি?

—আরও কিছু আছে নাকি?

—আছে মানে? আপনি যা শুনেছেন সে তো শুধু টিপ অফ দা আইসবার্গ। রবীন পায়ে ঘষে সিগারেট নেবাল,—স্কুলমাস্টারি ছেড়েই এখানে আসেনি। মাঝে ক্যানিং-এ গিয়ে লঞ্চে সারেঙগিরি শুরু করেছিল। বিয়েও করেছিল একটা। ওখানকারই এক গরীব মেয়েকে।

—তাআই! শরতবাবু ম্যারেড!

—নো। বিপত্নীক। রবীন সামনে ঝুঁকল,—ভেরি স্যাড কেস। একদিন রাতে গোসাবায় লঞ্চ খারাপ হয়ে গেল। শরৎ ফিরতে পারেনি। বউটা বাড়িতে একা ছিল। অ্যান্ড শি ওয়াজ ব্রুটালি রেপড অন দ্যাট নাইট। দিন পনেরো পরে বউটা সুইসাইড করে।

ঝিনুক নিমেষে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে শুধু। তাকিয়েই আছে।

—শরৎ অবশ্য তারপর আর ওখানে থাকেনি। কলকাতায় চলে এল। প্রথমে হাইকোর্টের এক ল'ইয়ারের কেরানিগিরি করেছিল কিছুদিন। সেই সময় ল' পাশ করে। তারপর এই চাকরি। তাও প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল। রবীন দত্ত চোখ ঘোরাল,—ওই তিন নম্বর কোর্টের পেশকার, ক্যানিং-এ থাকে, ওর মুখেই সব শোনা।

জিনে-পাওয়া মানবীর মত ঝিনুক উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথা তার সম্পূর্ণ ফাঁকা। চতুর্দিকের এত কোলাহল, সামনে বসে থাকা রবীনবাবু, কালকের কেস, বাবা মা ঠাম্মা কিছুই আর তার মস্তিষ্কে নেই। তূণীরের জন্য গড়ে ওঠা বিষণ্ণতা, কেস নিয়ে অত মানসিক দ্বন্দ্ব, সব কিছুই কী তুচ্ছ হয়ে গেছে ওই হাস্যমুখ খ্যাপাটে লোকটার বুকের গভীর ক্ষতের কাছে। শি ওয়াজ ব্রুটালি রেপড!

রবীন বলল,—কাল ঠিক দশটার মধ্যে চলে আসবেন।

ঝিনুক বধির। টলমলে পায়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল। এলোপাথাড়ি হাঁটছে। হাঁটছে। হাঁটছে।

দুপুর ছুটে চলে গেল। বিকেলটাও। অন্ধকার মাড়িয়ে ঘরে ফিরছে ঝিনুক। শ্রান্ত পা সিঁড়ি ভাঙছে। ভাঙছে। দরজায় এসে স্থবির। তূণীর সোফায় বসে। পাশে মা বাবা।

সুজাতা মেয়েকে দেখে শিউরে উঠল,—কি হয়েছে তোর? মুখ-চোখের এই দশা কেন? কোত্থেকে আসছিস?

ঝিনুকের কথা বলার ইচ্ছে লোপ পেয়ে গেছে বহুক্ষণ। সোফায় হাত পা ছেড়ে দিল।

মানস ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে,—রাস্তায় কিছু হয়েছে? বল না, কথা বলছিস না কেন?

ঝিনুক রক্তশূন্য মুখে মাথা নাড়ল,—টায়ার্ড। ভাল লাগছে না।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করল,—তুই কোর্টে গিয়েছিলি? তূণীর বলছিল, তুই নাকি তিনটে নাগাদ কোর্ট থেকে বেরিয়েছিস? এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরল ঝিনুক। তূণীর জানল কি করে? পুরনো খটকা আবার ধাক্কা দিচ্ছে।

মানস বলল,—তোর আজ রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর কি দরকার ছিল? ছেলেটা কখন থেকে এসে বসে আছে...

প্রিয়জনদের স্বাভাবিক কথাও কখনও কখনও এত তিক্ত লাগে!

এত অসহ্য ! ঝিনুক নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল,—অ্যাই তূণীর, যাওয়ার আগে একবার ডাকিস তো। কথা আছে।

ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিল ঝিনুক। আলো জ্বালাল না। জানলার ওপাশে মধ্যাহ্নের সবুজ পৃথিবী এখন কালিমালিপ্ত। কালি মেখে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে নারকেলগাছ। স্বপ্নের সেই ঋজু গাছ। গাছও অন্ধকারে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ ঝিনুকের ঘোর কেটেছে। আলো। তূণীর।

ঝিনুক এক ঝটকায় উঠে বসল,—নিচে চল। এখানে বাবা মা আছে।

কম্পাউন্ডের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে। পাশে নিঃশব্দ শুকনো কাঁঠালিচাঁপা গাছ। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। বাতাসের জোলো ভাব এখনও পুরোপুরি যায়নি।

ঝিনুকের সন্দিগ্ধ স্বর একদম নিচু তারে বাঁধা,—তুই কি করে জানলি আমি আজ কোর্টে গেছিলাম ?

তূণীরও যথেষ্ট প্রস্তুত,—আমাদের অফিসের একজন দেখেছে।

—কে সে ?

—তুই কি আমাদের অফিসের সবাইকে চিনিস ?

—বাহ, আমি চিনি না, সে আমাকে চেনে ?

—কাগজে তোর ছবি দেখেছে।

—চার মাস আগে দেখা ছবি এখনও মনে রেখেছে ? মেমারি খুব শার্প তো ? থাকে কোথায় ? চল তো, তার সঙ্গে এক্ষুনি আলাপ করে আসি।

—তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ?

—বিশ্বাস করার কি কোনও কারণ আছে ? তোর চোখ বলে দিচ্ছে তুই মিথ্যে কথা বলছিস।

তূণীরের চোয়াল শক্ত হল,—তুই কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করছিস।

—তুই আমাকে অপমান করিসনি ? আমার আড়ালে মার সঙ্গে আমাকে নিয়ে গুজগুজ করাটাকে কী বলে ?

তূণীর প্রথমটা নিরুত্তর। কম্পাউন্ডের পাঁচিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর নিজের মনে কাঁধ ঝাঁকাল,—তোকে তা হলে বলেই ফেলি। আগে তোকে একবার রিকোয়েস্ট করেছিলাম, ভেবেছিলাম তাতেই তুই থামবি ! তুই আমাকে কেয়ার করলি না।

—তুই বা ওরকম রিকোয়েস্ট করবি কেন ?

—কেন শুনবি ? ওই ছেলে চারটের মধ্যে একজনের বাবা আমাদের ফিনান্স ডিরেক্টরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রজত আমাকে রাধেশ্যাম গুপ্তার বাড়িতে নিয়েও গেছে। আমি রাকেশ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেছি। হিট অফ দা মোমেন্টে ওই কাজটা করে ফেলে ছেলেটা এখন ভীষণ অনুতপ্ত। মে বি সঙ্গদোষ। তার জন্য শাস্তিও কম পায়নি। দু সপ্তাহ হাজতবাস করেছে। রাধেশ্যামজী তো ভাবনায় ভাবনায় হাফ ম্যাড। শুধু মারতে বাকি রেখেছে ছেলেকে। ভেবে দ্যাখ, এত ভাল বাড়ির ছেলে এর পর কি জেল খাটবে ?

তূণীর যেন নিজের কাছে নিজে কৈফিয়ত দিচ্ছে। ঝিনুক বাকশূন্য। বহু কষ্টে শুধু উচ্চারণ করতে পারল,—তুই কি ওদের হয়ে প্লিড করছিস ?

—না। আমারও কিছু অবলিগেশান আছে। ইন্টারেস্ট। আমার একার ইন্টারেস্ট নয়, আমাদের দুজনের ইন্টারেস্ট। তূণীর দ্বিধা সংকোচ সম্পূর্ণ ফেড়ে ফেলেছে,—আমার বিদেশ যাওয়ার প্রোপোজালটা পাস করানোর জন্য ফিনান্স ম্যানেজার, ফিনান্স ডিরেক্টর লড়ে যাবে ; আমি তাদের একটা অনুরোধ রাখতে পারব না ?

বাতাস কি হঠাৎ কমে গেল ? রাস্তার আলোগুলো হঠাৎ এমন টিমটিম কেন ? ঝিনুক বিড়বিড় করে বলল,—রিকোয়েস্ট বলিস না। বল ডিল্।

—সে তুই যেভাবে দেখবি।

—ওরাই বুঝি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে ? টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছে ?

—ছি ছি, ওদের তুই কী ভাবিস বল তো ? ওরাও তোর কাজটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে। আমার কাছে দারুণ প্রশংসা করছিল তোর। এমনকি রাধেশ্যামজীও। তবে বুঝিসই তো ওদের অনেক পয়সা, প্রচুর ইনফ্লুয়েন্স...থানা কোর্ট সব জায়গাতেই ওদের চোখ রয়েছে...

ঝিনুক সোজা হচ্ছে,—তুই নিজে কী চাস ?

—সেটা তো তোকে বলেইছি। তোর মত একটা মেয়ের ওসব নোংরা কেসে ইনভলভড থাকা মানায় না। তূণীর ঝিনুকের হাত ছুঁল,—ভাব তো ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায়... ! কমপক্ষে তিন বছরের জন্য !

ঝিনুক ছিটকে সরে গেল,—তুই ভাবলি কি করে আমি এভাবে

তোর সঙ্গে বিদেশে যাব ? এর চেয়ে আমার নরকে যাওয়া ভাল। অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আরও বড় অন্যায় করব ?

—কিসের অন্যায় ? আমি পলাশ চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি। মাইসেলফ। ওরও অনেক প্রেশার আছে, সোশ্যাল প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে, ওরা মোটেই এই কেস নিয়ে আর চটকাতে ইচ্ছুক নয়।

ঝিনুক কি করে বোঝায় এ কেস এখন আর রমিতা চৌধুরীর কেস নেই। এটা এখন একটা মৌলিক প্রশ্ন। একজন নারীর এই সামাজিক পরিবেশে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কি নেই, সেটা জানার প্রশ্ন। রমিতারা কি বলল, না বলল তাতে আর কিছুই যায় আসে না ঝিনুকের।

ঝিনুক দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—তা এখন আর হয় না রে। আমার বিবেক আমাকে বেঁধে ফেলেছে। আমার ফেরার পথ নেই।

—আমার মুখের দিকে তাকিয়েও নয় ?

ঝিনুকের চোখে জল এসে গেল,—এভাবে আমাকে দুর্বল করে দিস না। গোটা পৃথিবী অন্য দিকে যায় যাক, তুই অন্তত আমার পাশে থাকিস। প্লিজ তূণীর। প্লিজ। তুই ওই চাকরিটা ছেড়ে দে। তোর যা কোয়ালিফিকেশান, এফিশিয়েন্সি, অনেক ভাল ভাল চাকরি পাবি। বিদেশ যাওয়াও কোনও ব্যাপার না। তা ছাড়া আমাদের বিদেশ যেতেই হবে, তার কি মানে আছে ? বিদেশ না গেলে কি জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল ? আমরা দুজনে এই শহরেই থাকব। একটা ক্লিন অনেস্ট লাইফ, একটা মিশন নিয়ে বাঁচা...এর বেশি আর কি চাওয়ার থাকতে পারে ?

—গরু ভেড়ারাও তো ক্লিন। অনেস্ট। তূণীর অধৈর্য হয়ে উঠছে,—মনে রাখিস, বিহাইন্ড এভরি ফরচুন দেয়ার ইজ আ সিন।

—আমি ফরচুনে বিশ্বাস করি না। পাপের পার্টনারশিপেও আমার উৎসাহ নেই। ঝিনুক নিজেকে প্রাণপণে সামলে রাখার চেষ্টা করছে,—জানিস শরৎ ঘোষাল সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে ডেস্টিটিউট মেয়েদের জন্য হোম তৈরি করছে ? জানিস, লোকটার বউ রেপড হয়েছিল ? কথাটা শোনার পর থেকে সারাদিন আমি...

—অন্যের পিছনে আদাজল খেয়ে লাগলে ওরকমই হয়। তূণীর নির্বিকার বলে দিল,—রজত বলছিল তোকেও ওরা রাস্তা থেকে যে কোনও দিন তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করতে পারে। ওদের সেই মাসল পাওয়ারও আছে, কানেকশানও আছে। তোর জন্য যদি

ছেলেগুলোকে জেলে ঢুকতে হয়, ওরা তোকে ছাড়বে না।

—তেমন হলে আমার জন্য তুই তো আছিস। তুই লড়ে যাবি। আমরা দুজনে একসঙ্গে লড়ব। নাকি তোরও রেপ করা বউ নিয়ে ঘর করতে সম্মানে লাগবে ?

—ডোন্ট টক রট। তূণীর ধমকে থামাল ঝিনুককে। নিজেও থমকে কি যেন ভাবল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলছে,—ঠিক আছে আয়, আমরাও তা হলে একটা ডিল করি। আমি তোর ইচ্ছে মেনে নেব। ওই চাকরি ছেড়ে দেব। বিদেশ যাব না। তুইও আমার ইচ্ছে মেনে নে। পলাশ-রমিতা কোর্টে যা বলবে, তুইও তাই বলবি। নাথিং মোর নাথিং লেস।

একটা অন্যায় দাবির বিনিময়ে একটা ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কী জঘন্য কৌশল! নিজের অহম তৃপ্ত করার সুনিপুণ অপপ্রয়াস! ঝিনুক তূণীরের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। এই সেই তূণীর! তার জন্ডিসের সময় ছলছল চোখে এসে বসে থাকত! তিয়াত্তর পাতার প্রেমপত্র লিখেছিল তাকে! ছত্রে ছত্রে একই নিবেদন! তোর জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি। সে-ই কিনা ঝিনুককে বিষপান করে মরে যেতে বলছে! নিজের চুরি করা রাজভোগ ফেলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে!

ঝিনুক মরা কাঁঠালিচাঁপা গাছটার দিকে তাকাল,—যদি তোর চুক্তি না মানি ?

—তা হলে আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। তূণীরের মুখের একটি পেশীও কাঁপল না। আহত পৌরুষ লুকনো থাবা প্রকাশ্যে চাটতে শুরু করেছে,—হয়তো আমার পক্ষে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। জীবন শুরু করার আগেই এত ঔদ্ধত্য আমার পক্ষে স্ট্যান্ড করা সম্ভব নয়।

আদিম পুরুষ পুরোপুরি নগ্ন।

ঝিনুক এক পা এক পা করে পিছোচ্ছে সিঁড়ির দিকে। অশ্রুমাখা চোখে তূণীর ঝাপসা ক্রমশ,—তুমি চলে যাও। আর কখখনো এসো না আমার কাছে। কখখনো এসো না।

তূণীর তবু এগোচ্ছে,—মেয়েদের এত তেজ ভাল নয় ঝিনুক।

ঝিনুক মিলিয়ে গেল।

পনেরো

যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

—আপনার নাম ?

—রমিতা চৌধুরী।

—স্বামীর নাম ?

—পলাশ চৌধুরী।

—ঠিকানা ?

—তেইশের বি গলফ্ ক্লাব অ্যাভিনিউ।

—গত তেরোই মে রাত দশটায় টালিগঞ্জ থানায় আপনি একটা এফ আই আর লজ করেছিলেন। ঠিক ?

—ঠিক।

—ওইদিনই রাত নটা নাগাদ টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের চাতালে চারজন যুবক আপনার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল, এই ছিল আপনার এফ আই আরের মূল বয়ান। ঠিক ?

কোর্টরুমে থিকথিক করছে মানুষ। কেসের থেকেও সুন্দরী রমিতা চৌধুরীকে দেখার উৎসাহই বেশি সকলের। তাদের দৃষ্টি বিঁধছে রমিতাকে। রমিতা মাথা নামিয়ে নিল। আকাশী নীল পিওর সিল্কের আঁচল আরও ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে।

—বলুন, সংকোচ করবেন না। শ্লীলতাহানি হয়েছিল ?

—হুঁ।

—যারা আপনার সঙ্গে সেদিন অশ্লীল আচরণ করেছিল, আপনি নিশ্চয়ই তাদের দেখলে চিনতে পারবেন ?

রমিতা চুপ।

—দেখুন তো, ওই কাঠগড়ায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাই সেই যুবকেরা কিনা ?

রমিতার মাথা বুকে মিশে গেল। দূর থেকেও বোঝা যায়, সে অসম্ভব কাঁপছে। রবীন দত্ত গলা আরও কোমল করল,—ভয় পাবেন না। দেখুন।

রমিতা একঝলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। চারটে মুখ ছুঁয়ে গেল তাকে। মুহূর্তের জন্য শরীরে ক্রোধের আলোড়ন। পরমুহূর্তে দেহ অবশ। কাঠগড়া দুলছে। অতলে ডুবে যাচ্ছে রমিতা। রমিতা চোখ বুজল। যখন আমি মৃত্যুছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না। কেননা সদা প্রভু আমার সঙ্গে

সঙ্গে আছেন। যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া...। দু হাতে কাঠগড়া আঁকড়ে ধরেছে রমিতা,—আমি চিনতে পারছি না।

—ঘাবড়াবেন না মিসেস চৌধুরী। আরও ভাল করে দেখুন। লুক স্ট্রেট। চিনতে পারছেন ?

রমিতা মুখ তুলল না। নতমস্তকে শ্বশুরমশাইয়ের উকিলবন্ধুর শেখানো বুলি তোতাপাখির মত আউড়ে যাচ্ছে,—ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। আলো কম ছিল। কারুর মুখই ভাল করে দেখতে পাইনি।

রমিতার গলা গহীন খাদে নেমে গেছে। কাঁপছে। গর্ভের শিশুটা কি নড়ে উঠল ! সে কি অন্য কিছু শুনতে চায় !

সরকারি উকিল উত্তেজিত। বিপক্ষ মিটিমিটি হাসছে। কোর্টরুমে মৃদু গুঞ্জন। কোর্টঘর ছাপিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল বাইরেও। প্রাঙ্গণের প্রাচীন বটগাছের পাতারা আরও আরও অনেকবারের মত এবারও লজ্জায় মাথা নামিয়েছে। ভিতু কুকুরটা গাছের গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে পড়ল। ভিজবে আজীবন।

ঝিনুক আদালতকক্ষের সামনে ভিড়-ঠাসা ছোট্ট করিডরে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে মানস আর ছোটন। তাদের খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে পলাশ। পলাশ বেশ সচেতনভাবেই অন্যমনস্ক। তার সুনিয়ন্ত্রিত চোখকে সে কিছুতেই ঝিনুকের চোখে পড়তে দিচ্ছে না।

ঝিনুকেরও পলাশে আগ্রহ নেই। কাল রাত থেকে তার বুকে একটানা টাইফুন বয়ে যাচ্ছে। তূণীরের ভালবাসা টিকিয়ে রাখতে গেলে অলিখিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে ঝিনুককে ! ব্যক্তিগত সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে প্রতিটি পুরুষই হয়ে যাবে দুঃশাসন বা রামচন্দ্র ! কেউ প্রকাশ্যে নারীকে বিবস্ত্র করতে চাইবে ! অথবা প্রেমিকের ছদ্মবেশে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলবে প্রিয়তমা নারীকে ! যেন নারী শুধুই তার অধিকারের পণ্যসামগ্রী ! প্রিয়তমা থাকতে হলে নারীকে অর্পণ করতে হবে নমনীয় দাস্য ! তবেই অটুট থাকবে নারী-পুরুষের প্রেমের বন্ধন ! প্রেমও এত নিষ্ঠুর !

—এই দিদি, শরীর খারাপ লাগছে নাকি ? জল খাবি ?

একটি নিদ্রাহীন রাত ঝিনুকের চোখের কোলে ঘন কালি লেপে দিয়েছে। ভাইকে তার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, কতটা জল খেলে হৃদয় শীতল হয় রে ? নির্জীব ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল,—দরকার নেই।

মানস বলল,—এই ঝিনুক, কোর্টে তোর নাম ডাকছে। চল।

কোর্টঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকেছে ঝিনুক। রমিতা দুজন

ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। তীব্র যন্ত্রণায় তার ফর্সা মুখ কালচে নীল। করুণ অসহায় দৃষ্টি ঝিনুকের ওপর নিবদ্ধ। —

ঝিনুকের শিথিল স্নায়ু সঙ্গে সঙ্গে টান টান। নিজেকে ফিরে পাচ্ছে।

দৃঢ় পায়ে কাঠগড়ায় উঠল ঝিনুক। তার চোখ মুখ বেশ উদ্দীপিত। কণ্ঠে জড়তা নেই। তাকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, কয়েক মিনিট আগে এই মেয়ের বুকের ভিতর উথালপাথাল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সরকারি উকিলের প্রশ্নের জবাবে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে গেল সেদিনের দৃশ্য। বিভিন্ন ক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রতিটি ছেলেকে আলাদা-আলাদাভাবে শনাক্ত করল। রবীন দত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসার পর উঠে দাঁড়িয়েছে ডিফেন্স লইয়ার। ভদ্রলোক মানসের সমবয়সী প্রায়। বড়ই হবে, ছোট নয়। থলথলে চর্বিওয়ালা মুখ। মুখে মধুর হাসি লেগে আছে। চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

স্নেহমাখা কণ্ঠে কথা শুরু করল ভদ্রলোক,—আচ্ছা মা, ঠিক কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল বললেন ?

ঝিনুক আবার সময়টা বলল,—রাত নটা নাগাদ।

—আপনি কি মা তক্ষুনি ওখানে পৌঁছেছিলেন ? না আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিলেন ?

—ট্রেন থেকে নেমে ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলাম।

—তার মানে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার আগে ট্রেন থেকে নামেননি ?

—না।

—আপনি নিশ্চয়ই একাই ছিলেন ?

—একা না থাকলে আরও কেউ তো আমার সঙ্গে থানায় যেতই।

—এককথায় উত্তর দিন মা। একা ছিলেন তো ?

—একাই ছিলাম।

—আপনি কি প্রায়শই একা একা রাত করে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে নামেন ?

রবীন দত্ত ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে,—অবজেকশান ইওর অনার। এ প্রশ্নের সঙ্গে কেসের কোনও সম্পর্ক নেই।

—অবজেকশান সাসটেনড। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন মিস্টার মল্লিক।

ভদ্রলোকের মুখে অমায়িক হাসি,—ঠিক আছে স্যার। ...আচ্ছা মা,

আপনি শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কি রাস্তাঘাটে একা একাই ঘোরাফেরা করেন ?

—একাও থাকি। কখনও কখনও বন্ধুরা থাকে। আত্মীয়স্বজনও থাকে।

—বন্ধু মানে শুধুই মেয়ে বন্ধু ? না আপনার পুরুষবন্ধুও আছে ?

—আমার সব রকম বন্ধুই আছে।

—পুরুষবন্ধু বেশি ? না মেয়েবন্ধু বেশি ?

—গুনিনি।

—কাইন্ডলি নোট ডাউন ইওর অনার, শ্রীমতী সরকার তাঁর পুরুষবন্ধুর সংখ্যা ঠিক গুনে উঠতে পারেন না।

রবীন দত্ত আবার দাঁড়াল,—স্যার আমি বুঝে উঠতে পারছি না, বর্তমান কেসের সঙ্গে এসব প্রশ্নেরই বা কি সম্পর্ক আছে !

ডিফেন্স লইয়ার চাপাগলায় বলল,—বুঝবে। এক্ষুনি বুঝবে। বলেই ঝিনুকের দিকে ঘুরেছে,—আচ্ছা মা, আপনি তো রাস্তাঘাটে একাই ঘোরেন, আপনার সঙ্গে কেউ নিশ্চয়ই এ ধরনের কুকাজ করার চেষ্টা করেনি ?

ঝিনুকের ভুরু জড়ো হল,—করলে তো আপনার সঙ্গে আগেই কোর্টে দেখা হত।

ঘর জুড়ে মৃদু হাস্যরোল। ডিফেন্স লইয়ারও মজা পেয়ে হাসছে,—বাহ, বেশ বুদ্ধিমতীর মত উত্তর। আচ্ছা মা, আপনি বললেন টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন দিয়ে আপনি মাঝে মাঝেই ফেরেন। ওখানে আপনি কখনও অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়েছেন ?

—না।

—একা থাকলে ?

—না।

—রাত বেশি হয়ে গেলে ?

—না।

—চত্বরে ঘোরাফেরা করতে হলে ?

—বলছি তো না। আপনি একই প্রশ্ন বারবার করছেন কেন ? আমি ওখানে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি, কোনও দিন কিছু হয়নি।

ঝিনুকের ধৈর্যচ্যুতিতে ডিফেন্স লইয়ার বেশ প্রসন্ন,—স্যার নোট করবেন, উনি মাঝে মাঝেই টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে একা একা ঘোরাফেরা করেন। রাতেও। আধ ঘণ্টা ধরেও ঘুরতে হয় কখনও কখনও।

—আমি আপত্তি জানাচ্ছি স্যার। ডিফেন্স আমার সাক্ষীর সম্পর্কে অশোভন ইঙ্গিত করছেন।

—অশোভন ইঙ্গিত কোথায় করলাম? উনি যা বললেন সেটাই স্যারকে নোট করতে বললাম।

—অবজেকশান ওভাররুলড। প্লিজ কনটিনিউ।

—তা মা, ঠিক কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছে বললেন যেন?

—বললাম তো রাত নটা নাগাদ।

—আপনার হাতে ঘড়ি ছিল না?

—ছিল। তবে ঘটনাটার সময়ে আমি ঘড়ি দেখিনি।

—তার মানে টাইমটা আন্দাজে বলছেন, তাই তো?

—আন্দাজ কেন হবে? আমরা ওখান থেকে থানায় গেছি কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পর। তখন প্রায় পৌনে দশটা।

—প্রায় কেন? তখনও ঘড়ি দেখেননি?

—দেখেছিলাম। ঠিক টাইম মনে নেই। এফ আই আর-এ সময় লেখা আছে।

—গুড। তা আপনি অত রাত্তিরে মেট্রো করে কোথা থেকে ফিরছিলেন?

—এগেন অবজেকশান ইওর অনার। উনি বার বার অত রাত্তির বলছেন কেন? কলকাতা শহরে রাত নটা এমন কিছু রাত নয়। বিশেষ করে গরমকালে।

—স্যার, আমার লার্নেড পাবলিক প্রসেকিউটর যদি এভাবে প্রতিটি কথায় বাধা দেন, তবে তো প্রশ্নই করা যায় না। রাত্তিরকে রাত্তির বলা যাবে না, এতো অদ্ভুত কথা! ঠিক আছে, অত রাত্তির কথাটা বাদ দিলাম। আপনি বলুন আপনি রাত নটার সময় কোথা থেকে ফিরছিলেন?

—ভবানীপুরের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।

—বন্ধু? না বান্ধবী?

—বান্ধবী।

—তা মা, আপনার বান্ধবীর বাড়ি থেকে মেট্রো স্টেশন কাছে, না বাসস্টপ কাছে?

—দুটোই।

—বেশ। আপনার বাড়ি তো বললেন চণ্ডীতলায়, ওখান অবধি তো ভবানীপুর থেকে বাস যায়?

—যায়।

—মেট্রোতে গেলে, আপনাকে ওখান থেকে কিভাবে ফিরতে হয় ?

—টালিগঞ্জে নেমে সাধারণত রিকশা ধরে নিই। মাঝে মাঝে হাঁটি।

—তা হলে দেখা যাচ্ছে, বাসে গেলে আপনি সোজাসুজি চণ্ডীতলায় পৌঁছতে পারেন। মেট্রোতে গেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয়, টিকিট কাটতে হয়। আবার নিচে নামতে হয়, তারপর টালিগঞ্জে পৌঁছে রিকশা। তাই তো ? আচ্ছা মা, আপনি বান্ধবীর বাড়ির থেকে কটার সময় বেরিয়েছিলেন ?

ঝিনুক দু-এক মুহূর্ত ভাবল। আটটা কুড়ি ? সাড়ে আটটা ? কটা বলবে ? মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—সাড়ে আটটাই হবে।

—এটাও আন্দাজ ? ভাল। আপনি দেখছি সবই আন্দাজে আন্দাজে বলেন। আচ্ছা, এটা ঠিক করে বলুন তো, ওই সময় বাসে ভিড় থাকে কিনা।

—তেমন থাকে না।

—বাসে ফিরতে আপনার সুবিধা বেশি, খরচও কম। তবু আপনি অত কষ্ট করে মেট্রোতে ফিরে ঠিক নটায় ওই চত্বরে হাজির রইলেন ! এটা কি আপনার একটু কাকতালীয় মনে হয় না, মা ?

ঝিনুক প্রশ্নটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উঠতে পারল না। উত্তর কী দেবে সেটাও।

ডিফেন্স লইয়ার বলল,—উত্তরটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না তো ? আমিই বলে দিচ্ছি। আপনার সেদিন ওখানে উপস্থিত থাকাটা মোটেই কাকতালীয় নয়। এই কেসে অভিযুক্তদের বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যেই ও রকম একটা সাজানো ঘটনার আপনার দরকার ছিল। আমি কি ভুল বলছি, মা ?

ঝিনুক সজোরে মাথা নাড়ল,—একদম বাজে কথা। আমি ওদের চিনি না, জানি না, কেন মিছিমিছি ওদের বিপদে ফেলতে যাব ?

—চেনেন না, জানেন না, অথচ নিখুঁতভাবে শনাক্ত করে ফেললেন ? একবার দেখেই ?

—আমি ওদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম।

—কত কাছ থেকে ? ভিক্টিম যত কাছ থেকে দেখেছিলেন, তার থেকেও ?

—অতটা না হলেও...একদমই কাছে ছিলাম।

—আচ্ছা মা, ওই জায়গায় রাত্রিবেলা আলো কিরকম থাকে ?

—ভালই থাকে।

—যখন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি চলে, তখনও কি যথেষ্ট আলোকিত থাকে ?

—থাকে।

—কিন্তু আপনি যাঁর শ্লীলতা রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তিনি বা তাঁর স্বামী, যিনি সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে অকুস্থলে ছিলেন, তাঁরা বলছেন, ঝড়বৃষ্টিতে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা কি মিথ্যে বলছেন ?

—ওঁরা সত্যি বলতে ভয় পাচ্ছেন।

—আপনাকে ওঁরা বলেছেন নাকি ওঁরা ভয় পাচ্ছেন ?

—আমি অনুমান করছি।

—বাহ্, আপনি দেখছি শুধু সাহসীই নন, আপনার অনুমানশক্তিও অত্যন্ত প্রখর। অনুমান ! আন্দাজ ! প্রায় ! নাগাদ ! স্যার কাইন্ডলি নোট করুন, উনি কোন কিছুই স্পেসিফিক বলতে পারেন না। শুধু অনুমানশক্তির ওপর ভর করেই উনি সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। ...আচ্ছা মা, এই যে চার যুবক এখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, যাদের আপনি একবার দেখেই অনুমান-ক্ষমতা দিয়ে শনাক্ত করে ফেললেন, ঘটনার দিন এদের পোশাকআশাক কেমন ছিল আপনার মনে আছে ?

—একজন কালো টি-শার্ট পরা ছিল, একজন ব্যাগিশার্ট...

—কোন জন কালো টি-শার্ট পরা ছিল ?

ঝিনুক বিভ্রান্ত বোধ করছিল। কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। রোগাটাই তো কালো টি-শার্ট পরে ছিল ? নাকি ফর্সাটা ? নিজেকে ঝিনুক শক্ত করল আপ্রাণ। নার্ভাস ভাবটা কাটাতে চাইল,—ওদের আমি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলাম। উত্তেজনার মাথায় কে কী পোশাক পরে ছিল, সঠিক মনে রাখা সম্ভব নয়।

—এই তো মা আপনার অনুমানশক্তি কমেছে কিছুটা ! আচ্ছা, এদের তো নয় কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলেন, শ্রীমতী রমিতা চৌধুরী পলাশ চৌধুরীকে তো অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন, তাঁরা কী পোশাক পরেছিলেন মনে আছে ?

—পলাশবাবু প্যান্ট শার্ট। রমিতা চৌধুরী শাড়ি।

—কী রঙের শাড়ি ?

—সম্ভবত সাউথ ইন্ডিয়ান শাড়ি। টিয়া রঙের।

—আবার সম্ভব ? আর পলাশবাবু ?

—মনে নেই।

—আশ্চর্য! অতক্ষণ ওদের সঙ্গে রইলেন, উদ্যোগী হয়ে থানায় নিয়ে গেলেন, পলাশবাবুর শার্টের রঙ খেয়াল রইল না, অথচ ওদের একজনের টি-শার্টের রঙ কালো ছিল, সেটা আপনার মনে রয়ে গেল?

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—যদি পূর্বে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে থাকে, তবে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য চারটে নিরপরাধ ছেলেকে অভিযুক্ত করতে চাইলে আরও বেশি স্বাভাবিক।

—কখখনো না। ওরা রমিতা চৌধুরীকে টানাটানি করছিল, অসভ্য আচরণ করছিল, মোটর সাইকেলে পর্যন্ত তুলতে যাচ্ছিল...

—আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, মা। আমি তো একবারও বলিনি, রমিতা চৌধুরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়নি। তবে তারা এরা নয়। হলে ভিক্টিম নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন। আপনার আগেই।

—ভিক্টিম কী বলেছে আমি জানি না। আমি যা দেখেছি, তাই কোর্টকে জানাতে এসেছি। এদের একজনের মোটরসাইকেলও ওখানে পাওয়া গেছে।

—বৃষ্টির সময় তো আরও অনেক মোটরসাইকেল স্কুটার ওখানে ছিল। ছিল না?

—এই ছেলেটি যে মোটর সাইকেলটা ফেলে পালিয়েছিল, তার নম্বর আমি পুলিশকে দিয়েছিলাম।

—বা বলা যায় আপনি একটা মোটরসাইকেলের নম্বর দিয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে দেখা গেছে সেটার মালিক ওই ছেলেটি। এতে কিছু প্রমাণ হয় না। হয়তো ছেলেটি ওখানে মোটরসাইকেল ফেলে রেখে গেছিল। হয়তো আপনিও ওই মোটরসাইকেলেই এসেছিলেন...হয়তো আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেই ছেলেটি চলে গেছে...না না মা, চোখ মুখ লাল করবেন না, আপনার যেমন অনুমান, আমারও তেমন অনুমান।...আচ্ছা, আপনিও তো একজন যুবতী নারী, ওইখানে ওই পরিস্থিতিতে যারা রমিতা চৌধুরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল, তারা আপনাকে কিছু করেনি?

—ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল, চোয়ালে ঘুষি মেরেছিল, হাত মুচড়ে ধরেছিল...

—আর কিছু?

—খারাপ গালাগাল দিচ্ছিল।

—আর কিছু? কোনও গোপন অঙ্গে হাত ফাত দেওয়া...মানে আপনিও তো নারী...

—না।

—আপনার ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল, সেটার জন্য আলাদা ডায়েরি করেছিলেন?

—না।

—আপনার ওপর হামলা হল, তাই নিয়ে আপনি ডায়েরি করলেন না, অথচ অন্যের শ্লীলতাহানি নিয়ে ডায়েরি করাতে উদ্যোগী হয়ে পড়লেন!

—কোনও মেয়ের ওপর শারীরিক আক্রমণ আর কোনও মেয়ের ওপর...মানে তাকে অপমান করা...মানে তাকে...ঝিনুক কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছিল না। কান মাথা ঝাঁঝাঁ করতে শুরু করেছে তার।

রবীন দত্ত ঝিনুককে সাহায্য করতে উঠে দাঁড়াল,—স্যার উনি বলতে চাইছেন, মেয়েদের ওপর ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট আর সেক্সুচুয়াল অ্যাসল্ট এক নয়। সেক্সুচুয়াল অ্যাসল্ট ইজ মোর অফেনসিভ...

—বুঝেছি। বুঝেছি। আপনাকে লিড করতে হবে না। ডিফেন্স লইয়ার এতক্ষণে সামান্য গলা উঠিয়েছে,—তা ফিজিকাল অ্যাসল্টটা কি চার্জশিটে রাখা হয়েছে? আন্ডার সেকশান থ্রি ফিফটিফাইভ?

—নো।

—ব্যাস। আমার যা জানার, জানা হয়ে গেছে। শুধু একটা শেষ প্রশ্ন মা, তেরোই মে রাত নটার সময় মেট্রো রেল চত্বরে শুধু কি আপনারা তিনজনই ছিলেন? আপনি, রমিতা চৌধুরী আর পলাশ চৌধুরী?

—না, আরও অনেক লোক ছিল।

—কিন্তু আমি তো সরকারপক্ষের আর কোন সাক্ষী দেখছি না! আর কেউ থানায় গেল না, শুধু আপনিই গেলেন?

—হ্যাঁ, আর সকলে মজা দেখছিল। ভিতুর মত পালিয়ে গিয়েছিল।

—এগুলোও আপনার অনুমান। ব্যাস, আমার কাজ শেষ। ভদ্রলোক ঝিনুকের সামনে থেকে সরে এজলাসের দিকে এগোল,—স্যার, আমি মাননীয় আদালতকে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতে বলছি। এক, সাক্ষীর সব তথ্য অনুমানভিত্তিক। একটি

প্রশ্নের উত্তরও তিনি সঠিক নিশ্চয়তার সঙ্গে দিতে পারেননি। দুই, এঁর অসংখ্য পুরুষবন্ধু আছে। মেট্রো রেল চত্বরেও এঁর একা একা ঘোরাফেরা করার অভ্যাস আছে। অতএব এঁর সাক্ষী নথিবদ্ধ করার সময় এঁর চরিত্র সম্পর্কেও চিন্তাভাবনার অবকাশ থেকে যায়। তিন, ভিক্টিম বা ভিক্টিমের স্বামী পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন অত কাছ থেকে দেখেও, কাঠগড়ায় যারা আছে, তাদের সঙ্গে সেদিনের অপরাধীদের তাঁরা মেলাতে পারছেন না। চার, ওঁর ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলাদাভাবে কোনও ডায়েরি বা মেডিকেল রিপোর্ট নেই। পাঁচ, ভিড়ের মাঝে ঘটে যাওয়া তথাকথিত শ্লীলতাহানির ঘটনায় একজন মাত্র অনুমানপ্রবণ সাক্ষী ছাড়া দ্বিতীয় সাক্ষী নেই। সেই সাক্ষীও এমন, যিনি বাসে করে সরাসরি বাড়ি না ফিরে, অনেক বেশি কাঠখড় পুড়িয়ে মেট্রোস্টেশন চত্বরে দাঁড়িয়ে রইলেন এই ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্যই।

ম্যাজিস্ট্রেট কলম বন্ধ করেছেন,—এ সব যা বলার আরগুমেন্টস-এর সময়ে বলবেন। এই সাক্ষীকে আরও কি আপনার ক্রস করার প্রয়োজন আছে?

—আপাতত নেই। বাট আই রিজার্ভ দা রাইট স্যার টু ক্রস হার এগেন।

ম্যাজিস্ট্রেট রবীনবাবুর দিকে ফিরলেন,—আপনি কি আগের দুজন সাক্ষীকে হসটাইল ডিক্লেয়ার করতে চান?

—অবশ্যই স্যার। রবীন দত্ত হতাশ,—তবে আমার মনে হয় ওদের ফারদার ক্রস করে কোনও লাভ হবে না।

ঝিনুক কাঠগড়া থেকে নেমে এল। কেসের তারিখ আবার সামনের সপ্তাহে। নিজের জবানবন্দীর নিচে স্বাক্ষর করে ঝিনুক যখন আদালত থেকে বেরিয়ে এল, তখন সে রীতিমত টলছে। ছোটন কোথা থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল এনে ধরল তার সামনে। এক নিশ্বাসে জল শেষ।

মানস বিধ্বস্ত মেয়ের কাঁধে হাত রাখল। ছোটনকে বলল,—তুই এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধর। আমরা আস্তে আস্তে আসছি।

আকাশে আজ আবার ঘন মেঘের আবরণ। বেশ কয়েকদিন পর বৃষ্টির সংকেত পেয়ে চিলেরা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে নিচে। পৃথিবীর দিকে।

ছোটন কোর্টপ্রাঙ্গণে ট্যাক্সি পেয়ে গেছে,—বাবা এই দিকে, এই দিকে।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক সহসা ঝিনুকের পথ রোধ করে দাঁড়াল,—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে চেনো না। আমি রমিতার বাবা।

ঝিনুক ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

মানস বলল,—ওর শরীরটা আজ ভাল নেই। আপনি যদি পরে...

ঝিনুক বাবাকে থামাল,—আপনি বলুন কী বলবেন। আমি ঠিক আছি।

গ্রিক ভাস্কর্যের মত শরীর নুয়ে পড়েছে,—আমার মেয়েটা পারল না। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, ও সত্যি কথাই বলতে চেয়েছিল। এই ক'মাস ধরে নিজের সঙ্গে লড়াইও করেছে খুব।

ঝিনুক শান্ত স্বরে বলল,—ইচ্ছে থাকলে না বলতে পারার তো কোনও কারণ নেই!

—হয় না মা। এত দায়। এত বন্ধন। একবার ভেবেছিলাম, মেয়েটাকে চিরকালের মত ও বাড়ি থেকে নিয়ে চলে আসব। স্বামী শ্বশুরবাড়ি সব চুলোয় যাক। পারলাম না। মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসে গেছে। মেয়ে হয়ে জন্মে...ও যে তোমাকে কী চোখে দ্যাখে...! একটু মনে বল আনার জন্য, একটু তোমার গলা শোনার জন্য কতবার যে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিফোন করেছে! একটি বারও কথা বলতে পারেনি। কত বার বুঝিয়েছি, কথা বল। তোর প্রবলেমটা খুলে বল।

মানস বিমূঢ়,—আপনার মেয়ে! টেলিফোনটা আপনার মেয়ে করত! কথা না বলে কেটে দিত কেন!

—সংকোচে। আত্মধিক্কারে। তপনের গলা ভেঙে এল,—এত ভিতু আমার মেয়েটা! হয়তো আমারই দোষ। ছোট থেকে সেভাবে গড়তে পারিনি। তা ছাড়া মা, সবাই তো সব পারেও না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দরকার, তা তোমারই আছে। আমার মেয়ের নেই। প্রার্থনা করি আমার মেয়ে যেন কোর্টে মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হয়। আমার মেয়ে হারুক। তুমি অন্তত জয়ী হও।

এ কি আশীর্বাদ? না অভিশাপ? ঝিনুক চাতকীর মত আকাশের দিকে তাকাল। চিলেদের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হচ্ছে। আরও ছোট। এখনও বৃষ্টি নামল না কেন?

ষোলো

মৃণালিনী বুঝি ঝিনুকের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। শান্তিপারাবারের পশ্চিম বারান্দায়। কেমন যেন অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। লোলিত শরীর ইজিচেয়ারে শয়ান। মুখের প্রতিটি বলিরেখা বড় বেশি প্রকট। ঝিনুককে একবার দেখে নিয়েই দু চোখ আবার নিমীলিত। স্খলিত স্বরে ডাকলেন,—আয়।

ঝিনুক নিঃশব্দে তাঁর পায়ের কাছে বসল।

মৃণালিনী চোখ বুজেই বললেন,—নিচে কেন? পাশে উঠে বোস।

ঝিনুক নড়ল না। আলতো হাতে মৃণালিনীর হাঁটু ছুঁয়ে আছে। এই স্পর্শটুকুর জন্যই না বার বার ছুটে আসা! এই পশ্চিমের বারান্দায়!

শেষ দুপুরের বাতাসে নবীন হেমন্তের ঘ্রাণ। আজ ষষ্ঠী। দেবীর বোধন। পুজো এ বার দেরিতে এসেছে। নির্মেঘ আকাশ তকতকে নীল। চূড়ান্ত পরাজয়ের পর বর্ষা পালিয়েছে শেষ পর্যন্ত। মেঘের পল্টন নিয়ে। এই মাত্র কদিন আগে। হা হা করে গলা ফাটিয়ে জয়ের হাসি হাসছে হলুদ রোদ্দুর। পুজোমণ্ডপের ঢাকে ঢাকে সেই হাসির প্রতিধ্বনি।

ঝিনুকও হেরে গেল। মামলা কফিনে ঢুকে পড়েছে। ছুটির পর ম্যাজিস্ট্রেট শেষ পেরেকটা মারবেন।

মৃণালিনী নাতনির মাথায় হাত রাখলেন,—বচ্ছরকার দিনে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? তোর জন্য ক্ষীরের চপ আনিয়ে রেখেছি। চল, ঘরে চল।

—না, মিষ্টি খাব না। মুখে একদম স্বাদ নেই।

—জ্বর তো কবে ছেড়েছে! এখনও রুচি ফিরল না?

ঝিনুক লম্বা শ্বাস ফেলল। রুচি কি শুধু জিভেই থাকে!

—ঝালঝাল কিছু খাবি? সিঙাড়া আনাব?

—থাক, ভাল্লাগছে না। বাবলগামও খাচ্ছি না কদিন।

সত্যিই জ্বরটা একেবারে দুরমুশ করে দিয়ে গেছে ঝিনুককে। শেষ দিন সাক্ষ্য দিয়ে ফেরার পর থেকেই হাই টেম্পারেচার। আগের দিন জেরার সময়ই শরীরের ক্ষয়টা সিগনাল দিতে শুরু করেছিল। তৃতীয় দিন মাথা উঁচু করে কাঠগড়া থেকে নামতেই তপ্ত বিদ্রোহ। সাত দিন ধরে শরীর জুড়ে ভাইরাসের তুমুল দাপাদাপি। রাত বাড়লেই চড়চড়

করে একশো তিন, একশো চার, একশো পাঁচ। দিনের বেলা অসহ্য ব্যথায় মস্তিষ্ক বিবশ। সর্বক্ষণ শুধু মড়ার মতো পড়ে থাকা। মহালয়ার আগের দিন জ্বর ছাড়লেও আছাড় খেয়ে পড়েছে ঝিনুক। এখনও কাহিল বড়। জিভও সযুত হল না পুরোপুরি।

যে জন্য আসা, সেই কথাটা তুলল ঝিনুক,—তুমি তা হলে সত্যিই রামরামপুরে চললে ?

—তুই কি চাস না আমি যাই ? অকম্মার ঢেঁকি হয়ে এই কয়েদখানায় পড়ে থাকি বাকি জীবনটা ?

ঝিনুকের চাওয়াতে কার কী এসে যায় এই ভূমণ্ডলে ? অন্তর দিয়ে চাইলেও বা ঝিনুক পাবে কেন ? চাওয়া শব্দটাই যে বড় স্বার্থপর। বিভ্রান্তিকর। ঝিনুকের বুক আরও ভারী হয়ে গেল,—মন স্থির যখন করেই ফেলেছ, আমার চাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন ? একটা কথা শুধু বলতে পারি, এ কয়েদখানা তুমি নিজেই বেছে নিয়েছিলে।

—দুর বোকা মেয়ে, আমাদের তো সবটাই কয়েদখানা। শুধু জেলার-টা বদলে যায়। কখনও বাবা। কখনও বর। কখনও ছেলে। কখনও বা এই পাঁচিলঘেরা বাড়ি। সংসারকয়েদে শেকলের গায়ে স্নেহ প্রেম ভালবাসার একটা মোড়ক থাকে। মোড়কটা খসে পড়লে এই গারদখানার থেকে ওই গারদখানা আরও ভয়ংকর। দেখি না, নতুন জায়গায় গিয়ে বুক ভরে খানিক বাতাস নিতে পারি কিনা।

—কবে রওনা দিচ্ছ ? বাবা বলছিল পুজোর পর পরই নাকি চলে যাওয়ার প্ল্যান করেছ ?

—প্রথমে সে রকমই ভেবেছিলাম। ব্যাংকের কিছু কাজ রয়ে গেছে। এখানকার ফিক্সড ডিপোজিটটাও তুলতে হবে। নোটিস দিলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। ও দিকে একা হাতে সব সামাল দিতে গিয়ে শরৎটার যা ল্যাজেগোবরে অবস্থা !

ঝিনুক সব বুঝেও অবুঝ হয়ে যাচ্ছিল। তার একমাত্র শান্তির আশ্রয়টাকে কেড়ে নিচ্ছে শরৎ ঘোষাল। রাগ রাগ মুখে বলল,—ঠেলা বুঝুক। আশ্রম প্রতিষ্ঠান গড়বে, একটুও নাজেহাল হবে না, সে কি হয় ?

মৃণালিনী নাতনির বিরাগটা ঠিক ধরতে পারলেন না। বললেন,—তা তো বটেই। সেইজন্যই তো এখনই ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। শুনেছিস তো, এর মধ্যেই দুটো বরে খেদানো বউ আর একটা অনাথ বাচ্চা জুটে গেছে ?

—শুনেছি। ঝিনুক উদাস উত্তর দিল,—শরৎবাবু বাড়িতে

এসেছিলেন।

মৃণালিনী বললেন,—তুই তো বলেছিলি ওকে সাহায্য করবি। যা না, এর মধ্যে একদিন ঘুরে আয় না রামরামপুর থেকে। ভাল লাগবে।

ঝিনুক রা কাড়ল না। তার ভাল লাগা মন্দ লাগার অনুভূতিগুলো কেমন ভোঁতা মেরে গেছে।

—কিরে যাবি? যদি বলিস তো শরৎকে বলে দিই। তোকে বাড়ির থেকে নিয়ে যাবে। লক্ষ্মীপুজোর আগেই ঘুরে আয়। এরপর তো হাজার কাজে আটকা পড়ে যাবি। বিয়ের বাজার বলে কথা। শাড়ি-কেনা আছে, গয়না গড়ানো আছে...

—বাবলির বিয়ে তো মাঘের শেষে? এত তাড়াতাড়ি বাজার করে কি হবে? পিসিমণিও তো আসছে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে?

—বাবলির বিয়ে কেন! তোর মা যে বলে গেল তোর বিয়ে!

—আমার বিয়ে! এক্ষুনি সূর্য আকাশ থেকে খসে শান্তিপারাবারের বারান্দায় গড়াগড়ি খেলেও এত চমকাত না ঝিনুক। স্তম্ভিত স্বর ছিটকে ছিটকে গেল,—কবে বিয়ে! কার সঙ্গে বিয়ে!

—তোর বাবা মা তো বলে গেল, দিনও ঠিক হয়ে গেছে! আঠেরোই অঘ্রান! তোর পিসিদেরও সেই মতো আসতে লিখে দিয়েছে! মৃণালিনী নিরীক্ষণ করছেন ঝিনুককে,—কেন তুই জানিস না! নাকি আমার সঙ্গে হেঁয়ালি হচ্ছে!

ঝিনুকের স্নায়ুতন্ত্র ছিলে-পরানো ধনুকের মতো টান টান। মাথার ঠিক মাঝখানে একটা শিরা দপদপ লাফাতে শুরু করেছে। নিশিত চোখ মৃণালিনীর দিকে অপলক,—আমি তোমার সঙ্গে কোনদিন হেঁয়ালি করিনি ঠাম্মা। কখনও না। তুমি একটু ঝেড়ে কাশো তো, শুনি, কী নতুন ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছে আমার এগেনস্টে?

—সত্যিই তুই জানিস না!

—বলছি তো না। না। না। না। না। না।

মৃণালিনী উঠে বারান্দার দূর প্রান্তে চলে গেলেন। তাঁর আশঙ্কাটাই তবে সত্যি হতে চলেছে! এই জন্যই সুজাতা তাঁর হাত ধরে এত কাকুতি মিনতি করে গেল! মা আপনি যখন যাবেনই ঠিক করেছেন, মেয়েটার বিয়ে অবধি অন্তত থেকে যান! ঝিনুককে যদি কিছু বোঝানোর দরকার হয়... আপনি ছাড়া...ও আপনাকেই যা মানে...!

শান্তিপারাবার আজ ফাঁকা ফাঁকা। পুজোর দিনে কোন কোন দয়ালু সন্তান ঘরে নিয়ে গেছে মা মাসিকে। প্রভাঠাম্মা নতুন থান

পরে নিশ্চুপ তাকিয়ে আছেন পথের দিকে। ঝাঁকড়া আমগাছের আড়ালে বসে কুবো পাখি ডেকে চলেছে একটানা। এক জোড়া সেপাই-বুলবুল নাচছে পিড়িক পিড়িক। সামনের পিচরাস্তা কাঁপিয়ে দুর্দম গতিময় দুটো ট্রাক পর পর ছুটে গেল। জলস্থল কাঁপানো যান্ত্রিক গর্জনে হারিয়ে গেছে পাখির ডাক। দু-এক মিনিট পর ডাকটা ফিরল। কুব কুব কুব কুব।

মৃণালিনী অস্থির পায়ে ঝিনুকের কাছে ফিরলেন,—ছেলেটা নাকি খুব ভেঙে পড়েছে। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। যে চাকরিটা করত, সেটা শুনলাম ছেড়ে দিয়েছে। তোর জন্য। নতুন কোথায় ইন্টারভিউ দিয়েছে, নভেম্বর থেকে বোধহয় জয়েন করবে। তূণীরের দিদি-জামাইবাবুই নাকি বলে গেছে এ সব কথা।

ঝিনুক স্বগতোক্তি করল,—কবে হল এ সব ?

মৃণালিনী বললেন,—অত দিনক্ষণ বলতে পারব না। তোর জ্বরের সময়ই বোধহয়। মণ্টু সুজাতাও তো গিয়েছিল ছেলেটার বাড়িতে !

ঝিনুক মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। কবে এসেছিল তনিমাদি-বিজনদা ? মনে পড়ছে না। অসুখের সাতটা দিন এখনও কেমন ঝাপসা ঘোরে ডুবে আছে। মাঝনিশীথের তারার মতো এক-একটা দিন যদি বা এক মুহূর্ত দেখা দেয় তো পর মুহূর্তে হারিয়ে যায় ঘন তমিস্রায়। স্কুল ঝেঁটিয়ে অনেকে এসেছিল মনে আছে। মাধুরীদি গীতালিআন্টি দীপিকাদি লেখাদি। মাধুরীদি তার ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গেল। মাধুরীদি নিল, না গীতালিআন্টি ? গুলিয়ে যাচ্ছে। বিশাখা মৈনাক আর সুলগ্নাও তো একদিন...স্মৃতির গলি হাতড়াচ্ছে ঝিনুক। কাকামনি কাকিমা এসেছিল। রুমকি। মামা মামিরা। আর কে এসেছিল ? ঠাম্মা। শরৎ ঘোষাল। বাবুয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ তনিমাদিও তো মাথার কাছে একদিন বসেছিল অনেকক্ষণ। বিজনদা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। সেদিনই কি... ?

পাঁচ মাসের ম্যারাথন দৌড় সাঙ্গ করে মুখ থুবড়ে বিছানায় পড়ে আছে ঝিনুক। শেষ ফিতেটা ছুঁয়ে। প্রশস্ত রাজপথ থেকে তাকে বার বার ঠেলে দেওয়া হয়েছে কাঁটাগুল্ম ঝোপঝাড় আর বিষাক্ত লতায় আকীর্ণ দুরূহ পথে। ফুসফুসের বায়ু নিঃশেষ। স্টেডিয়ামে একটি লোকও হাততালি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নেই। সম্পূর্ণ শূন্য মস্তিষ্কে জ্বরে ছটফট করছে ঝিনুক। আর ঠিক তখনই তার পাশের ঘরে মিটিং চলেছে ! ঝিনুকের সোনালি ভবিষ্যৎ নিয়ে !

শরীর ভেঙে আসছে ঝিনুকের। টাটকা ক্ষত থেকে গলগল

পুঁজরক্ত বেরিয়ে এল। মাগো কী যন্ত্রণা!

মৃণালিনী নাতনির মাথায় হাত রেখেছেন,—শান্ত হ দিদি, শান্ত হ। আমার মন বলছে, ছেলেটা তোকে সত্যিই ভালবাসে।

—মিথ্যে কথা। ভালবাসলে কেউ ওভাবে অপমান করতে পারে!

—যে আচরণটাকে তুই অপমান ভাবছিস, ছেলেরা তাকে অপমান বলে মনেই করে না। মেয়েদের কিসে অপমান হয়, সে বোধ কোথায় ওদের! ওরা ওদের মতো করে ভালবাসে। নিজেদের দাপট ষোল আনা বজায় রেখে।

মৃণালিনী ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন। দীর্ঘ জীবন ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অভিমান অপমান তাঁর জীর্ণ হাড়ের খাঁচাটাকে ঝাঁকিয়ে চলেছে। কত কথা শোনাবেন তিনি তাঁর আদরের নাতনিকে? এক সন্ধ্যায় সব কথা শেষ হবে কি?

মৃণালিনীর গলা কাঁপছে,—অন্যদের কথা আর কী বলব, আমার কথাই শোন। তোর দাদু বিয়ের সময় এক কাঁড়ি টাকা নিয়েছিল আমার বাবার কাছ থেকে। আমাকে বিয়ে করার জন্য! দাবী! তার জন্য সারা জীবনে তার একবারও কি মনে হয়েছে, সে আমাকে অপমান করেছিল! কত বড় অপমান! লেখাপড়ায় আমি খারাপ ছিলাম না, বাবা তবু ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক মুখে মুখে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। শ্বশুরবাড়িতে এসে তোর দাদুকে ধরলাম, আমি পড়তে চাই। তোর দাদু তখনকার আধুনিক মানুষ। পড়তে দিল। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিলাম। আই এ-ও পাশ করলাম। কিন্তু বি এ পড়ার সময় তোর দাদু বেঁকে বসল। বলল, সংসারের ক্ষতি হচ্ছে। ছেলের যত্ন হচ্ছে না। কত কান্নাকাটি করলাম, তোর দাদু গলল না। অথচ তোর দাদুর সংসারের দোহাইটা সত্যি ছিল না। সংসারের সব কাজ সেরে মণ্টুকে কোলে নিয়ে বসে পড়াশুনো করতাম। অথবা সবাই ঘুমোলে। মাঝরাতে। তবু বাধা দিল কেন? না, তার ভয় ছিল বি এ পাশ করে আমি যদি তার সমান সমান হয়ে যাই! বলা যায় না, আমার রেজাল্ট তার থেকেও ভাল হয়ে গেলে সে মুখ দেখাবে কি করে! সেই যে আকাঙ্ক্ষাটাকে মেরে ফেলা হল, সেটা অপমান নয়? তা বলে তোর দাদু কি আমাকে ভালবাসত না? বাসত। আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারত না। তারপর দ্যাখ, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিলাম আমি। তোর শুনতে খারাপ লাগবে তবু তোকে বলি, আমি যদি বলতাম, তোর দাদু তোর বাবা কাকা পিসির বাবা নয়, তবে

চন্দ্র সূর্য তারা কেউ এসে অপ্রমাণ করতে পারত না সে কথা। আমরা মেয়েরা তা বলি না। সংসারগুলো তাই টিকে থাকে। মোদ্দা কথা ছেলেমেয়েদের মা'টাই খাঁটি, অথচ তাদের মানুষ করার ব্যাপারে মার দাবিটা বড় নয়, বাবার দাবিই আগে। তোর দাদুও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে আমার কোনও কথা গ্রাহ্য করেনি কোনদিন। সে যা ভাববে, সেটাই ঠিক। ধ্রুব। আমি ছেলেমেয়েকে কিভাবে গড়তে চাই তার কোন মূল্যই নেই। এটা অপমান নয়?

এক ঝোঁকে অনেক কথা বলে হাঁপাচ্ছেন মৃণালিনী। আবার দম নিয়ে বললেন,—আমি কিন্তু তবুও তোর দাদুকে ভালবাসতাম। ভালবাসা এমনই জিনিস...

—তুমি কি তূণীরের হয়ে ওকালতি করতে চাইছ? ঝিনুক সোজা হল,—নাকি নিজে হেরেছ বলে আমাকেও হারতে বলছ? নিজে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারোনি, তাই এখনকার একটা মেয়ে লড়াই করে জিতে যাবে, এটা মনে হয় তুমি...

—সে তুই যা ভাবিস। মৃণালিনী ঝিনুকের কথা কেড়ে নিলেন, আমাদের সময়ে তোদের সময়ে কতটা কি তফাত হয়েছে বুঝি না বাপু। হ্যাঁ, তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতে যাচ্ছিস, হিমালয়ে উঠছিস, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখছিস, চাকরি করছিস! তবু বুকে হাত দিয়ে বল তো, সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা? তার বেশি এক চুল নয়। ছেলেরা সংসারের ভেতরে আটকে থাকা জবুথবু মেয়ে আর পছন্দ করছিল না, তাই তোদের পড়াশুনো করতে দিয়েছে। ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি। বেশি দূর যেতে হবে না, তুই তোর মা মাসিদের দ্যাখ, তাদের ওপরে ঠাকুমা দিদিমাদের দ্যাখ, তা হলেই বুঝতে পারবি কিভাবে একটু একটু করে ছাড় দেওয়া হয়েছে তোদের। এখন ছেলেরা তোদের আরও খোলামেলা দেখতে চায়। তাই টিভিতে সিনেমায় বিজ্ঞাপনে তোদের খোলামেলা হয়ে নেচে বেড়াতে হচ্ছে। ছেলেদের মন খুশি রাখার জন্য। আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয় রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি। তোদের সেই মনের স্বাধীনতাটাকে ছেলেরা কখনই মানবে না। মানবেই বা কেন? আমরা সভ্য হলেও পৃথিবীতে এখনও

আদ্যিকালের নিয়মটাই চলে। যার শক্তি বেশি, তার কথাই আইন। জোরটাও তার। রমিতা চৌধুরীকে দেখে বুঝিসনি ?

পরিচিত ঠাম্মা যেন এক অচেনা রাগী যুবতী। তিল তিল বারুদের কণা স্তূপীকৃত হয়ে এক অতিকায় মারণাস্ত্র। আক্রমণের পর আক্রমণ হানছেন মৃণালিণী,—আজকের মেয়েদেরই শুধু নয়, মন মাথা মেয়েদের চিরকালই আছে। প্রতিবাদ করার সাহসও। আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল একজনই। এক নারী। গান্ধারী। দ্রৌপদীর অপমানের বিরুদ্ধেও একমাত্র সেই রুখে দাঁড়িয়েছিল। সে তার স্বামী ছেলেদেরও অভিশাপ দিতে ছাড়েনি। চোখ বাঁধা অবস্থাতেও চোখ খোলা লোকদের থেকে সে বেশি দেখতে পেয়েছিল। যদিও তাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। তার মানে কি গান্ধারী হেরে গিয়েছিল ? তার প্রতিবাদটার মূল্য নেই ?

ঝিনুক ম্লান হাসল—না গো ঠাম্মা, প্রতিবাদের দাম কোথাওই নেই। দেখলে তো, আমিও কেমন হেরে ভূত হয়ে গেলাম। ডিফেন্সের উকিল গাদা গাদা সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দিল, বজ্জাতরা তখন নাকি ওই তল্লাটেই ছিল না। যার মোটরসাইকেল পড়ে ছিল, সেও নাকি তখন চা খাচ্ছিল আধমাইল দূরে। রেষ্টুরেন্টে বসে। রেষ্টুরেন্টের মালিকও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গীতা-কোরাণ-বাইবেল ছুঁয়ে দিব্যি বলে গেল সে কথা। আর উকিলটা সারাক্ষণ আমার দিকে আঙুল তুলে বলে গেল, এই দেখুন ইওর অনার, এই একটা মিথ্যেবাদী মেয়ে। এই দেখুন ইওর অনার, এই একটা নষ্ট মেয়ে। ভদ্র ঘরে জন্মেও খদ্দের ধরার জন্য রাতবিরেতে মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। যাদের ধরতে পারে না তাদের ওপর এইভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। দিনকে পুরো রাত করে দিল ! অভিমানে গলা ভিজে গেল ঝিনুকের,—এরপরও তুমি বলবে প্রতিবাদের মূল্য আছে ?

—হাজার বার বলব। জিত তোরই হয়েছে। ক'টা মেয়ে তোর মতো শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে রে ?

ঝিনুকের বলতে ইচ্ছে হল, আমি দাঁড়িয়ে থাকিনি ঠাম্মা। দাঁড়িয়েছিল আমার স্বপ্নে দেখা মিনারের মতো খাড়া সেই নারকেল গাছ। যে গাছের কাণ্ড কুরে কুরে খেয়ে ফোঁপরা করে দিয়েছে একজন। সেই একজন, যে ছিল ঝিনুকের পরম বিশ্বাসের আধার। যার সঙ্গে লক্ষ যোজন পথ একসঙ্গে হাঁটবে ভেবেছিল ঝিনুক।

যুদ্ধের মাঝখানে লুকিয়ে শত্রুশিবিরে চলে গিয়েছিল যে। মুখে বলল,—তুমিও শরৎবাবুর মতো আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ, ঠাম্মা ? মামলাতে তো হারজিত আছেই ! ভিক্টিম হস্টাইল ! ফলস্ সাক্ষী ! তা বলে তো ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে গেল না ম্যাডাম !... না ঠাম্মা না। তোমরা আমাকে ভোলানোর চেষ্টা কোরো না।

বিকেল শেষ। চাঁদকে গোলাপি আকাশ ছেড়ে দিচ্ছে শক্তিমান সূর্য। রাতটুকুর জন্য। দূরের ঢাকের শব্দ আর মাইকের গান অনুপ্রবেশকারীর মতো ঢুকে পড়ছে নিস্তরঙ্গ বাড়িটায়।

মৃণালিনী উঠে বারান্দার আলো জ্বাললেন। দোতলায় পড়ে থাকা কয়েকটা নির্জীব শরীর ঘর থেকে বেরিয়ে একে একে নেমে যাচ্ছে একতলায়। টিভির সামনে বসে গৃহবাসের উত্তাপ নিতে। মৃণালিনী ঘরের বাতিটাও জ্বেলে এসে আবার নাতনির পাশে বসেছেন,—আমার গা ছুঁয়ে একটা সত্যি কথা বলবি দিদি ?

—বলো।

—তুই তোর তূণীরকে তো ভালবাসিস। বাসিস না ?

—হুঁ।

—ওর জন্য একদিনও তোর মনটা আনচান করেনি ? এর মধ্যে একবারও দেখতে ইচ্ছে করেনি ছেলেটাকে ?

ঝিনুক নয়, ঝিনুকের হয়ে অন্য কেউ বলে ফেলল,—করেছে।

—একবারও মনে পড়েনি, কত সুন্দর সময় তোরা একসঙ্গে কাটিয়েছিস ?

অন্য ঝিনুক চুপ। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে !

—তা হলে কেন তুই তূণীরকে বিয়ে করবি না ?

—দ্যাখো ঠাম্মা, আমি কাকে বিয়ে করব না-করব, সেটা আমার ব্যাপার। সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমরা নাক গলাবার কে ? তুমি ? মা ? বাবা ? তূণীরের দিদি জামাইবাবু ? বাড়ির লোক ? তূণীরকে আমি পছন্দ করেছিলাম ! ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটাও আমারই ছিল !

—তোর বলিস না, বল তোদের। তোদের দুজনের। তূণীর তোকে এখনও চায়।

নিঃসীম বেদনায় দুমড়ে যাচ্ছে ঝিনুকের হৃৎপিণ্ড। রাগ নয়, অভিমান নয়, প্রেম নয়, ঘৃণা নয়, এ যন্ত্রণার উৎস আরও অতলে। আরও গভীরে কোথাও। ঝিনুক হিমশীতল প্রশ্ন রাখল,—আচ্ছা

ঠাম্মা, একটা কথার উত্তর দাও তো। আমি যদি তূণীরকে অপমান করে চলে আসতাম, তার বিশ্বাস নষ্ট করে দিতাম, তারপরও কি আমি বায়না করলে তূণীর আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যেত ? পুতুল চাই বলে ?

নাতনির কথার ভঙ্গিতে মৃণালিনী হেসে ফেললেন।

—হেসো না। ধরো আমি যদি কেসটা জিতে যেতাম, তা হলেও কি তূণীর আমার কাছে আসত ? তার ইগো ঝেড়ে ফেলে ? আমি হেরেছি বলেই নিজের ইগোর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে ওর সুবিধে হয়েছে। ঝিনুক হাত মুঠো করল। প্রাণপণে মুঠি চাপছে,—আর একটা কথাও কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না ঠাম্মা। আমাকে না জানিয়ে আমারই বিয়ে ঠিক করা হয় কি করে ? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই কারুর ? তূণীর আমার জায়গায় হলে তূণীরের অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে ঠিক করতে পারত কেউ ?

মৃণালিনী উত্তর দিতে পারলেন না। উত্তর কী আছে ?

ঝিনুক বলল,—চুপ করে থেকো না। তুমিও কি আমাকে মাথা হেঁট করে জীবন কাটাতে বলছ ? সব মেনে নিয়ে ? রমিতা চৌধুরীর মতো ?

মৃণালিনী নড়ে বসলেন। নাতনিকে তিনি কী করে বলেন এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে সত্তর বছর বয়স হয়ে গেল তাঁর। নিচু গলায় বললেন,—জীবন ব্যাপারটাই বড় অদ্ভুত রে দিদি। তোকে একটা গল্প বলি শোন। ছোটবেলায় বাবা খুব বলতেন গল্পটা। এই বয়সে এসে খুব বেশি মনে পড়ে। এক ব্রাহ্মণ জঙ্গলের লতাপাতায় পা জড়িয়ে কুয়োতে পড়ে গেছে। কুয়োর মুখে একটা পাগলা হাতি দাঁড়িয়ে। নিচে এক বিষধর সাপ। ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে সাপটা। ব্রাহ্মণের পা ওপরে মাথা নিচে। ঝুলছে। যে লতা জড়িয়ে ঝুলছে সে লতার গোড়াটাও ঘষঘষ করে কাটছে একটা ইঁদুর। লতায় অজস্র ফুল। ফুলভরা শাখায় মৌচাক। সেখানে ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি উড়ছে। ওই ভয়ঙ্কর দশাতেও লোকটার মুখে মৌচাক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে পড়ছে। কী আশ্চর্য, এক্ষুনি মরবে তবু লোকটার তৃষ্ণার শেষ নেই ! এক ফোঁটা মধু পড়ে মুখে, তৃষ্ণা আরও বাড়ে। জীবন হল ওইরকমই। ফোঁটা ফোঁটা মধুর লোভেই আমাদের বেঁচে থাকা। কিরে, বুঝলি কিছু ?

ঝিনুক বুঝেছে। কিন্তু শুধু বুঝলেই যদি উপশম হত যন্ত্রণার ! অজস্র দুঃখ অপমানের গল্প শুনলেই যদি ফিরে আসত অপার শান্তি !

হায় রে। লক্ষ খরগোশ জোড়া দিয়ে কি নির্মাণ করা যায় সূর্যের সপ্তম ঘোড়া! থাক, ঠাম্মাকে বলে লাভ নেই। ঠাম্মা বুঝতেই পারবে না সম্পর্ক ছেঁড়ার যন্ত্রণা কী গভীর। হয়ত বলে দেবে, কোর্টের উকিল 'নষ্ট মেয়ে' বলেছে বলে ব্যথা পেও না ঝিনুক। প্রাচীন ভারতে নষ্ট মেয়েদের 'স্বতন্ত্রা' বলা হত। তুমিও তো স্বতন্ত্রাই।

ঝিনুক হাঁটুতে মুখ গুজল। চারদিকের মরুভূমির মাঝে তার একটাই মরূদ্যান ছিল, তার জলের উৎসও কি স্তিমিত হয়ে এল! নাকি ধিকিধিকি তুষের আগুনে শুকিয়ে যাচ্ছে এই প্রাচীন অন্তঃসলিলা!

ক্লিষ্ট স্বরে ঝিনুক বলল,—আমি তোমাকেও হিসেবে মেলাতে পারছি না ঠাম্মা।

—এই তো তোদের দোষ। সব কিছুই তোরা বড় হিসেবে মেলাতে চাস। আরে বাবা, মানুষের মন হল হিসেবের বাইরের জিনিস। গোঁজামিল ছাড়া মিলতেই চায় না। ওই দ্যাখ না শরৎ যে শরৎ যে, অত হিসেব মিলিয়ে মানুষকে ছকে আনতে চায়, সে নিজের বউটাকেই হিসেবে মেলাতে পারেনি।

ঝিনুক বরফ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—তুমি ওঁর বউ-এর কথা জানো?

মৃণালিনী মাথা দোলালেন,—শরৎটা ভেবেছিল বউ লজ্জা অপমানের মুখে পড়বে, থানা পুলিশ কোর্ট বেশি না করাই ভাল। এদিকে ঠুঁটো স্বামীকে ধিক্কার দিতে দিতে গায়ে আগুন লাগিয়ে মরে গেল বউটা। কিসে মেয়েদের লজ্জা বাঁচে তাই বুঝে উঠতে পারেনি শরৎ। এখন বাকি জীবনটা অনুতাপে পুড়ছে।

পলকের জন্য ঝিনুকের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। প্রায়শ্চিত্ত! বিদ্যুৎঝলকের মতো কোর্টের সেই বউটার মুখ মনে পড়ে গেল। কোল থেকে বাচ্চা ঝুলছে। বউটার জন্য শরৎ লড়েছিল, জিতিয়ে দিয়ে বউটারই গালাগাল খেয়েছে। আহা বেচারা। লোকটার কোন হিসাবই মেলে না। তবু হিসাব মেলানোর চেষ্টা করে চলেছে নিরন্তর।

মৃণালিনী ঝিনুকের কাঁধ ছুঁলেন,—কি ভাবছিস?

—কিছু না।

—আমি তোকে জোর করব না দিদি। শুধু বলছি, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব।

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল,—আমি তোমার গল্পের বামুনের মত হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হয়ে মধু চাটতে রাজী নই ঠাম্মা। ওটা জীবন নয়।

জীবনের ছল।

মৃণালিনী ঝিনুকের হাত টেনে ধরলেন,—ছেলেটাকে তুই নয় ক্ষমাই করে দে দিদি। তাতে তোর কষ্টটাও কমবে।

সহসা ঝিনুকের বুকে মেঘের গর্জন,—আমি পারব না। পারব না।

—কেন পারবি না? মেয়েরা ক্ষমা করে আসছে বলেই না টিকে আছে সমাজ সংসার। ক্ষমা যারা করে, তারাই তো প্রকৃত শক্তিমান।

ঝিনুক কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ল মৃণালিনীর কোলে,—জাহান্নমে যাক তূণীর। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না কোনওদিন। চাই না। চাই না। চাই না।

হেমন্তের সন্ধ্যায় আবার বর্ষা নেমেছে। মুষল ধারায়। ঝিনুকের চোখে।

সতেরো

একটু একটু করে ফুটে উঠছিল দিনটা। হিমেল কুয়াশা ছিঁড়ে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে সকাল। প্রশান্ত। নির্জন। শীতল। সূর্য পুরোপুরি উঠে যাওয়ার পর নীরক্ত আকাশে রঙ ধরেছে। গাঢ় তুঁতে রঙ। কাঁচা রোদ্দুর নরম করে হেসে উঠল। পশ্চিম আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রাচীর আলোয় ঝলমল। তুষারকিরীট প্রথম সূর্যকিরণে এক বিমূর্ত ছবি।

গ্যাংটকের পাহাড়ি রাস্তা ধরে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছিল ঝিনুক। অপলক চোখে পাহাড়ের রঙ বদল দেখছিল। কালো থেকে ধোঁয়াটে নীল। তারপর ধোঁয়াটে সবুজ। ধোঁয়াটে ভাব মুছে শেষে সবুজ, বাদামি, হলুদ অজস্র রঙের মিছিল। দেখতে দেখতে কান্না পাচ্ছিল ঝিনুকের। পৃথিবী এত সুন্দর! এত মায়াময়!

ঝিনুক মন্থর পায়ে নামতে শুরু করল এ বার। ফিরছে। জিনসের প্যান্ট, মোটা চামড়ার জ্যাকেট, গলাবন্ধ ফারের টুপি আর জুতোমোজায় নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়েও নিস্তার নেই, ডিসেম্বরের ধারালো ঠাণ্ডা বাতাস নখ ফোটাচ্ছে সর্বাঙ্গে। গ্লাভস পরা হাত পকেটে ঢুকিয়ে নিল ঝিনুক। এই কনকনে শীতের সকালেও এক দল পাহাড়ী শিশু টুকটুকে লাল ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাচ্ছে। ক্ষণিক কলরোল তুলে দুরন্ত ঝরনার মতো নেমে গেল উতরাই বেয়ে। ঝিনুকের একটু মন কেমন করে উঠল। বিক্রমশীলা মহাবিহারেও কি

এখন বেল বাজছে ? দুই লেপচা যুবতী মাথায় বুনো ঘাসের বোঝা নিয়ে চড়াই ভাঙছে। সুবেশা ঝিনুককে ঘুরে ঘুরে দেখছে তারা। ঝিনুক তাদের পেরিয়ে হাঁটছে আবার। দুলে দুলে। একা।

হোটেলে পৌঁছে ঝিনুক দম নিল একটু। রিসেপশন কাউন্টারে একটা নেপালী ছেলে বসে বসে ঢুলছে। রাতের খোঁয়াড়ি তার পুরোপুরি কাটেনি এখনও। ঝিনুকের ডাকে বেশ কয়েক সেকেন্ড পর সাড়া দিল সে।

ঝিনুক বলল,—চা। রুম নাম্বার দুশো তিন।

কার্পেট বিছানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল ঝিনুক। ঘরে ঢুকে টুপি খুলে ফেলল। চামড়ার জ্যাকেটটাও। চতুর্দিক বন্ধ ঘরে বাইরের হাড়কাঁপানো শীত ঢুকেও ঢুকতে পারছে না। সারা রাত জ্বলে ফায়ারপ্লেস নিভু নিভু, তবু তার উত্তাপের রেশ গোটা ঘরে ছড়িয়ে। ডানলোপিলোয় মোড়া ডবলবেড খাটে। ড্রেসিংটেবিলে। ওয়ার্ড্রোবে। টেবিল চেয়ারে।

ডবলবেড খাটের ঠিক মধ্যিখানে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে তূণীর। কুণ্ডলী পাকিয়ে। দুটো মোটা লেপে তার আপাদমস্তক ঢাকা। সবে মাত্র কাল বিকেলে এখানে পৌঁছেছে তারা। ফুলশয্যার পরদিনই বেরিয়ে পড়েছে বলে এখনও যেন বিয়ের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি তূণীর।

ঝিনুক শব্দ করে জানলার ভারী পর্দা সরাল। কাচের শার্শির ওপারে আবারও শ্বেতশুভ্র পাহাড়চূড়া। এত বিশাল পাহাড় এত কাছে ! ঠিক যেন পিছনের ব্যালকনির ওপারেই ! ঝিনুকের কেমন গা ছমছম করে উঠল। একছুটে গিয়ে ঠেলছে তূণীরকে, অ্যাই, অ্যাই, কী ঘুমোচ্ছিস এখনও ! ওঠ। কী দারুণ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে দ্যাখ ! এক্কেবারে হাতের কাছে !

তূণীর একবার মাথা বার করেই আবার লেপের ভিতর ঢুকে গেল, —উমমম্।

—কী আলসেমি হচ্ছে ! ওঠ। এমন সুন্দর দৃশ্যটা মিস করিস না।

লেপ থেকে একটা হাত বেরিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল ঝিনুককে,—এই ঠাণ্ডায় তুই বেরোলি কি করে ?

—একবার বেরিয়ে পড়লে একটুও ঠাণ্ডা লাগে না। তোকে তো কত করে ডাকলাম, উঠলিই না।

—চা কোথায় ? বলেছিস ?

—বলেছি বাবুসাহেব, বলেছি। চল, চা খেয়ে বেরোব। বেড়াতে এসে কেউ এত বেলা পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয় ?

—আমি তো বেড়াতে আসিনি। বলতে বলতে তূণীর ঝিনুককেও জোর করে টেনে নিল লেপের ভিতর। তার হাত বেষ্টন করে ফেলেছে ঝিনুককে।

ঝিনুক মিনমিন করে বলতে গেল,—এক্ষুনি চা দেবে...

—সো হোয়াট ? এটা হানিমুন স্যুইট। কোন ডিসটার্বেন্স চলবে না।

ঝিনুকের মুখ গলা ঘাড় বুক আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে তূণীর। এক এক করে খুলে গেল সমস্ত আবরণ। সদ্যচেনা নারী-শরীর নিয়ে মাতাল হয়েছে পুরুষ। শালফুলের গন্ধ মুছে তার নাকে এখন আদিম মানবীর সুবাস।

—তোকে না পেলে আমি মরে যেতাম রে। ঠিক মরে যেতাম।

ঝিনুকও বুক ভরে শুষে নিচ্ছে তার প্রিয় পুরুষের ঘ্রাণ,—তাই বুঝি ?

—আমি দিদিকে বলে দিয়েছিলাম তোকে আমার চাইই। না পেলে আমি সুইসাইড করব।

ঝিনুক উত্তর দিল না। নিঃশব্দে তূণীরের শরীরের ওম উপভোগ করছে।

তূণীরের গলা জড়িয়ে এসেছে কামনায়,—খামোকা একটা ঝামেলা বাধিয়ে আমার টেনশান কেন বাড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি ?

ঝিনুক তূণীরের ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে দিল। একটা চিনচিনে ব্যথা সঞ্চারিত হচ্ছে বুকে। শত শত মাইল দূরের শহরটাকে এই মুহূর্তেও কি ভুলে থাকা যাবে না ?

তূণীর ঝিনুকের গালে গাল ঘষছে,—সত্যিই আমরা কী বোকা, তাই না ? কোথাকার কে রমিতা পলাশ, কোথাকার কোন গুণ্ডা...তাদের জন্য মাঝখান থেকে আমরা ঝগড়া করে মরছিলাম।

লেপের অন্ধকারে স্বপ্নের নারকেল গাছটা দুলে উঠল। দুলছে। দুলতে দুলতে মিলিয়ে গেল। আসবে। আবার ফিরে আসবে। আমৃত্যু।

প্রিয়তম পুরুষ এত কাছে, তবু মুহূর্তের জন্য অবসন্ন ঝিনুক। জানলার ওপারের কাঞ্চনজঙ্ঘা হঠাৎই তার বুকে চেপে বসেছে। ফুসফুস আলোড়িত করে লক্ষ মণ ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। তূণীরের মুখে আছড়ে পড়েছে সেই নিশ্বাস। ঘন। তপ্ত।

আরও প্রবল আশ্লেষে তূণীর ডুবছে ঝিনুকের শরীরে।

ওই দীর্ঘশ্বাস চেনে না পুরুষ। জানে না কত অভিমান অপমান আর যন্ত্রণা গোপন করে নারী ভালবেসেছে তাকে। যুগযুগান্ত ধরে।

পলাশ জানে না। তূণীরও জানবে না কোনদিন।

[এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক]